শ্রী চৈতন্য আলেখ্য

—: উপহার :—

"দুঃখেরে স্বীকার করি, অনিত্যের যত আবর্জনা;
পূজার প্রাঙ্গন হতে, নিরালস্যে করিবে মার্জনা।
প্রতিক্ষণে সাবধানে, এই মন্ত্র বাজুক নিয়ত,
চিন্তায় বচনে কর্মেতব,— উত্তিষ্ঠত- নিবোধত ॥"

শ্রী . . .

মহোদয়কেস সাদরেব সহিত প্রদত্ত হইল।
স্মরণীয় দিনটি উপহারের মাধ্যমে অবিস্মরণীয় হউক।

শ্রী.....

তারিখ......
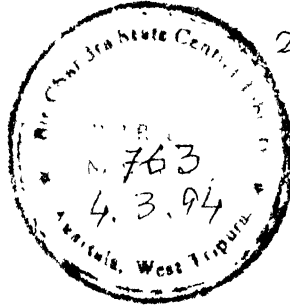
"যে কাজ করিতে আত্মতৃপ্তি জীবনের পরিতোষ,
অন্তর দিয়ে করিবে সে কাজ, আনন্দ নির্দোষ।
যে কাজ করিতে বিবেকেতে বাধে, মনে আসে পরে গ্লানি,
বর্জ্জন কর্য়ো সর্ব্বদা তাহা, তাহা জীবনের হানি ॥"

—:—

শব্দ সংশোধন নির্দ্দেশিকা

পৃষ্ঠায়	লাইনে	হইবে	পৃষ্ঠায়	লাইনে	হইবে
২	১৩	প্রেমআর	৫০	১৮	সত্বর
৩	১০	সঙ্কীর্ত্তনের	৫১	২	অচিন্ত্য
৪	নীচে	১৩৯১	৫২	১৯	যাপনে
৬	১৫	বিভিন্ন	৫৩	৫	মহাপ্রভু
৮	১৪	তথ্য	৫৩	২০	আরও
৯	৪	চিদ্রূপী	৫৩	৩১	পরেই
৯	১০	অভ্যুত্থানে	৫৪	১২	শায়িত
১০	১৫	তমিস্র	৫৫	২৯	সকলেরঅজ্ঞাতে
১৬	৯	বস্তু	৫৬	২০	মুক্তিদাম
১৯	১	উপবেশন	৬০	২১	সঙ্গত
২১	২৮	মহিমার	৬০	২১	পরিণাম
২২	৫	তন্ময়তা	৬১	১	মহাপ্রেমে
২২	৬	আদিপর্ব্বের	৬১	২৪	তত্ত্বসন্দেশ
২৪	৫	স্থির	৬৪	১২	কৃপার
২৬	৭	জীবাত্মাকে	৬৪	২৮	কারণ
২৬	১৫	উপনিষদে	৬৬	১১	সামীপ্য
২৭	২৮	পরান্ত	৬৬	২২	কৃষ্ণভাব
২৯	২২	বিশ্বাস	৬৮	১৯	প্রীতি
২৯	৩৩	বিশ্রস্ত	৬৯	৮	অভীধা
৩০	৮	কন্যা	৭	২৯	সম্বর্দ্ধনা
৩১	৫	স্বতঃউদ্ভূত	৭১	১০	যাবতীয়
৩১	৮	অলৌকিক	৭২	৩	শরীরযাত্রা
৩৭	১২	পরিণীতা	৭৪	৭	আরাধনা
৩৮	৮	গৌরব	৭৪	৯	অর্জ্জুন
৪০	১	ভ্রাতৃ	৭৫	৭	অন্নদাতাকে
৪০	৭	অনারম্বর	৭৫	১৪	ব্যবস্থায়
৪০	২২	সকলেরই	৭৫	২৬	সূর্য্যালোকের
৪৫	১২	কৃষ্ণনামে	৭৭	৩০	কুলমান
৪৬	৮	নীলাচল	৭৮	১১	হরিনাম
৪৭	১৯	মাতামহ	৭৮	১৫	পবিত্র করণ
৪৭	২০	সহাধ্যায়ী	৭৯	৪	নামজপে
৪৩	২৩	মাতৃস্বসার	৭৯	১১	সমস্ত
৪৮	১৯	নিমাইকে	৮০	১০	নিদারুণ
			৮০	১০	যুগপৎ

পৃষ্ঠায়	লাইনে	হইবে
৮০	২৩	রসায়ন
৮১	০	প্রবক্তা!
৮১	২১	সজ্জন
৮১	২২	রসপিপাসু
৮২	২৯	উপকরণকে
৮৩	১৮	প্রয়াস
৮৪	১৬	সকল
৮৪	১১	বিনির্ম্মুক্ত
৮৬	২৩	সংসার
৮৭	১০	গুণকীর্ত্তন
৮৮	১	শ্যামল
৮৮	৮	দুর্ভাবনার
৮৮	২৩	পায়
৮৮	২৮	আকাশে
৮৯	২	বিস্মৃতির
৮৯	৩	মিলন
৮৯	৫	পবনাম্বু
৯০	৫	সর্ব্বক্ষণ
৯১	৭	বিচারে
৯২	১	ক্ষেত্রে
৯২	২৯	কোপীন
৯৩	৯	নন্দিত
৯৭	১১	পরিতাপ
৯৮	৮	পরুষ
১০১	২৭	অধ্যবসায়ই
১০৩	৬	ঈক্ষণেই
১০৪	৬	স্তম্ভ
১০৪	৬	বিশ্বপুরুষের
১০৪	১৯	কোমল
১০৭	৪	রহিত
১০৭	৬	উপভোগ
১০৭	১০	বাক্য
১০৭	২২	প্রবর্ত্তিত
১০৮	২	যুগন্ধর
১০৮	৭	তথা
১০৮	১২	করিবার
১১০	৯	অনুশীলনের
১১০	২৫	চেতনায়
১০১	৯	জ্ঞানাদিমোহে
১১১	২	চিন্তায় ;
১১২	৩	যায় ,
১১২	৪	কিরণ
১১২	৬	স্বচ্ছদর্পণে
১১২	১৫	ভববন্ধন
১১২	২৫	সর্ব্বেন্দ্রিয়
১১২	১৮	বস্তুতঃ
১১২	২৫	আপন
১১৩	২১	সবাইয়া
১১৩	৩০	পাপের
১১৪	১০	গণ্ডীতে
১১৪	৩১	উপলব্ধি
১১৫	৮	বিশীর্ণ
১১৬	৫	সাধারণ
১১৭	২৩	শোভন
১১৭	২৮	অবিরত
১১৭	৩৩	জানি
১১৮	১০	বরেণ্য
১১৮	৩২	ধরায়
১১৯	১	কিঞ্চিৎ
১১৯	২	ব্যঞ্জন
১১৯	২৪	স্মৃতিতে
১২০	২৬	আকস্মিক
১২৬	১৫	নিরবধি
১২৬	২৩	করধৃত
১২৭	২০	ধামের
১২৭	২৫	রহস্যের
১২৮	৯	সূত্রপাতে
১২৮	১৩	নির্ব্বিচারে
১২৮	২৩	হইল
১২৮	২৩	হইলে

শ্রীচৈতন্য আলেখ্য

[শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিত কথা]

প্রথম সংস্করণ

প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র; ইহা সবে জপ গিয়া করিয়া নির্ব্বন্ধ।
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার; সর্ব্বক্ষণ বোল ইথে বিধি নাই আর॥
দশে পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া; কীর্ত্তন করিবে সবে হাথে তালি দিয়া।
রাত্রি দিন নাম লয় খাইতে শুইতে; তাহার মহিমা বেদ নাহি পারে দিতে॥

শ্রীমোহিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বি-এল)

আগরতলা (কৃষ্ণনগর) ত্রিপুরা।

(২)

"জিতভূম" শান্তিনিকেতন॥ ২৬, ৪, ৮৬॥

পরম কল্যানীয় মোহিত,

গতকাল তোমার চিঠি পেলাম; সঙ্গে তোমার লেখার প্রুফ। খুব খুশী হলাম। তোমার চিঠি ও লেখা দুই-ই আমার পক্ষে বড় সন্তোষদায়ক। তুমি আমাকে এই বই সম্বন্ধে ভূমিকা লিখে দিতে বলেছ। আজকাল আমি আর লিখতে পারিনা যে, দেহ দিন দিন জীর্ণ হতে চলেছে। এখানে এমন আর কেউ নেই যাকে দিয়ে একটু বড় করে লিখিয়ে তোমাকে পাঠাবো তবুও কিছু লিখে পাঠালাম। তুমি আমার অবস্থা বুঝবে, এই আমার ভরসা।

তুমি ও বৌমা আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা জেনো। ইতি—

তোমার রানী দিদি

Jit Bhum Santi Niketan

শ্রীমোহিত কুমার বানার্জি শ্রীচৈতন্য আলেখ্য লিখেছেন, তার কিছু অংশ আমায় দেখতেও দিয়েছেন।

পণ্ডিতের মতো ভাবতে পারি না আমি; চৈতন্যের মহিমাও অপার। তবু একটা কথা মনে ধরেছে; তাঁর মহাজীবন তো 'আলেখ্য'ই— প্রেমের করুণা যেখানে বীর্য্যের সঙ্গে মিলেছে, তারই নিটোল ছবি একটি। পাঁচশ' বছরের সীমানা পেরিয়ে তার রেখা, রঙ, দীপ্তি অম্লান রয়েছে আজও।

গুরুদেবের কথা মনে আসছে,—

''যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্য গীত গানে .. ''

চৈতন্যের প্রেম চৈতন্যের সংকীর্তন তেমনটি ছিলনা একেবারেই। কাজি-দলন থেকে জগাই-মাধাই এর উদ্ধার পর্য্যন্ত সব জায়গাতেই দেখি ও-জীবনে প্রেমের বীর্য্যের 'আলেখ্য'।

আমাদের কালটা ভারি ভীরু দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই সে আজ প্রায় আত্মঘাতী। 'চৈতন্য আলেখ্য' পড়ে দেখে আমাদের মনের মুক্তি ঘটুক এই প্রার্থনা।

শ্রীরানী চন্দ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পঞ্চশতবর্ষ পুর্ত্তি উৎসব উদযাপন কমিটি, ত্রিপুরা।

(State Committee for Celebration of the 500 year of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Tripura)

—মুখবন্ধ/প্রকাশকের কথা—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

সভাপতি

● শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ভাগবৎশাস্ত্রী

কার্য্যকরী সভাপতি

● শ্রীমোহিতকুমার বন্দোপাধ্যায়

সাধারণ সম্পাদক

● শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার

প্রচার সম্পাদক

● শ্রীঅমূল্যভূষণ চৌধুরী

সাংস্কৃতিক সম্পাদক

● শ্রীগিরীন্দ্র মজুমদার

স্মারক গ্রন্থ সম্পাদক

● ডঃ রবীন্দ্রনাথ দাস শাস্ত্রী

বৈষম্য ক্লিষ্ট সমাজের অসংখ্য নরনারীকে অপার করুণাময় প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্র মহাসাম্য নীতির আলোকে সুশীতল করিয়া শান্তির সন্ধান দিয়া ধন্য, কৃতার্থ করিয়াছিলেন

আজ হইতে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান পশ্চিম বাংলার নবদ্বীপে পূর্ণিমার উজ্জ্বল সন্ধ্যায় কীর্ত্তন মুখরিত চন্দ্রগ্রহণকালে সংকীর্ত্তনের পিতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথমিশ্রের অঙ্গনে জন্মলীলাভিনয় করেন

সারা পৃথিবীর মানব সমাজ আজ অশান্ত যুগ সমস্যার সম্মুখীন।

এই অবস্থা হইতে উত্তরণের উপায় কী? শ্রীমন্মহাপ্রভু ব[illegible] 'নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।' [illegible] আলোকপাত করিয়াছেন। আমার নিবেদন কয়েক দিন পূর্ব্বে প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্য [illegible]' গ্রন্থ [illegible] কমিটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক শ্রীগিরীন্দ্র মজুমদার তাঁহার প্রতিবেদনে উল্লেখ করিয়াছেন "রাজ্য কমিটির কার্য্যকরী সভাপতি শ্রীযুক্ত মোহিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা শ্রীশ্রীগৌরলীলা বিষয়ক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করার চেষ্টা হচ্ছে।"

অতএব উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা তথা শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলা সহজ সরল কথায় প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই "শ্রীচৈতন্য আলেখ্য" নামে গ্রন্থটি প্রকাশ করা হইল।

পূর্ব্ব সিদ্ধান্তমত ক্ষুদ্রভাবে প্রচার পুস্তিকা না হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় তথ্য সমৃদ্ধ বর্দ্ধিত কলেবরে ইহা আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। এই গ্রন্থটির কাগজ ও ছাপা খরচ মোহিতবাবু (গ্রন্থ লেখক) বহন করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে তাঁহার নিরাময় দীর্ঘ জীবন এবং সপরিবার ভজন কুশল কামনা করি।

বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ মূল্য মাত্র ছয় টাকা ধার্য্য করা হইল, যাহা উৎসব আনুকুল্যে ব্যয়িত হইবে।

গ্রন্থটি পাঠ করিয়া আনন্দ পাইলেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থকপূর্ণ হইবে। পরবর্তী পর্য্যায়ে 'শ্রীরূপ সনাতন শিক্ষা' প্রসঙ্গে এই লেখকেরই 'আমি ও আমার ধর্ম্ম' প্রকাশের বাসনা রইল। জয় নিতাই জয় গৌর।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার
প্রকাশক

পঞ্চম দোল
৩০শে মার্চ, ১৯৮৬
মজলিশপুর, ত্রিপুরা — ৭৯৯ ০১৫

সাঃসম্পাদক,
শ্রীমন্মহাপ্রভু আবির্ভাব পঞ্চশত বর্ষ-পূর্ত্তি-উদ্‌যাপন রাজ্য কমিটি, ত্রিপুরা।

জগতে জননীর মত যথার্থ আপনজন আর নাই।
বিগত ১৩৯১ বঙ্গাব্দ পৌষ পূর্ণিমার পূর্ব্বাহ্নে পরিপূর্ণ সচেতনতায়, শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দ-ভাগবত স্বামী কৃপা প্রদত্ত কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিতে করিতে অভীষ্টধাম প্রয়াত মাতা ঠাকুরাণীর উদ্দেশ্য গ্রন্থখানা উৎসর্গ করা হইল।

: গ্রন্থকার :

SREE CHAITANYA GAUDIYA MATH
Head Offic 35, Satıs Mukherjee Road, Calcutta-26

অশেষ গুণালঙ্কৃতেষু

প্রিয়বর মোহিতবাবু,

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবর্ষ পূর্তি আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে গঠিত, ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সহিত বিশেষভাবে যুক্ত থাকিয়া, বর্ষাধিক কালব্যাপী অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি চারণের পর এখন তাহার জীবনালেখ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, জ্ঞাত হইয়া পরমোল্লসিত হইলাম। আপনার সুলিখিত "অর্ঘ্য ও শ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসা" এবং "শরণাগতি" গ্রন্থ দুইটিতেই চিত্তের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম প্রবণতা ও পবিত্রতা পরিস্ফুট এবং ভারতীয় সভ্যতার প্রাণ আধ্যাত্মিক কৃষ্টির সংরক্ষণ প্রচেষ্টা আকর্ষণীয়ভাবে অভিব্যক্ত। যদি পরমারাধ্য শ্রীল শ্রীগুরু মহারাজ আপনার মত গুণীব্যক্তি পাইতেন, আপনার যৌবনকালে, তবে আপনার দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ প্রেমভক্তির বাণী, অনেকের অপেক্ষা অধিক সুন্দরভাবে প্রচার করাইতে পারিতেন। কিন্তু গৌরহরির ইচ্ছা অন্যপ্রকার হওয়ায়, সেইভাবে যোগাযোগ হয় নাই। এখন জটিল সংসার জীবনের নানা দায়িত্ব এবং বয়সাধিক্যের মধ্যেও, আপনি যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের ইতিবৃত্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছেন, জীবের অধ্যাত্ম পরিশুদ্ধি অভিযানে করিতে আপনার এই শুভ প্রয়াস সাফল্য মণ্ডিত হউক, শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

গৌরজনকিঙ্কর

ভক্তিবল্লভ তীর্থ

(ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বল্লভ তীর্থ মহারাজ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠানের আচার্য্য ও সভাপতি

উষা-ম্যানসনস,
আগরতলা (ত্রিপুরা)
১লা ভাদ্র-১৩৯৩

শ্রদ্ধেয় মোহিতবাবু

প্রচণ্ড গরমে এবং প্রবল বর্ষণের মধ্যেও আমার বাড়ীর পিছনের ছাপাখানায়, প্রায় প্রত্যহ আপনার উপস্থিতি লক্ষ্য করায়, কৌতূহলভরে কিছু মুদ্রিত লেখা পড়িলাম। যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনকাহিনী সকলেই মোটামুটি অবগত তবু সতর্ক সচেতনতায় বিচার করিয়া, তাঁহার প্রতিভা প্রদীপ্ত আদর্শ, ভাব ও রূপ্যা সব মত সাবলীল গতিতে ক্ষুদ্র পুস্তকে। যেভাবে নিপুণ সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই অভিনন্দন যোগ্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব সময়ে গোষ্ঠী কেন্দ্রিক সমাজপতিগণের উন্মার্গ মানসিকতার বিচার ব্যবস্থায় অতিষ্ঠ এবং বিদেশী শাসক সমর্থিত লোভদ্বারা প্ররোচিত, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ ক্রমশঃ দলে দলে ভিন্নধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল, যাহা উদার বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবেই প্রশমিত হয়। সর্ব্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত আত্মকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবিগণের অপরের ব্যাপারে উদাসীনতার সুযোগে, বিদেশীয় ধর্মপ্রচারকগণের প্রচারণায় বিভ্রান্ত, বিপন্ন দুর্গম অঞ্চলের আদিবাসীগণের, পরধর্ম গ্রহণের প্রবণতা দেখা যাইতেছে. যাহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সহজ সরল মতবাদ ব্যাপক প্রচার দ্বারাই ব্যাহত করা যাইতে পারে।

আপনার পুস্তকখানা সেই প্রচেষ্টায় যথোচিত সহায়ক হইবে, এইরূপ আশান্বিত হইয়াই, মনের আবেগে এই অনুবেদন পত্র।

গুণমুগ্ধ
শ্রীকনককান্তি চক্রবর্ত্তী

॥ লেখকের অনুলেখা ॥

যাকিছু কাছে এসেছে আছে এনেছে তারে প্রাণে তাঁদের আমি নমি
যাকিছু দূরে গিয়েছে ছেড়ে টেনেছে তাঁরি পানে, তাদের আমি নমি ॥

—: সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতুঃ সে শচীনন্দনঃ :—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বরণীয় আবির্ভাবের পঞ্চশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে, এই পরমপবিত্র ও চিরস্মরণীয় পুণ্যতিথির প্রাক্কালে বৎসরটি সমস্ত শ্রদ্ধা ভক্তির বিশেষ মর্য্যাদা প্রদর্শনপূর্বক, দেহমনপ্রাণ অমৃতময় করিয়া জীবনপয়োধিতে চৈতন্যের শতদল বিকশিত করিবার স্বতস্ফূর্ত প্রেরণায় সমগ্র বিশ্বের ভক্তিপ্রাণ নরনারীর অন্তরলোকে অভূতপূর্বরূপে উদ্দীপিত আত্মিক জাগরণের বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। অন্তরোত্থিত সেই ভাবপ্রবাহের বিমল বিকিরণচ্ছটা বাহিরে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল — সারাবর্ষব্যাপী গ্রাম হইতে—গ্রামান্তরের পথে পথে হরিনাম কীর্তন পূর্বক প্রভাতফেরি, সার্ব্বজনীন নগরসঙ্কীর্তন, গৌরলীলা গানের সান্ধ্য আসর, বিবিধপ্রকার সাংস্কৃতিক সম্মিলন, গৌর বিষয়ক নাট্যানুষ্ঠান এবং চৈতন্যচিন্তার বিচিত্র রচনাদির প্রচারণের মধ্য দিয়া।

যদিও প্রতিটি দিন প্রত্যেকটি দিনের মতই, যেন নিয়ম করিয়া সবগুলি দিন একইভাবে সজ্জিত — প্রভাতে সূর্য্যোদয়, মধ্যাহ্নে মধ্যগগনে অপরাহ্নে অস্তাচলের পথে, সন্ধ্যায় অস্তগত, অদৃশ্য, —তথাপি বৎসরের কোন একটি বিশেষ দিন যেন অন্যদিনের মত কিছুতেই নয়। কারণ সুখস্মৃতির আবেশমুগ্ধ প্রাত্যহিকের বন্ধনমুক্ত সেই বিশিষ্ট দিবসটি অন্তরপটে চির অঙ্কিত থাকায়, চমকিত চিত্তের অনাবিল আনন্দে তা না যেন দিবারাত্র বিস্মরণ হয়। করুণারসে ভরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর অবিস্মরণীয় জন্মতিথিটি প্রতিদিনের সহিত অভেদ হইলেও আপন মাধুর্য্যের স্বাতন্ত্র্যে যেন অবশ্যই প্রভেদ। তাই যেন বাতাসে কম্পিত বেতস পত্রের মত এই পরমলগ্নটি অন্তরের অন্তঃস্থলে অবিরত অনুকম্পন জাগাইয়া তোলে, চল চপলার চকিত চমকের মতো তাঁহার কমনীয় চরণচিহ্ন হৃদয়মাঝে কেবলই বিচরণ করিতে থাকে, অরণ্যের মর্ম্মর, শ্রাবণের ধারাপাত, নদীর কলোচ্ছ্বাসের মতন তাঁহার করুণ মিনতিমাখা আহ্বানের মঙ্গল-ধ্বনি যেন অন্তরে অবিরাম ধ্বনিত হইতে থাকে।

পাঁচশতাব্দী পূর্ণ হইবার বিগত বিশিষ্ট জন্মবর্ষটি যেন বেগবতী নির্ঝরিণীর মত, উৎক্ষিপ্ত হইয়া, বিশ্বের বিশেষ জনমানসকে এক অবিস্মরণীয় ভক্তি-প্রেমরসে আপ্লাবিত করিয়া চিত্তক্ষেত্রকে সহস্রদল কমলের মত বিকশিত করিয়াছিল। নববারিধারাস্নানে উৎফুল্ল বনভূমির রুক্ষবক্ষে তৃণাঙ্কুর ফুটিয়া উঠিবার মত, জনগণের ঊষর হৃদয়ভূমিতে প্রকাশ পাইয়াছিল, অলৌকিক প্রাণশক্তি সঞ্চারিত ভক্তি জ্যোতির্ময় অভিব্যক্তি। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে বর্ষব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করিয়া, ত্রিপুরার রাজধানীতে একটি "রাজ্য-কমিটি" গঠিত হয়। তাহার প্রধান উদ্যোক্তা ও কার্যনির্বাহক সমিতির সাধারণ সম্পাদক, ত্রিপুরার প্রাক্তনমন্ত্রী,-মাননীয় শ্রীযুত যতীন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যের অনুপ্রেরণায় এবং পরম অন্বেষণার পথে, সংসারধূলির আড়ালে অগোচর মায়াভীরু বাসনার বশবর্তীতে, গৌরপূর্ণিমায় বিতরণের অভিপ্রায়ে, "চৈতন্য চরিতকথা" শিরোনামে একটি প্রচার পুস্তিকা' প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু অনিবার্য বিবিধ-ব্যস্ততাবশতঃ যথাপূর্বে লেখা সম্পন্ন করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। সেই রচনাবিন্যাস আরও অধিক আলোচিত ও তথ্য-সমৃদ্ধ হইয়া, এক্ষণে "শ্রীচৈতন্য আলেখ্য" নামরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। ইহাই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ রচনার গোড়ার কথা কিংবা গ্রন্থারম্ভের আরম্ভকাহিনী অথবা লেখার সূত্রপাত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তথা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বঙ্গমানবকুটিরে, বহুআকাঙ্খিত কল্যাণপ্রদ আবির্ভাব, ফাল্গুনমাসের দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায়, যাহা বিশ্বব্যাপী গৌরপ্রেমিকগণের নিকট 'গৌরপূর্ণিমা" নামে খ্যাত। তাঁহার প্রকাশের প্রাক্কাল, বিদ্যার অহংকারে, জ্ঞানের গরিমায়, যশের আকাঙ্খায়, প্রতিষ্ঠার প্রলোভনে, বঙ্গদেশের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সামাজিক জীবন ছিল, সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষে মুহুঃসহ। দুর্দ্দম্য প্রতাপ উচ্চবর্ণের স্বেচ্ছাচার বিধানের দাপটে, নিম্নবর্ণের জনগণ সদা সন্ত্রস্ত। বিধর্ম্মীশাসনে সমাজস্তরে দুর্নীতি, অর্থলালসা, ক্ষমতা লোলুপতা, প্রাধান্যের প্রবলতা, উৎকট জাত্যাভিমান, কদর্য্যভাবে প্রকট। দিনযাপনের, প্রাণধারণের গ্লানির অবসাদে অবসন্ন সমাজচেতনায় ধর্ম্মীয় দীপ্তি নিষ্প্রভ প্রায়। ভগবদ্ভক্তি কি বস্তু, তাহা জানিবার, তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিবারও কেহ প্রয়োজন বোধ করিত না। বৃথা বিতর্কে ব্যাপৃত বিভিন্ন

শেষাংশ ৮৫ পৃষ্ঠার পর দ্রষ্টব্য

শ্রীচৈতন্য আলেখ্য

উপক্রমণিকা

"চলো যাত্রী চলো দিনরাত্রি, করো অমৃত প পথ অনুসন্ধান"

ব্রহ্মসংহিতায় উল্লেখ রহিয়াছে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর। তিনিই সর্বকারণের কারণ, অনাদি আদিপুরুষ গোবিন্দ। তিনি অবিচ্ছেদে আনন্দরস ও চিন্ময়রস অখিলের আত্মভূত তিনি, স্ব-সদৃশ আনন্দ চিদ্রূপী ভক্তগণের সহিত গোলোকে বিহার করেন। এই দিব্যধামে ভগবৎ সান্নিধ্যে উপনীত হওয়াই বৈষ্ণব সাধুগণের কামনা ও সাধনা। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু সেই চিরবাঞ্ছিত পরমপথের সন্ধান প্রদান করিয়া, সেখানে সহজে উত্তরণের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাই তিনি বিশ্বের বরেণ্য

ভগবান যুগে যুগে জগতের প্রয়োজনে মানবদেহ ধারণ করিয়া ধরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, শ্রীমদ্ভগবত গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লিখিত এই ভগবৎবাক্যের ভাবার্থ এই যে — জগতে যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থানে মিথ্যাচার ও কুসংস্কারের আবর্তনায় শাশ্বতধর্ম আচ্ছাদিত হইয়া পারমার্থিক পথ নানা মতবাদে অবলুপ্তির উপক্রম হয়, চিরন্তন সত্যের ললিতবাণী উপহসিত হইতে থাকে যথার্থ ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় প্রকৃত সৎপথ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন, তখনই অপার করুণায় শুভকর্ম বিবেকবৈরাগ্য, জ্ঞানভক্তিপ্রদ শ্রেয়োলাভের প্রকৃতপথ আপন আচরণের মধ্য দিয়া জগৎবাসীকে প্রদর্শনের জন্য শান্তির অমৃতপাত্র হস্তে স্বয়ং বিশ্বপতি যুগ প্রবর্তক মহামানবরূপে জীবজগতের কল্যাণার্থে ধরার বুকে অবতরণ করিয়া থাকেন।

রাষ্ট্রশক্তিহারা হিন্দুজাতির জাতীয় জীবনে, যখন ধর্মীয় দুর্যোগ ঘনীভূত, বর্ণভেদ দূষিত অনুদার সমাজ ব্যবস্থার চাপে, ধর্মান্তরিত হওন প্রবলতর হিন্দুসমাজ ঈর্ষাদ্বেষ পরনিন্দা পরপীড়নের কলুষিত আবেশে চৈতন্যহারা, ভক্তিপথ ত্যাগ করিয়া আশুফল লাভের আশায় জনগোষ্ঠি অভিচারাদি তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুসরণেই অধিক আগ্রহশীল, বহির্মুখী আচরণের প্রশ্রয়ে, ব্যবহারিক জীবনে ধর্মীয় দীপ্তির গৌরব বিনষ্টপ্রায়, অর্থাৎ সেই পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষকে ধর্মের অবশ্যম্ভাবী গ্লানি হইতে, মুক্ত করিতে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ ১৪০৭ শকাব্দ, ২৩ শে ফাল্গুণ, শনিবার পূর্ণিমা তিথির প্রায়ঃ

সন্ধ্যাকালে, চন্দ্রগ্রহণের প্রাক্কালে, হরিধ্বনি মুখরিত নবদ্বীপ নগরীতে, সিংহরাশি আশ্রিত সিংহলগ্নে জাত যাহা কিছু শুদ্ধ ও পবিত্র, তাঁহারই পরিপূর্ণ প্রতীকরূপে প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল পরবর্তীকালে তাঁহার প্রবর্তিত প্রেম ও মৈত্রীর সাম্যমন্ত্র সকলকেই সমভাবে প্রভাবিত করায় হিন্দুজাতির বিনষ্টপ্রায় জীবনীশক্তি পুনরায় দৃঢ়মূলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধর্ম ও সমাজ জীবনের মহাসঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিল, ভারতভূমি

শ্রীগীতাবমতে যুগাবতারের জগতে আবির্ভাবের প্রধানতম কারণ, জ্ঞান ও ভক্তির পথনির্দ্দেশে সাধুমহাত্মাগণের সহায়তা প্রদান, ঈশ্বরদ্বেষীগণের মতের বিবর্তন শাস্ত্রের অনন্তজ্ঞান অনন্তযুক্তি ও অনন্ত ভাববৈচিত্র্যের সমন্বয় সাধন করিয়া যুগোপযোগী ধর্মের সংস্থাপন এবং ভগবানের লীলা স্বরূপের সহিত জীবনের মিলনসাধনের সহজ উপায় প্রবর্তন আত্মিক ধার্মিকতার অংকার যখন চিত্তবৃত্তিকে কুণ্ঠিত করিয়া কেবলমাত্র পূজাঅর্চনা আচার অনুষ্ঠানের অন্তহীন আড়ম্বরের পুনরাবৃত্তিরূপ নৈমিত্তিক কর্মের গণ্ডীকেই আবদ্ধ করিয়া রাখে কৃত্রিম আচারের যুক্তিহীন তমিস্র আবরণে নিজেদের সমাচ্ছন্ন করিয়া তোলে ততক্ষণ অমৃতস্বরূপ অন্তরে প্রত্যক্ষে নিত্য হইয়া উঠেন, তখন মনে ভক্তিরস জাগরিত হয় না, হৃদয়ে স্নিগ্ধ আনন্দ চেতনার মাধুর্য্য দেখা দেয় না জগদ্ব্যাপী নিয়ম শৃঙ্খলার সহিত মনের সংযোগ ঘটে না ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলে পদে পদে ভয়ের ভাবনা থাকিয়া যায়, জাগতিক ক্ষতিকেই চরম বিপদ বলিয়া গণ্য হয়, মৃত্যুকে জীবনধারার অবলুপ্তি বোধ হয়, দিন যাপনের প্রাণধারণের বিড়ম্বনায় বিব্রত জীবনে কেবল অর্থবিত্ত যশ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি আপাতমধুর প্রহেলিকার প্রতি বিমুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাইয়া সংসারমোহকেই অন্তরে লালন করা হয় ইহারই অনিবার্য্য কারণে নিখিল বিশ্বের প্রতি আত্মার প্রীতি পরিপূর্ণরূপে প্রসারিত হয় না, সমাজের সর্বস্তরের মনুষ্যজাতির প্রতি আলস্য বিজড়িত অনাদর দূর হয় না, মন কেবল আপন স্বার্থপরতার পরিধিতেই পরিচালিত হইতে থাকে যেমন করিয়া আপনা হইতেই নিঃশ্বাস গ্রহণ করা হয় তেমনি ভাবে ঈশ্বরকে অনায়াসে চেতনার মধ্যে চালনা করা যায় না। ফলে মন বিক্ষিপ্ত হইয়া আপন সুখদুঃখ নিজের প্রয়োজন নিয়াই অহরহ ভাবিত থাকায়, ধর্মজীবন ও ঈশ্বর লাভের আবশ্যকতার ভাবনা, ব্যবহারিক জীবনের অন্তরালে সরিয়া যায়। অন্তরের সুকোমলবৃত্তি অন্তর্হিত হয়।

বহির্জগতে যাহা কিছু প্রকাশিত, তাহাকে জানিবার জন্য যেমন আমাদের বহিরিন্দ্রিয় আছে তেমনি যাহা গভীর ও ইন্দ্রিয়াতীত, তাহাকে উপলব্ধি

করিবার জন্য রহিয়াছে, অন্তরিন্দ্রিয়। এই অন্তরতর ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা অন্তর হইতে উৎসারিত বলিয়া ইহার আহার্যও অপার্থিব। তাই অর্থনৈতিক দিক হইতে যাহা পাইবার, তাহা চূড়ান্তভাবে পাইয়াও মনুষ্যের জীবনে পূর্ণতালাভের অবকাশ থাকিয়া যায় এবং জাগতিক সুখসমৃদ্ধি যশপ্রতিষ্ঠা, বিত্তবৈভবের বাহিরেও যাহা চায়, তাহা প্রাণের আরাম, মনের শান্তি, অন্তরের নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

পক্ষান্তরে যাহা জীবনের ভাবনাকে নীচে নামিতে না দিয়া, সর্বপ্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও, তাহাকে ঊর্দ্ধে বিধৃত করিয়া রাখে তাহাই ধর্ম এবং যাহা চিত্তকে বহির্মুখী ভাবনার মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া দৈনন্দিন জীবনধারাকে ক্লিন্ন করিয়া তোলে, তাহাই অধর্ম। সুতরাং মহৎকর্ম এবং এবং মহৎপ্রেরণা দ্বারা, আপনাপন চরিত্রকে পবিত্র আদর্শের দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে না পারিলে, ধর্মলাভের পথ সহজ হয় না। কালক্রমে বিনষ্ট এই মহান আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতেই যুগে যুগে মহামানবের অবতীর্ণ হইবার অন্যতম প্রধান অভিপ্রায়।

উল্লেখযোগ্য যে জীবাত্মা সতত নিজ স্বরূপ প্রকাশের প্রয়াস পাইতেছে এবং ইহাই জীবাত্মার সংস্কার। অপরদিকে বহির্মুখী প্রেরণার অজ্ঞাতে জীবাত্মার এই স্বপ্রকাশে কেবলই অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে এবং ইহাই মায়ার ছলনা। মধ্যবর্তী এই দ্বন্দ্বই জীবের বন্ধন-দশা। সুতরাং এই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে পরাভূত করিয়া, জীবাত্মার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভের পথে সম্যক সহায়তা করিবার নিরন্তর অনুশীলনের আন্তরিক প্রচেষ্টাই প্রকৃত ধর্মজীবন। অধিকন্তু এই মরণশীল জাগতিক জীবনের অতি ঊর্দ্ধে এক মহানশক্তি অবস্থিত। তাহার ইচ্ছাতেই জগতের যাবতীয় ঘটনা প্রবাহ সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে অবিরাম প্রবাহিত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে। এবং সেই সর্বব্যাপী সত্তার সান্নিধ্য লাভের জন্যই সংসারক্লেশাগ্রস্ত জীবাত্মার বন্ধনমুক্তির ব্যাকুলতা। কারণ আমাদের অন্তরাত্মার সত্যসত্ত্ব একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই এই বিশ্বপতির সহিত যে মিলিত হইতে চাহিতেছে এবং নিজেকে সর্বতোভাবে তাঁহার নিকট সমর্পণ করিতে প্রয়াসী, কেবলমাত্র তাহাই নহে, পরন্তু ইহাতেই তাহার একমাত্র অভীপ্সা ও আনন্দ। কিন্তু অনাদি বহির্মুখ জীবের অভীষ্ট দেবতাকে জানিবার, তাঁহাকে সাধনা করিবার, তাঁহার সহিত যুক্ত হইবার সঙ্কেত মন্ত্র জানা নাই। তাই ঈশ্বর-লাভের যথার্থ পথনির্দ্দেশ পাইবার প্রত্যাশায় মনুষ্যজাতি যখন অন্তরের অন্তরে ব্যাকুল হইয়া পড়ে, সাধু বৈষ্ণবগণ ভগবানের আবির্ভাবের আশায় নিরবচ্ছিন্ন প্রার্থনা নিবেদন করিতে থাকেন, তখনই আনন্দ চিন্ময়রূপী গোবিন্দ, সেই

পরিমণ্ডলের উপযোগী ধর্মপথ প্রদর্শনের জন্য নরদেহ ধারণ করিয়া ধরাধামে আগমন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু তথা শ্রীগৌরাঙ্গ কিংবা নিমাই পণ্ডিতের আবির্ভাব কালে দেশে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা থাকিলেও ধনৈশ্বর্য্যের অভাব ছিল না। শিল্প কলা, শাস্ত্র আলোচনা, চতুর্বেদ বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র নবদ্বীপে তখন পাণ্ডিত্যের আন্দোলনে, নব্যন্যায়ের বিতণ্ডায় শতশত চতুষ্পাঠী সর্বদা মুখরিত থাকিত। নানাস্থান হইতে সমাগত সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী, অভূতপূর্ব উৎসাহের উদ্দীপনায় পূর্বপক্ষ ও অপরপক্ষের বাদ প্রতিবাদে দিনে অপরাহ্ন বেলা কূট প্রশ্ন ও শুষ্কতর্কে গঙ্গাতট প্রতিধ্বনিত হইত কিন্তু বর্ণাশ্রমের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ও অস্পৃশ্যতার কঠোর গণ্ডি, মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের ব্যবধান ক্রমেই বিপুলভাবে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছিল। চণ্ডীমণ্ডপের আসরে শাস্ত্রোক্ত রসের বিচার হইলেও, জীবন ছিল রসহীন। বিদ্যার উৎকর্ষে সকলেরই মস্তিষ্ক ছিল পুষ্ট, এমনকি পরিচারকগণও সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিবার দক্ষতা রাখিত কিন্তু ভগবদ্ভক্তির অভাবে প্রায় সকলেরই হৃদয় ছিল শুষ্ক শাস্ত্র গ্রন্থাদির ভাষ্যের অনুভাষ্য রচিত হইলেও, চিত্তে মানবীয় ঔদার্য্য ছিল অপগত পাণ্ডিত্যের প্রাচুর্য্যের মধ্যে প্রায়শঃ দেখা দিত আত্মিক দৈন্য ফলে শাশ্বত ধর্মতত্ত্ব ম্রিয়মান মানবমন হইতে প্রায় অবলুপ্ত হইতে চলিয়াছিল। সদাচারী ব্রাহ্মণগণ হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া, বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের ব্যয়বহুল ক্রিয়াকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতেছিল গৃহে গৃহে জ্ঞানের স্বতন্ত্রধারা প্রবাহিত হইয়া বেদের বিকৃত অর্থে জীব হিংসা প্রচলিত হইতে লাগিল ধর্মের নামে অধর্মের প্রসারে ধর্মীয় শৃঙ্খলা শিথিল হইয়া আসিল অত্যুজ্জ্বল প্রদীপের আলোক নির্বাপিত হইলে অন্ধকার যেমন অধিকতর গাঢ় বোধ হয় মোসলমান শাসনের শেষভাগে ভারতভূমিতে হিন্দু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাহাই অনিবার্যরূপে সংগঠিত হইয়াছিল। চিন্তাশীলতার স্বাধীনতা ক্রমে অবলুপ্ত হইয়া শাস্ত্রের সঙ্কীর্ণতা ধর্মের সাম্প্রদায়িকতা এবং অস্পৃশ্যতার ভয়াবহ কঠোরতা মানবীক চেতনাকে অন্তর্হিত করিয়া সমাজকে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির তামসিক কালিমায় আচ্ছন্ন করিয়াছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ধর্ম ও সমাজ জীবনের সেই নিদারুণ সঙ্কট সময়ের যুগসন্ধিক্ষণে, রমণীয় ভাগিরথীতটে, বিদ্বজ্জন মুখরিত জ্ঞান ও ধর্মের পুণ্যভূমি শ্রীধাম নবদ্বীপে, ক্ষমা, করুণা ও ভক্তি প্রেম রসের সমুজ্জ্বল মূর্ত্ত প্রতীকরূপে শ্রী গৌরাঙ্গ দেব অবতীর্ণ হইয়া, সমাজের সকল আত্মিক দৈন্য ঘুচাইয়া, লাঞ্ছিতের বেদনা মুছাইয়া, পাণ্ডিত্যের গর্ব খর্ব করিয়া, যাবতীয় সামাজিক সমস্যার সঙ্কট

মিটাইয়া, বিচিত্র বৈষম্যক্লিষ্ট সমাজের অগণিত অশান্ত জীবনিবহকে ধন্য করিয়া অভিনব এক মহাসাম্যনীতির ভূমিকায় উত্তীর্ণ এবং ভগবানের সহিত যুক্ত হইবার সহজ সাধন পথের সন্ধান প্রদান করিয়াছিলেন।

তাঁহার বিস্ময়কর প্রতিভার অমৃতময় আলোকে, অনবদ্যরূপের অনির্বচনীয় মাধুর্যে ও অনুপম গুণের আকর্ষণে, তথা দিব্যজীবনের ঐশ্বরিক প্রভাবে, ধর্মের নামে অনাচার দূরীভূত ধর্মান্বেষীদের স্বভাবের অপূর্ব পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে তিনি, এমন এক ভগবৎ আরাধনার উপায় প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন যাহা উচ্চ নীচ, পাণ্ডিত মূর্খ, সকলেরই ব্যবহারিক ধর্মজীবন নূতন করিয়া মহিমামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা শ্রম সাধ্য আচার অনুষ্ঠান বিহীন, কেবলমাত্র ভক্তির সহজ সরল প্রবাহে, যে কোন সময়, নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎ অনুস্মরণ রূপ নামজপ। ইহাতে ধর্মের নামে বিভেদের অন্তরাল সমাজ জীবন হইতে সহজে দূরীভূত হইয়া ধর্ম জীবনে জনজাগরণ তথা জাতিধর্মবর্ণ ধনীদরিদ্র, শিক্ষিতঅশিক্ষিত, নির্বিশেষে পরস্পর মৈত্রীবন্ধনের মিলন সাধিত হইয়াছিল, যাহাতে তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রচারক ও মহৎ সমাজ সংস্কারকরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

মানবমনের সুকোমল বৃত্তিকেই ধর্মজীবনের ভিত্তি বলা যায়। সুতরাং তাহার সম্যক বিকাশের উপরই পারমার্থিক জীবনের পরিপূর্ণতা নির্ভর করে। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সংসারাসক্ত জনগণের বহির্মুখী চিত্তকে মার্জ্জিত করিয়া অন্তর্মুখী করিবার সহজ উপায় ঘোষণা করিলেন—সংসার দাবানলে বিদগ্ধ ভগবদ্ভক্ত, যে কোন অবস্থায় ভগবৎ মহিমাব্যঞ্জক নামজপ ও সমবেত হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই এই উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সদা দুঃখময় সংসার সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া, পরমানন্দময় দিব্যলোকে শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্যে গতিলাভ করিতে পারিবে। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। ভক্তিদ্বারাই তাঁহাকে বশীভূত করা যায়। কায়মন বাক্যে শ্রীভগবানের অনুগত হইয়া তাঁহার প্রতি অন্তরের আন্তরিক প্রীতি ও ঐকান্তিক অনুরাগই ভক্তি। অন্য বস্তুর অভিলাষ শূন্য এবং জ্ঞান কর্মাদির ব্যবধান রহিত একমাত্র অহৈতুকী ভক্তিদ্বারাই ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া যায়। প্রথমে শ্রীভগবানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস তারপর সাধুসঙ্গ, পরে অর্চনা। ইহাতে বিঘনিবৃত্তি হইয়া ভগবৎ নামে রুচি আসে এবং চিত্তে ভাগবতীয় রসের সঞ্চার হয়। ক্রমে রসস্বরূপ ভগবানের প্রতি প্রেমের উদয় হইয়া, তাঁহার সান্নিধ্য লাভের জন্য রসিক চিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে। ব্যাকুলিত ভক্ত হৃদয়ই ভগবানের বিশ্রামস্থান।

রস অর্থ আনন্দ; যাহা দুইপ্রকার বুঝায়, জড় ও চিৎ। জড়রস অর্থে সাংসারিক সুখদুঃখ, ইহাই বিকৃত হইয়া দাম্পত্য প্রণয়, অপত্য স্নেহ, আনুগত্য

সখ্যতা, ক্রীড়া কৌতুক প্রভৃতিতে পরিণত হয়। অপর দিকে বিবেস, শুদ্ধ আনন্দ, যাহা অন্তরে জাগ্রত হইলে, জগতের সব কিছুই চিদানন্দময় ভগবানের আনন্দ প্রকাশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যেমন বাল সূর্য কিরণ বিচ্ছুরিত অন্তরীক্ষ, নবীন শস্য বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, ... উদ্ভাসিত গগনতল অমানিশার প্রগাঢ় অন্ধকারে তারাবিচিত্র নভঃস্থল বসন্ত ঋতুর ... স্বয়ংস্ফূর্ত আম্রমুকুল কোকিল ... কিছু মানে ... সানন্দ ভগবানের প্রকাশ অনুভব হয়। এইরূপ ... ... কর্তৃক ... বর্ণিত জাহ্নবীধারার সাগর সঙ্গমে ... প্রবাহিত হইবার ন্যায় অভিলাষশূন্য চিত্তকে অবিরত ভগবৎ অভিমুখীন করিয়া রাখাই প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা এই যে জীব ও ভগবান উভয়ই নিত্য এবং লীলাময় ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধও নিত্য লীলায়িত। আপন স্বরূপ বিস্মৃত সংসারসক্ত জীব ইন্দ্রিয় জগৎকেই একমাত্র অবলম্বন ভাবিয়া ইহার অনিবার্য দুঃখ জ্বালায় সদা সন্তপ্ত থাকিয়াও ইহ হইতে নিস্তার লাভের উপায় অনুসন্ধান করে না। সৌভাগ্যবশতঃ প্রকৃত সাধু মহাপুরুষের কৃপায় কাহারও চিত্তে ভগবানের সহিত আত্মার অবিচ্ছিন্ন ... ... হইয়া সেই সম্বন্ধানুযায়ী আ... প্রতি ... উপজাত হইলেই জীবহৃদয় আনন্দময়ের সহিত যুক্ত হইয়া আনন্দী ... তখন একান্তিক ভক্তির অপূর্ব আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে ভগবানের ... ... বিবিধ ... ও মধুর সম্পর্ক স্থাপন পূর্বক ... ... ও এবং ... নিত্যলীলায় প্রবেশাধিকার লাভ করা যায়। বস্তুতঃ তিনি প্রেমানন্দ স্বরূপ, তাহার প্রতি এই প্রেমভক্তি নিবেদন সঙ্গত এবং কোন জীব যখন ভগবানের সহিত ... ... আবদ্ধ হয় তখনই তাহা পূর্ণ স্বার্থকতা লাভ করিয়া প্রকৃত বিচারে সেই জন ... সম্মান রূপে গণ্য হয়। প্রত্যেক জীবের চিত্তেই রসস্বরূপত্ব ধর্ম নিত্য বিদ্যমান এবং প্রেমলাভের জন্য তাই তাহার অদম্য আকাঙ্খা। কিন্তু ভগবৎপ্রেম জন্যপদার্থ বা উৎপাদক বিষয় নয় বলিয়া তাহা আপনা আপনি উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহা সাধুকৃপা বাহনা এই কৃপা আ...গের সংকেত মন্ত্র পরমকৃপালু মহাপ্রভু প্রদান করিয়াছেন।

অপ্রাকৃত এই ভাগবতীয় প্রেমের অনুভবে অন্তরে অপার্থিব আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইয়া পরাশক্তি লাভের পথে পদক্ষেপ ঘটে। এবং জীবনিষ্ঠ প্রেম প্রীতি ভগবৎ নিষ্ঠায় পর্য্যবসিত হইলেই তাহা ঐশ্বরিক প্রেম পদবাচ্য হয় যাহা নিরুপাধিক বা অনির্বচনীয়। সুতরাং ইহা কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগ দ্বারা লভ্য নয়। ঐকান্তিক ভক্তিতে প্রাণমন যখন পরিপূর্ণরূপে স্নিগ্ধ ও দ্রবীভূত হইয়া বিজাতীয় বিষয় ব্যাপারে অনাসক্তি আনয়ন পূর্বক

ইষ্টে অশেষ মমত্ববুদ্ধি সঞ্চার করে, তখন চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইয়া, সমস্ত অনর্থের অপসারণে অবিদ্যা অর্থাৎ রজস্তমোগুণ নিরাকৃত হয় এবং কেবল মাত্র সত্ত্বগুণ, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান জাগরূক থাকে, যাহা সাধনভক্তি অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া, চিত্তকে সমুজ্জ্বল তথা ভাগবতী ভাবের সহিত একাত্মতা আনয়ন করিয়া অপার্থিব প্রেম চিত্তকে উদ্ভাসিত করে। তখন মহাদাবাগ্নির মত সংসারের দুঃখজ্বালা অন্তরকে আর সন্তপ্ত করিতে পারে না। পক্ষান্তরে সর্বতোভাবে প্রস্তুত ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ক্ষেত্রে তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ভগবৎ প্রেম প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাকে অপ্রাকৃত অনুরাগে সতত আবিষ্ট করিয়া রাখে।

মনই চিন্তার অনুগামী বলিয়া যদি কেহ দূষিত মনে ধর্মকার্য্যও করে, তবে শকটের চাকা যেমন ভারবাহী বলীবর্দ্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলে, পদে পদে প্রতীকারহীন দুঃখের বিড়ম্বনা তেমনি ভাবে তাহার পশ্চাদ গমন করে। পক্ষান্তরে নির্দ্দোষ অন্তরে সঞ্চারিত অপ্রাকৃত প্রেমের নিকট ভগবান অসীম হইয়াও সসীমরূপে প্রতিভাত হন [illegible] নিরাকার হইয়াও সকল এবং নির্বিষয় হইয়াও ভক্তহৃদয়ে সদা ক্রিয়াশীল হইতে থাকেন। ভগবান কর্তৃক আশ্রিত ভক্তজীবনে কোন বিপদ আসিতে পারে না। অধিকন্তু সদ ভক্ত হৃদয় বন্দন [illegible] — [illegible] প্রেম যাহা ভগবৎ অভিপ্রায়েই অর্পণ, তাহা পুনরায় গ্রহণ করিবার জন্য ভগবান লালায়িত হইয়া পড়েন। তাৎপর্য্য এই সূর্য্যের উত্তাপে আবার বাষ্পাকারে ঊর্দ্ধ উত্থিত সমুদ্রজল, ক্রমে মেঘরূপে পরিণত হইয়া যেমন বৃষ্টিধারায় পুনরায় সমুদ্রে পতিত হয়, সেইরূপ ভক্ত হৃদয়ে ভগবৎ প্রদত্ত প্রেমবারি ক্রমে ভক্তিরসে রূপান্তরিত হইয়া নশ্বারক আকর্ষণে আবার ভগবদভিমুখীন হয় অর্থাৎ ভগবান হইতে ভক্তহৃদয়ে বিচ্ছুরিত ভগবৎপ্রেম সাধনভজনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে সেই মহাপ্রেমের অপরিসীম মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য প্রেমিক ভগবানের লালসা জাগে ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মনের সিদ্ধান্ত।

উল্লেখযোগ্য যে উপরোক্ত ভাগবতীয় প্রেমরসের মধ্যে যে অপার্থিব মনোহারিতা নিহিত রহিয়াছে যাহা ভগবদ্ভক্তগণ সতত পরিতৃপ্তির সহিত অনুভব করিয়া থাকেন, তাহা সত্ত্বগুণজাত কোনরূপ সাত্ত্বিক আনন্দ নহে, কিংবা জ্ঞানমার্গের সাধকগণের ব্রহ্মানুভূতিজনিত সন্তোষলাভ অথবা যোগীগণের মানসিকভাবে পরমাত্মার সহিত মিলনে সুখময় অবস্থায় অবস্থানও নয়। ইহা আনন্দস্বরূপ ভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তি হইতে, অনাদি কালের নিত্য সম্বন্ধযুক্ত জীবহৃদয়ে সঞ্চারিত বিশুদ্ধ চিন্ময় প্রেম। ইহার উৎকর্ষে চিত্তের মালিন্য অপসারিত হইয়া দর্পণের মত উজ্জ্বল হয়, সংসার দুঃখরূপ অগ্নিদাহ

নির্বাপিত হয়; জীবনের যাহা কিছু ভাল তাহা শতদলের মত বিকশিত হয়; জ্ঞানবিদ্যারূপ সঙ্গিনীগিকে প্রমত্ত করিয়া অন্তরের আনন্দ সমুদ্রে মত্ত উদ্বেলিত হয়, অমৃতের আস্বাদনরূপ এই আনন্দ সায়রে, ভক্তহৃদয নিয়ত অবগাহন স্নানে রত থাকে, ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার অন্তর্গত।

সর্বজনের আদর্শ স্থানীয় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, যাহা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু আপনি আচরণ করিয়া আপামর জগতবাসীদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা ব্যবহারিক জগতে অনন্ত প্রকৃতির সহিত অনাদি পুরুষের নিত্যলীলা। ইহার প্রকাশিত দিকটি মানবীয় এবং অন্তরের আস্বাদনের দিক আত্মিক। তাই বহু বিদ্যা নয়, প্রভূত জ্ঞান নয়, অনেক অভিজ্ঞতা নয়, অন্তরের আন্তরিক অনুভূতির আত্যন্তিক আলোকেই সেই পরম সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে ঘনকৃষ্ণবর্ণ মেঘের অভ্যন্তরে শ্বেতশুভ্র বিদ্যুতের রেখা, যেমন চকিতে পরিস্ফুট হইয়াই মিলাইয়া যায়, তেমনি তমসাচ্ছন্ন চিত্তে অপ্রাকৃত ভাগবতীয় ভাব অন্তরিতে আবির্ভাব হইয়াই অন্তর্হিত হয়। কারণ বিপুল আগ্রহ ভরে ভগবৎ অনুধ্যানে মনোনিবেশ করিলেও দুঃখ সুখের আবেশ বিহ্বল বহির্মুখীন চমকিত চিত্তে, হঠাৎ আগত বিগতদিনের ধূসরস্মৃতি, আরাধনার অভিনিবেশে আবিলতা আনিয়া অন্তরের আবিষ্টভাব তিরোহিত করে। তাই চঞ্চলমতি, জীবিকার চিন্তায় সদা ব্যস্ত, অল্পায়ু, কঠিনসাধনে অপারক, কলিহত জীবের পক্ষে, মঙ্গলময়, পরমপুরুষের প্রণিধান সর্বক্ষণ সহজভাবে ধরিয়া রাখিয়া, অন্তরে নিরন্তর নির্মল আনন্দলাভ করা সম্পর্কে, শ্রীমন্মহাপ্রভু মহানাম মন্ত্রই একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন।

উল্লেখযোগ্য যে হরি নামের ব্যবহারিক দিকটি এমনি অদ্ভুত যে হেলায় বা শ্রদ্ধায় গ্রহণ করিলেও, তাহা চেতনাকে সুস্থ করে, মানসিকতাকে সঠিক পথে লইয়া যায় এবং পারমার্থিক রুচিবোধ জাগাইয়া তোলে। বিশ্বপতির সহিত বিশ্ববাসীর অনায়াসে যুক্ত হইবার নিখিল শাস্ত্রসম্মত এই তত্ত্বসন্দেশ কোনকালেই অর্পিত হয় নাই। এবং সেই বস্তুর দানই মহাদান বলিয়া গণ্য হয়, যাহা কাহারও পক্ষে কোন মতেই পাইবার উপায় ছিল না। কলিকলুষ নাশন শ্রীশচীনন্দন, গৌরহরি, চৈতন্য মহাপ্রভু উজ্জ্বল শৃঙ্গার রসদ্বারা পরিপুষ্ট চিরঅনর্পিত এই রাগাত্মিক ভক্তি পথ প্রকাশিত করিয়া কলি প্রভাবিত জীবকে ইহলোকে পরম স্বস্তি এবং পরলোকে ভগবৎ সান্নিধ্যরূপ মহান শান্তিলাভের সর্বোত্তম, অথচ অনায়াস সাধ্য পথের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন বলিয়াই, তিনি দাতা শিরোমনি বলিয়া সর্বকালে স্বীকৃত।

সমুদ্রের তটকে যেমন সমুদ্র বলাযায় না এবং সমুদ্রের উপরিস্থিত ভূমিও বলা চলেনা, অথচ উভয়ই পরস্পর যুক্ত কিংবা উভয়ের আশ্রয়স্থল, তেমনি

জীব, ব্রহ্ম নয় এবং মায়াও নহে, পরন্তু এই দুইয়ের মধ্যভাগে অবস্থিত, ভগবানের নিত্যসত্তা ও উভয়ের উপাশ্রয়। সমুদ্রের সম্বন্ধবশতঃ তটের অর্থাগমের ন্যায় শ্রীভগবানের সহিত অংশাংশী সম্পর্কে জীবের তটস্থ রূপ নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ সমুদ্র যেমন অনাদি কাল হইতে আছে, তাহার উপকূল ভূমিরূপে তটও রহিয়াছে এবং সেইহেতু উভয়ের প্রীয়মান সম্পর্ক।

সদা সংলগ্ন থাকিয়াও তটভূমিতে [illegible] হওয়ার কারণ সতত সমুদ্র সংলগ্ন রহিয়াও তট নিজস্ব সত্তা রক্ষাতেই সচেষ্ট। সেইরূপ ভগবানের সহিত নিত্যযুক্ত থাকা সত্ত্বেও দেহে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিয়া তাহাতে তৎপর থাকায় জীবের আত্মস্বরূপের বিস্মরণ ঘটে। তটভূমি যথোৎপন্ন কণ্টকাদিতে বিস্তীর্ণ থাকার ন্যায়, জীবের জীবনও প্রকৃতি গুণজাত কণ্টক-সদৃশ্য সংসার দুঃখে আকীর্ণ। আত্মবিস্মৃত জীবের সংসারাবদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের উপায় সম্পর্কে মহাপ্রভুর উপদেশ এই যে, সুখে দুঃখে ধৈর্য্য ধারণ পূর্বক প্রতিদিবসের যথোচিত কর্মে নিরলস থাকিয়া, ঈশ্বরে সমর্পিত প্রাণ ভক্ত, বাহ্যচেতনায় কীর্ত্তনাদির অনুসঙ্গে এবং আন্তরিক অন্তরঙ্গে নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের অনুগত দাস, প্রিয়তম সহচর, স্নেহময় পিতা, পুত্রবৎসল মাতা কিংবা অনুরক্ত প্রণয়ী কল্পনা করিয়া, তাহারই অনুধ্যানে সর্বক্ষণ নিমগ্ন থাকিলে, চিত্তবৃত্তি তদাকার প্রাপ্ত হইয়া, অন্তর নির্মল হইবে। নির্মল চিত্তেই ভগবৎলীলা বিষয়ে 'শ্রদ্ধা' উপজাত হইয়া, পরিশেষে রুচি, উদ্ভব হয়। রুচির সরসতায় ভাগবতীয় কথামৃতে 'অনুরাগ' আসিয়া, 'রতি' আবির্ভাব হয়। রতি প্রগাঢ় হইলে তাহা কামনাবিহীন 'প্রেমনামে' অভিহিত হইয়া থাকে। সর্বানন্দপ্রদ অহেতুকী এই ভগবৎপ্রেমই প্রয়োজন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিমত।

অতি আধুনিক যুগের ঈশ্বরবিমুখ সমাজে যেখানে জন জীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সুস্থ আত্মিক মূল্যবোধ, ক্রমেই সরিয়া গিয়া আত্মম্ভরিতা ও ভগবৎ স্পৃহাহীনতার প্রাদুর্ভাব দেখা দিতেছে সেই বহির্মুখীন পরিমণ্ডলের সমাজ জীবনে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন ও বাণী আলোচনা করিবার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। সাম্যের মৌখিক গুণকীর্ত্তনে, মনের রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত সমতাভাব আসিতে পারে না। আবশ্যক ভগবৎনির্ভর প্রেমপ্রীতি, যাহার মূলে পরকাল ও পরমেশ্বরের প্রতি অন্তরের অচল বিশ্বাস অবিচলিত। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য যেমন জাগতিক লুক্কায়িত সত্যকে উদ্ঘাটিত করিয়া জগতের ব্যবহারিক কল্যাণ সাধনের উপায় নিরূপণ, ধর্মের লক্ষ্য ও মনের আড়ালে অবস্থিত, পরম সত্যকে দৃষ্টিপথে আনয়ন করিয়া মানব মনের আত্মিক কল্যাণ বিধানের উপায় নির্দ্ধারণ। পক্ষান্তরে সংশয়াত্মা লোকের

পরমাত্মা। পরমেশ্বর সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও, জীবনে দুঃখ আছে, ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই ; কারণ প্রত্যেকের জীবনই কোন এক দুঃখে ভারাক্রান্ত। এই দুঃখানুভূতির মূলে রহিয়াছে পুর্বজন্মের সুখস্মৃতির সংস্কার। এবং সুখময় অখণ্ড আনন্দকে বিস্মরণই দুঃখের হেতু। বিজ্ঞান ভোগের বিবিধ উপকরণ প্রদান করিলেও অন্তরের দুঃখ দূর করিতে পারে না, কারণ একমাত্র পরমানন্দময়ের সহিত যুক্ত হইলেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়, ইহাই ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ ঈশ্বরই সত্যস্বরূপ, কল্যাণস্বরূপ আনন্দস্বরূপ এবং এই ভূমানন্দের সহিত যে যোগসম্বন্ধ বা ভাববন্ধন, মহাপ্রভুর মতে তাহাই "প্রেম"

শাস্ত্রীয় উপাসনার আভিধানিক তাৎপর্য অতিসন্নিধানে একাত্ম হইয়া থাকা কিংবা ঈশ্বরের নিকট বাস করা। ইহাতে ভগবানের সহিত প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনের কথা নাই এবং ইহা কোনকালেই পরিস্ফুটরূপে জানা ছিল না। তাই বেদমতে ঈশ্বর লাভের পথ অতিকষ্টকর, যেন ক্ষুরের ধারের মত শাণিত কিন্তু ভক্তহৃদয়ের স্নেহপ্রীতি প্রেম পরমমৃতময় পরমসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকেই অনুক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছে বলিয়া ভক্তের তখন যতখানি তাঁহার নিকটবর্তী আনন্দ সেই পরিমাণে অনুভূত হয় এবং অবিরত তাহার নাম জপই প্রেমময় কৃষ্ণের সহিত যুক্ত থাকার উত্তম পথ — আপন গভীরতম সত্তার অন্তর্ভাবসিঞ্চিত নিত্যধামের নিভৃত নিকুঞ্জের এই নিগূঢ়বার্তা, জীবলোকের মুক্ত গগনতলে ব্যক্ত এবং সর্বাতিশায়িরূপে নিজ জীবনে প্রকাশ করিয়া, প্রায় অর্দ্ধশত বর্ষপুর্বে কেবলমাত্র হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন মাধ্যমে যেই প্রেমের বন্যা ধনীদরিদ্রের অসমতা জাতিভেদের বৈষম্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের কঠোরতার জটিলতা ঘুচাইয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃত্ববোধের পরম প্রীতিতে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, সেই প্রেমধর্মের প্রচারক ছিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার প্রবর্তিত সহজ সরল ভগবৎ আরাধনা ও মৈত্রধর্মের মহাবাণী সমাজের সর্বস্তরে শ্রদ্ধার সহিত বিস্তার হইলে স্পর্ধিত ধর্মাচরণের কৃষ্ণযবনিকা যাহা ধর্মের নামে, মানুষে মানুষে অন্তরাল সৃজন করিয়া তুলিয়াছে তাহা অনায়াসেই অপসারিত হইয়া ঈশ্বর লাভের যথার্থ পথ সকলের নিকটই সুগম হইবে। ভগবানকে আমরা দেখিতে না পাইলেও, তিনি আমাদিগকে নানা দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়া জীব জীবনের সার্থকতার দিকেই লইয়া চলিয়াছেন তাঁহাকে কেমন করিয়া পাওয়া যায়, কিভাবে তিনি কাহার নিকট ধরা দেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। শাস্ত্রকারগণও এই বিষয়ে নীরব। কারণ ভগবান জড়ীয় বাক্য ও মনের অগোচর। কিন্তু আমরা তাঁহার কথা ভাবিতে পারি। তাঁহাকে চিন্তায় ধরিয়া রাখিতে আমাদের অসুবিধা নাই। এই ভাবনা ও

চিন্তনই ভগবৎ উপাসনা, কিংবা তাঁহার সমীপে উপবেসন। তাঁহার সর্ব গুণসম্পন্ন বিশুদ্ধস্বভাবের উপর চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া, ভক্তিভরে তাঁহাকে ভাবনা করতে হইবে। প্রীতির সহিত হৃদয়কে সর্বদা ভগবৎ ভাবিত রাখিয়া সকল চিন্তায়, সমস্ত কাজে যাবতীয় অবসরে, সমগ্র নিজেকে কেবলই ভগবৎ মুখীন করিয়া চলিতে হইবে যেহেতু চিন্তাই শরীর গঠন করে এবং নিরন্তর ভগবৎ অনুধ্যানে মর্ত্য তনু ভগবতী তনু হইয়া উঠে, তাই প্রতিনিয়তই তাঁহাকে স্মরণে রাখিতে হইবে। তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র মনের মন এবং আমাদের প্রাণমন অতি অজ্ঞাতসারে তাহারই অভিমুখে চলিতেছে, যাহা ইচ্ছাকৃত হয় না, বলিয়াই দুঃখ বিচলিত করে।

কাজেই ভগবানকে পাওয়া নয় নিজেকে ভগবানের ভূমিকায় উন্নীত করিয়া দেবাত্মা হইতে হইবে, তাঁহার স্বভাবের আদর্শে আপনাকে গঠিত করিয়া তুলিবার আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিতে হইবে। তাঁহার নির্মলতার মত বিশুদ্ধত, তাহার শক্তির অনুকরী মঙ্গলময় সামর্থ্য, অবিরত কামনা করিয়া যাইতে হইবে সুখেদুঃখে, কর্মেবিশ্রামে ও সকল কর্মাবসানে। তবেই ঐশ্বরিক পবিত্র চরিত্রের বিমলজ্যোতি আপন আচরণে প্রতিফলিত হইবে যেমন মার্জিত দর্পণেই সূর্য্যরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। জগতের অজস্র পার্থিব আকর্ষণ ও সংসারের বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যাপারের মধ্যে বাস করিয়াও, আমরা যে শান্তিসুখ পাই না, তাহার কারণ সর্বসুখনিলয় ভগবানের সহিত আমাদের যোগ নাই। সেই সর্বসুখদাত সর্বদাই আমাদিগকে তাহার অভিমুখে আকর্ষণ করিয়া চলিয়াছেন, আমাদিগের সুখসমৃদ্ধির জন্য জগৎ জুড়িয়া কত তাঁহার আয়োজন, দিনেদিনে স্তরেস্তরে সকলকেই শতদল পদ্মের মত বিকশিত করিয়া তুলিতেছেন, তাহারই পূজার অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ করিবার জন্য। আমাদের কর্ত্তব্য কেবল সেই অমৃতময় হইতে অবিরত বর্ষিত অমৃত-ধারা ধারণ করিবার জন্য নিজেদের পবিত্র পাত্র করিয়া গড়িয়া তোলা তবেই আমরা ঈশ্বরের সমীপবর্ত্তী হইয়া, ক্রমে নিত্যধামে তাহার সামীপ্যলাভের যোগ্য হইব। ইহাই জীবন্মুক্তি, অর্থাৎ ঈশ আদর্শে উপনীত বা ঈশ্বরানুরক্ত স্বভাব প্রাপ্তি। মানসিকতায় এই ভাব লব্ধ হইলে সংসারে আর পুনরাবর্তন হয়না, জীবলীলা অবসানে গতি হয় দিব্যলোকে, ভগবৎ ধামে, ইহাই মহাপ্রভুর আশ্বাসবাণী। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, ভগবান আছেন, ইহাই শাস্ত্রের শেষ কথা নয়, ভক্তের ভগবান ভক্তের আহ্বানে নিজেই আসেন, জীব যেমন তাঁহাকে সন্ধান করিতেছে, তিনিও তেমনি জীবহৃদয় আকর্ষণ করিয়া তাহাদের খুঁজিতেছেন, নিত্যধামে নিত্য সহচররূপে প্রাপ্ত হইবার ঐশী অভিলাষে।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়পার্ষদ রূপগোস্বামী তাঁহার বিরচিত লঘু ভগবতামৃত গ্রন্থের পূর্বখণ্ডে শাস্ত্রসম্মত উদাহরণ উল্লেখে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কতকগুলি গ্রহ বা জীবলোক আছে, যাহার শীর্ষস্থানীয় সেই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মলোক এবং এমন অনন্ত কোটি ব্রহ্মলোকের বীজরূপে অবস্থিত রহিয়াছে, এক অবিনাশী নিত্যলোক, যেখানে অবতার পুরুষগণ এবং ভগবৎ পারিষদগণ নিত্য বিরাজিত। ভগবৎলীলার অনুগত ও আনুসঙ্গিক প্রয়োজনেই তাহাদের ভূতলে আগমন ঘটিয়া থাকে। বেদান্তদর্শনে জগতের বিচিত্র ব্যাপারকে ব্রহ্মের লীলা বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে এবং বিলুপ্তপ্রায় ভাগবত ধর্ম পুনরায় সংস্থাপন কিংবা বিশেষ কোন কার্য্য নির্বাহের জন্য মহামানবরূপে ভগবানের ভূতলে অবতরণ, সেই লীলাবিলাসেরই অন্তর্গত। শ্রীগীতার সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্বিংশতি শ্লোকে এবং নবমঅধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে ভগবৎ বাক্য প্রাসঙ্গিক অনুধাবনীয় যে বুদ্ধিহীন মূঢ়ব্যক্তিগণই প্রপঞ্চাতীত ভগবানের মনুষ্যদেহাশ্রিত লীলাবিগ্রহ ধারণকে বুঝিতে পারে না। কারণ অপ্রপঞ্চ অর্থাৎ অলৌকিক স্বমহিমার প্রতিষ্ঠা হইতে, লৌকিক অধিষ্ঠানে অবতরণই অবতার কিংবা ভগবানের মূর্ত্তরূপ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্মমতে ভগবান আনন্দস্বরূপ ও রসময় এবং তাঁহার সহিত জীবের একটি অহেতুক প্রীতির সম্বন্ধ স্বীকৃত। জীব কেন তাঁহাকে পাইতে চায় জানে না, অথচ সকল বিষাদ অবসাদ দূর করিবার জন্য, তাঁহার উপর নির্ভর না করিলেও চলে না। পার্থিব অজস্র ভোগোপকরণ এবং সীমাহীন বিলাসবৈভবের বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে বাস করিয়া নানাক্রমে ব্যাপৃত থাকিলেও, কোন কিছুতেই পরিতৃপ্ত পরিতোষ পায় না, মন আপন অজ্ঞাতসারে যেন কোন এক প্রেমিক পুরুষেরই অবিরত অনুসন্ধান করিয়া ফিরে। পক্ষান্তরে জীব যেমন ভগবানকে পাইতে চায়, ভগবানও তেমনি তাঁহার অনন্তমাধুর্য্যের বিশ্বব্যাপিনী মাধুরীদ্বারা ভক্তহৃদয়ের সমস্ত শোকতাপ বিক্ষোভের কুহেলিকা ভেদ করিয়া, অসংখ্য কাজের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক্ষুদ্র স্বার্থ চিন্তায় আড়ষ্ট, নানা আচরণ অনুষ্ঠানের আভরণে আবদ্ধ, তাহার স্বাতন্ত্র্য চিত্তকে স্বীয়াভিমুখীন করিতে চাহিতেছেন। কারণ ভগবদ্রূপে পূর্ণতাপ্রাপ্ত জীবকে তাঁহার প্রয়োজন আছে। তাই অজ্ঞান অন্ধকারে আবিষ্ট জীবের অন্তরে, তাঁর জ্যোতির্ময় প্রকাশের প্রয়াস, বহির্মুখ অসত্য হইতে সত্য স্বরূপের প্রতি আগ্রহ আনিবার আকূতি, মৃত্যুময় জগৎ হইতে অমৃত ধামের পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা। আলো জ্বলিলেই যেমন আঁধার ঘর আলোকিত হয়, তেমনি স্ব-প্রকাশ অন্তরে প্রকাশিত হইলেই, সকল অন্তরায় অপসারিত হইয়া যায়। অপরদিকে জীবচিত্তকে, বহির্মুখীন রাখিবার

উদ্দেশ্যে জগৎ জুড়িয়া কতকিছুর বিপুল সমাবেশ ; কতবিধ কর্মের কোলাহল ; কত রকম পাতার মর্মরধ্বনি, নদীর কলস্বন, ভ্রমরের গুঞ্জনগীতি, বিহঙ্গের কাকলি। জগৎ রচনার কতই সমারোহ, কত যে বৈচিত্র্য, কতকি সৌন্দর্য্য, কতপ্রকার কলাকৌশল কতপ্রকারের ফলশস্য আহারের কতনা বিপুল আয়োজন। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক নিয়মে সবকিছুর সরবরাহ অব্যাহত রাখিয়াও, মানব-জীবন হইতে শান্তিবস্তুটি সরাইয়া রাখিয়াছেন, নতুবা জীব তাহার দিকে তাকাইবে না। ইহাই লীলাময়ের লীলাবিলাস। একদিকে ঢেউয়ের আহ্বান ; অন্যদিকে তীরভূমির আকর্ষণের মত, তটস্থ জীবের অন্তরে অন্তর্য্যামীর আকর্ষণ, বাহিরে বহির্জগতের প্রতি মোহঘোর। অধিকন্তু অলৌকিক আনন্দের ভার প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রেমিক-ভক্তকে, নানাভাবে বঞ্চিত করিয়াও জাগতিক দুর্দ্দশায় ফেলিয়া, ধৈর্য্যঅধ্যবসায়ের সাধনা পরীক্ষা করিতে, অন্তরে অপার বেদনার বিধান করেন, যেহেতু মহৎসুখ দুঃখের দারুণ মূল্যেই লাভ করিতে হয়।

জীবমাত্রকেই কর্ম করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে হয়। কিন্তু কর্ম যখন কেবল আপন স্বার্থে নিয়োজিত ; নিজ লোভের আধিক্যে জর্জ্জরিত, তখনই তাহা বন্ধন সৃষ্টি করে। পরন্তু কর্মফলের প্রত্যাশা না করিয়া লাভ-অলাভ, জয়পরাজয় ভাবনা যদি ভগবৎ উদ্দেশ্যে সদা নিবেদিত থাকে, তবে তাহাই ধর্মাচার পর্য্যবসিত হয়। পক্ষান্তরে ভগবানই পুত্র-কন্যারূপে আমাদের প্রীতিস্নেহ, দীনরূপে দয়ার দান গ্রহণ করিতেছেন এই ভাবনার অনুবর্ত্তী হইয়া যখন সেবাযত্ন করা হয়, অপরের উপকার করা যায়, পূজারূপে তাহাও ঈশ্বরের নিকট পৌঁছায়। সুতরাং আনন্দময় ভগবান অমৃতরূপে সকলের মধ্যে প্রবহমান, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কর্মে প্রবেশের ক্ষমতা অর্জ্জনই আধ্যাত্মিকতা। ইহার বাহ্যিক প্রকাশ বুঝা না গেলেও, ইহা মনের অবসাদ জনিত অসারতা অপসারিত করিয়া চিত্তকে ঈশ্বর চিন্তনে নিযুক্ত রাখে। তাই অন্তরে ভগবানের প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া, কর্মে অনাসক্ত থাকিয়া যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করিবার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য দেব।

অন্তরের বাসনার নির্বাসনই সংসারমুক্তি। অতএব সর্বতোভাবে লোভ মোহ, অহঙ্কারের অভিমান দমন করিয়া প্রবৃত্তিকে ভগবানের পদপ্রান্তে সংযত রাখিয়া, দেহেমনে, অন্তরেবাহিরে, জ্ঞানকর্মে ভগবৎ মহিমায় উপলব্ধিতে আপন কর্ত্তব্যকর্ম সুচারুরূপে করিয়া যাইতে হইবে। তবেই অমৃতস্বরূপ অন্তরাত্মার নিভৃতস্থানে দেখা দিবেন। তাঁহার অমৃত আহ্বান জীবনে ধ্বনিত প্রতি-ধ্বনিত হইতে থাকিবে, অন্তরের সুপ্তচেতনা প্রাণপণ বলে উদ্বোধিত হইয়া উঠিবে। তখন আর্ত্তের আশ্বাসদাতা, ভীতের ভয়ত্রাতা, ভগবান অন্তরে আগমন করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও অভিরুচিকে এমনিভাবে পরিচালিত

করিবেন, যাহাতে সকল সংশয় নিমিষে নাশ হইয়া যায়। উল্লেখযোগ্য যে, উপদেশ গ্রহণ করিয়া যে শরণাগতি, তাহা অনবদ্য হয় না। অন্তরের স্বতঃ আকর্ষণে যাহার আত্মা সর্ব্বতোভাবে সমর্পিত তাহার পক্ষে ভরসা পাইবার আবশ্যক নাই ভগবানের সহিত আপনজনের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহার প্রতি আনুগত্যময়ী মমতা আসিলেই ইহা সম্ভব ইহাই মহাপ্রভুর অভিমত।

আদিপর্ব্বের পূর্ব্বাভাষ

'ঐ মহামানব আসে, দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে মর্ত্ত ধূলার ঘাসে ঘাসে। সুরলোকে বাজে জয়শঙ্খ, নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক, এল মহাজন্মের লগ্ন।"

বর্ত্তমান সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের তীর্থক্ষেত্ররূপে সমাদৃত, পশ্চিম বঙ্গের নদীয়াজেলার অন্তর্গত, গঙ্গাতীরে অবস্থিত ক্ষুদ্রসহর, শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান। একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নবদ্বীপ নগর বল্লালসেনের রাজধানী ছিল। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ও গুণগ্রাহী ছিলেন বলিয়া ঐ সময়ে বিদ্যাচর্চার ঐশ্বর্য্যে, নবদ্বীপ ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। কবি জয়দেব লক্ষ্মণসেনের পুত্র বল্লালসেনের রাজসভাসদ ছিলেন। লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করিয়া মোসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইবার পর পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত নবদ্বীপের বিদ্যাচর্চা ক্রমশঃ ম্লান হইয়া, বিদ্যা-কেন্দ্র সমূহ ক্রমে লোপ পাইতেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে নব্যস্মৃতির প্রবর্ত্তক রঘুনন্দন এবং তন্ত্রশাস্ত্র সংগ্রহকর্ত্তা কৃষ্ণানন্দআগমবাগীশ প্রভৃতির খ্যাতি সারাভারতে ব্যাপ্ত হইয়া নবদ্বীপে বিদ্যার যশগৌরব আবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু পাণ্ডিত্যের বিভবে ও প্রতিষ্ঠার প্রভুত্বে তৎকালীন নবদ্বীপ বাংলার মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও, একদিকে বিধর্মী মোশলমান শাসকগণের উপদ্রব ও অপরদিকে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের সহানুভূতির অভাবে, পণ্ডিত সমাজে প্রেম ও ভক্তির অনুশীলন ম্রিয়মান হইয়া প্রাত্যহিক সমাজজীবনে বিজাতীয় বিলাসের উশৃঙ্খলতা ও শুষ্ক পাণ্ডিত্যের অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। উৎকট সামাজিক বিচার ব্যবস্থার উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ, ইসলাম ধর্মের উদার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পড়িল। বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের সেই ঘোর দুর্দ্দিনের মহা সঙ্কটসময়ে প্রেম ও ভক্তির আবেগময়ী মানবধর্ম্মের আদর্শ সংস্থাপন করিয়া নবীনযুগের উদ্বোধন করিতে, মহামানবের আবির্ভাব আসন্ন হইয়া আসিল।

এই সমকালীন সময়ে পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্টজেলার ঢাকা দক্ষিণ গ্রাম নিবাসী, শ্রীচৈতন্যদেবের পিতৃদেব বাৎস্য গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্র, তাঁহার পিতৃদেব উপেন্দ্র মিশ্রের আগ্রহে নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে আসিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্যের নিমিত্ত 'পুরন্দর' আখ্যা পাইয়াছিলেন। পাঠ সমাপনান্তে

নবদ্বীপেই চতুষ্পাঠী স্থাপনকরিয়া স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত করিলেন। তাহার অতুলনীয় রূপ ও অসাধারণ বিদ্যাবত্তায় আকৃষ্ট হইয়া নবদ্বীপ নিবাসী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী জ্যেষ্ঠা কন্যা শচীদেবীর সহিত বিবাহ দেন। উপর্য্যুপরি আটটি কন্যাসন্তান বিনষ্ট হইবার পর এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে,—নাম রাখা হয়, বিশ্বরূপ। পুত্রের বয়স যখন আনুমানিক আট বৎসর, তখন স্ত্রীপুত্রসমভিব্যাহারে বৃদ্ধ পিতামাতাকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীহট্টে পিতৃগৃহে গমন করিলে ১৪০৬ শকাব্দে মাঘমাসে শচীদেবী সেখানে পুনরায় সন্তান সম্ভবা হন।

ইহার কয়েকমাস পরে, পুত্রবধূর গর্ভে স্বয়ংভগবান প্রবিষ্ট হইয়াছেন এবং তিনি নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে প্রকাশ পাইবেন — মাতা শোভাদেবী এইরূপ স্বপ্নদর্শন করায়, তাঁহার নির্দ্দেশে বিজয়াদশমীর অব্যবহিত পরে, তীর্থযাত্রীগণের সহিত জগন্নাথ মিশ্র সপরিবার নবদ্বীপ নগরে নিজগৃহে প্রত্যাগমন করেন। উল্লেখযোগ্য যে, তৎকালে গঙ্গার পশ্চিম পারে অবস্থিত বর্ত্তমান নবদ্বীপধামকে বলা হইত 'কুলিয়া গ্রাম' এবং গঙ্গাভাগিরথী বিধৌত অপর পারে ছিল বল্লাল সেনের রাজধানী নবদ্বীপ নগর।

এইদিকে মাঘ মাস অতিক্রম হইলেও কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়ায় চিন্তিত জগন্নাথ মিশ্র প্রখ্যাত তান্ত্রিক জ্যোতিষী ও গণক, শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে সংবাদ জ্ঞাপন করিলে তিনি গণনা করিয়া বলিলেন যে শচীর গর্ভে কোন মহাপুরুষ জন্ম নিয়াছেন এবং তিনি অতি সত্তর নিকটবর্ত্তী কোন শুভ মুহূর্তে প্রকাশিত হইবেন। এদিকে দুইমাস কাল পূর্বে গৃহপ্রান্তে অবস্থিত একটি বৃহৎ নিম্ববৃক্ষের নীচে পর্ণসূতিকাগার নির্ম্মিত হইয়া রহিয়াছে সন্তান প্রসবের প্রতীক্ষায়। ক্রমে মধুময় মধুমাস সমাগত হইল। গঙ্গাতীরস্থ অগণিত বিদ্বজ্জন পরিশোভিত, বিদ্যানগরী নবদ্বীপে, ১৪০৭ শকাব্দের মনোহর ফাল্গুন মাসের ত্রয়োবিংশতি দিবসে পূর্ণিমা তিথিতে অর্থাৎ ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসের আঠার তারিখে প্রায়ঃ সন্ধ্যাকালে চন্দ্রগ্রহণকালীন শঙ্খনিনাদ ও সমবেত হরিধ্বনির আনন্দ উল্লাস অভিব্যক্তি সময়ে এবং গঙ্গাঘাটে উপনীত পণ্ডিত মণ্ডলীর বিদ্যাবত্তা কিংবা ভক্তিশ্রেষ্ঠ উচ্চস্বরে উচ্চারিত এই তর্ক তরঙ্গের মধ্যে, বিদ্যা ও ভক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীশচীনন্দন চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন।

অপূর্ব সুলক্ষণাক্রান্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং গলিত কাঞ্চনের মত গাত্রবর্ণ, অদৃষ্টপূর্ব সদ্যজাত পরমসুন্দর দিব্যশিশুকে দেখিয়া, ধনাঢ্য প্রতিবেশিগণ প্রভূত রজতমুদ্রা, সুবর্ণমোহর, স্বর্ণ নির্মিত বিচিত্র অঙ্গদ, কাঞ্চন প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কার উপহার প্রদান করিয়া, নাম বলিলেন 'গৌরাঙ্গ' অর্থাৎ গায়ের রং যার ফরসা। কয়েক বৎসর যাবত দেশব্যাপী অনাবৃষ্টি জনিত

নিদারুণ মন্বন্তরের বিপত্তি চলিবার পর, ঐ বৎসর শীতকালীন আমনধান্যের অভূতপূর্ব ফলনে দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইয়াছিল লক্ষ্য করিয়া, মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী নাম রাখিলেন, 'বিশ্বম্ভর' যেন বিশ্বের ভরণকর্ত্তারূপে আবির্ভূত। পূর্ণিমাসীর উদিতচন্দ্রের উজ্জ্বলপ্রভার সময়ে ভূমিষ্ঠ হওয়ায় পণ্ডিতবর্গ নাম স্থির করিলেন, 'গৌরচাঁদ'। নিমগাছের তলায় জাতক বলিয়া মাতা শচীদেবী "নিমাই" বলিয়া ডাকিতেন এবং যুবকবয়সে তিনি সর্বত্র 'নিমাই পণ্ডিত' নামেই সুপরিচিত ছিলেন। ঈশ্বরবিমুখ জীবগণকে সর্বচিত্ত আকর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচেতনার উদ্বোধনে প্রণোদিত করিবেন বলিয়া সন্ন্যাসগ্রহণকালে দীক্ষাগুরু প্রদত্ত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন পরবর্ত্তীকালে এই নামেই বিশ্বব্যাপী সুবিদিত

আদিপর্ব্ব

"হৃদয়নন্দনবনে, নিভৃত এ নিকেতনে এস হে আনন্দময় এ। চিরসুন্দর

প্রতিপদের চাঁদ যেমন প্রতি কলায় বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে পূর্ণচন্দ্রের আলোকে জগত উদ্ভাসিত করে, শিশু নিমাই তেমনি ক্রমশঃ বয়সে বাড়িয়া তাঁহার সুগোল মস্তকের কুঞ্চিত কেশদাম আকর্ণবিস্তৃত কমলনয়ন প্রশস্ত বক্ষপ্রান্তে আজানুলম্বিতবাহু, অরুণাধরে মৃদুমধুর হাসি বীণানিন্দিত সুমধুর কণ্ঠস্বর এবং কন্দর্পতুল্য রূপশোভায় সকলের বিমুগ্ধনেত্রে ও স্তব্ধ-বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিবার বস্তুবিশেষ হইয়া পড়িল। অনেকেই নানাবিধ সুমিষ্ট খাদ্য আনিয়া দিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধানে লালায়িত হইত। এইভাবেই স্নেহপ্রীতি, ভালবাসার মধ্য দিয়া শৈশবকাল অতিবাহিত হইয়া বিদ্যারম্ভে দিন সমাগত হইল।

গৃহে বর্ণমালা ও ব্যাকরণ আয়ত্ত করিবার সময়, তাঁহার একাগ্রচিত্ত বিদ্যাভ্যাস পটুতা ও অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, পিতৃদেব জগন্নাথমিশ্র, অতি উৎসাহে উচ্চতর বিষয় অধ্যয়নের জন্য ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে সপ্তমবর্ষে উত্তীর্ণ পুত্রকে তৎকালে খ্যাতিমান পণ্ডিত গঙ্গাদাসের টোলে ভর্ত্তি করাইয়া দিলে, অনন্যসাধারণ ধীশক্তিবলে, অত্যল্পকালেই সকল পড়ুয়াগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিলেন। ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণপূর্বক গৃহত্যাগ করিলে, বিমর্ষ নিমাই খেলাধূলা উপেক্ষা করিয়া সর্বক্ষণ অধ্যয়নেই নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। মধ্যাহ্নে স্নান-কালে গঙ্গাঘাটে সহাধ্যায়ীগণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বৃথাকথা না বলিয়া শাস্ত্রগ্রন্থাদির বিশেষ কোন দুরূহ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া, পরস্পর আলোচনায় আনন্দলাভ করিতেন। কিন্তু কেহই তাঁহার সহিত যুক্তিতর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। এই অল্পবয়সেই অপরের মত অনায়াসে অতিক্রম করিয়া

যুক্তিসহকারে নিজের সিদ্ধান্ত স্থাপনপূর্বক, পরক্ষণেই কৌতুকভরে স্বপ্রতিষ্ঠিত ব্যাখ্যার খণ্ডন দেখাইয়া, সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। ভক্তিপ্রবণ ব্যক্তি দেখিলেই তর্ক করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিবার ব্যগ্রতা যেন বাড়িয়া যাইত।

নিম্ন শ্রেণীতে অবস্থান ব্রাহ্মণ বাড়ীতে এবং শব্দদের প্রবাস হয় অক্লান্ত কৈশোরের চঞ্চল আলেয়ার মধ্য দিয়াই নয় বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের প্রগল্ভতা জনিত আক্ষেপের অশান্তিতে তিক্তমন নিয়াই, উপনয়নের দিন ধার্য্য করিলেন এবং আচার্য্য গুরুরূপে কর্ণে গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করিবামাত্র সমস্ত দেহ পুলকিত ও সর্বঅঙ্গ হইতে অলোকসাধারণ জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া উপবীতী নিমাই ক্ষণকালের মধ্যেই ভাবাবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন

বেদমন্ত্রের এমনি মহিমময় শক্তি যে উপযুক্ত ব্যক্তিকর্তৃক অনবরত উচ্চারণে কিংবা শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণে মনের সকল সংশয় নিমেষেই নাশ হইয়া, সমগ্র প্রাণ ভরিয়া উঠে অলৌকিক আনন্দে। জ্ঞানগঙ্গার আদি উৎস বেদমাতার ত্রিপাদ গায়ত্রী মন্ত্রজপে, সাধকের প্রাণের কন্দর হইতে যে প্রকার রসঘন অমৃত আনন্দের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা দীপ্ত দীপ্তিমান, যেন বজ্রসম বর্ণিমান সুতরাং নিমাইচন্দ্রের হৃদয় এই বেদমন্ত্রের দিব্য প্রভাবের কল্যাণস্পর্শে বিভোর হইয়া পড়িলে তাহাতে বৈচিত্র্য কিছুই নাই।

সকলে সন্তর্পণে চেতন করাইবার পর দেখা গেল, নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত, স্থিরস্থিতির যোগাসনে উপবিষ্ট মুণ্ডিত মস্তকের মুখমণ্ডল বিদ্যুতের ন্যায় বিস্ফুরিত অলৌকিক দীপ্তির স্বর্গীয় প্রভায় উদ্ভাসিত, যেন স্বয়ং শাশ্বতীমূর্তি গায়ত্রীদেবী নবীন ব্রহ্মচারীর দেহে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। পুত্রের তনুভাতি পিতার ভ্রান্তির আঁধার অপসৃত করিয়া, অবিশ্বাসের প্রদোষপ্রহরে দেখা দিল, আলোর আশ্বাস। মৌনের সাধনায় মৌনব্রতী, অসীমের উৎসঙ্গে সমাহিত, চেতনার মহাতীর্থে তন্ময়, নিশীথের ম্লান আকাশে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের মত, রূপমৌন তনুদর্শনে আনন্দিত পিতৃদেব নামপ্রদান করিলেন 'গৌরহরি,'

কালচক্রের আবর্তনে বয়স দশবৎসর পূর্ণ হইবার অব্যবহিত পরে ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে পিতৃদেব জগন্নাথমিশ্র পরলোক গমন করিলে, পিতৃশোকে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেও, অসীম ধৈর্য্যে পরমজ্ঞানী ব্যক্তির মত, শোকে মুহ্যমান মাতাকে, ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে উক্তি করিলেন, বৃক্ষে ফল জন্মিলে, একদিন যেমন তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ নশ্বর দেহের মৃত্যু হইবেই, ইহার চাইতে সংশয়াতীত সত্য জগতে আর নাই। মৃত্যুকে কেহই কোন উপায়ে এড়াইতে পারে না। যখন দেহ জন্মে, মৃত্যুও সাথেই দেহকে আশ্রয় করে। জড়দেহের বিনাশকাল উপস্থিত হইলে, জীবাত্মা পূর্বদেহ ত্যাগ করিয়া, অন্যদেহ

ধারণ করে ; যেহেতু জীবাত্মার বিনাশ নাই এবং রহস্যাবৃত ও দুরধিগম্য এই ব্যাপারে কর্ম্মাধীন জীবেরও কোনরূপ স্বাধীনতা নাই। উপরন্তু জীবমাত্রেই পঞ্চভূতের দেহলাভ করে, আপনাপন কর্ম্মফলে এবং কর্ম্মফলদাতা দৈবশক্তি কিংবা কর্মবিধাতা, জীবাত্মাকে যথাযোগ্য দেহে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইবার কালে, পূর্ববর্ত্তী দেহাশ্রিত "মন" সেইসঙ্গে অনুগমন করিয়া চলে। এইকারণে মরণকালে যেই ভাবনার অনুগামী হইয়া দেহত্যাগ হয় 'মন' জীবাত্মাকে সেই অভিমুখে পরিচালিত করে। সন্দেহাতীত গীতোক্ত এই ভগবৎবাক্যের অনুসরণে, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়, সদা ঈশ্বরচিন্তা-পরায়ণ পিতৃদেবের ভগবৎধামেই সর্বোত্তম গতি লাভ হইয়াছে। এই বলিয়া মাতৃদেবীর ইষ্ট বিয়োগজনিত দুঃখ কথঞ্চিৎ অপনোদন করিয়া, গঙ্গাতীরে গভীর নিষ্ঠার সহিত পিতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন।

অতঃপর কালবশে শোকের তীব্রতা কিছু প্রশমিত হইলে, গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পুনরায় অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করিয়া, অপূর্ব অভিনিবেশে, মাত্র চারি বৎসরকাল মধ্যেই, সমগ্র কলাপ, সমস্তস্মৃতি, সম্পূর্ণ বেদ, যাবতীয় উপনিষদে বুৎপত্তি লাভের পর, ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে, ন্যায়-শাস্ত্রে বিশেষ পাঠ গ্রহণ করিবার জন্য, অন্য টোলে প্রবেশ করেন। এই সময়েই নব্যন্যায়ের একটি অভিনব ভাষ্যরচনা করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। তৎকালে একই টোলের সতীর্থ রঘুনাথও ঐসময়ে ন্যায়শাস্ত্রের 'দীধিতি' লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদিন একযোগে নৌকায় গঙ্গাপার হইবার কালে নিমাই নিজ লেখা হইতে কৌতূহল ভরে কিছুটা পড়িয়া শুনাইবামাত্র, বিচলিত রঘুনাথ অকস্মাৎ অশ্রমোচনে বলিলেন, নিমাইকর্তৃক দুইছত্রেই অপূর্বরূপে পরিস্ফুট করা ভাবার্থ তিনি দশপাতাতেও এমন পরি-পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতে না পারায়, অতঃপর তাহার অর্থবিন্যাস কাহারও গ্রহণযোগ্য হইবে না এবং নিমাইর ভাষ্য প্রকাশিত হইলে, নিজের ভাষ্যদ্বারা প্রসিদ্ধিলাভের প্রত্যাশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। নিষ্ফল ন্যায়শাস্ত্রের বৃথাচর্চা এখনই পরিত্যাগ করিলাম, ক্রন্দনরত রঘুনাথকে এইকথা বলিয়া নিমাইপণ্ডিত, স্বীয়শ্রমসাধ্য রচনা তৎক্ষণাৎ গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন।

সেইদিন হইতে ন্যায়শাস্ত্র পড়া ত্যাগ করিয়া নিমাই নিজেই টোল স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়া, মুকুন্দসঞ্জয় নামক জনৈক ধনী ও বিদ্যানুরাগী ব্রাহ্মণের বহির্বাটির এক অংশে স্থান নির্বাচন করিলেন এবং মহোল্লাসে শুভদিনে অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। বয়স তখনও ষোল পূর্ণ হয় নাই। অত্যল্প বয়সে, খ্যাতিমান প্রৌঢ়পণ্ডিতের নিবাসস্থল নবদ্বীপ নগরে এককভাবে এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াকে, অনেকেই বাতুলতা

বোধ করিয়াছিল কিন্তু তরুণ নিমাই শিক্ষাদান কার্য্যে শীঘ্রই যশস্বী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পড়াইবার পদ্ধতি এমন অভিনব ছিল যে, মাত্র ছয়মাসের মধ্যেই বিদ্যার্থীগণ কৃতবিদ্য হইয়া, পণ্ডিতসমাজ কর্তৃক প্রদত্ত উপাধিলাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারিত। ইহাতে নবীন অধ্যাপক নিমাইপণ্ডিতের খ্যাতি নবদ্বীপের সীমা অতিক্রম করিয়া বিস্তৃত হইল।

অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইবার পর প্রাত্যহিক জীবনধারাও ছিল সুব্যবস্থিত। অতি প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য ও আহ্নিক সমাপন করিয়া, টোলে গমন করিতেন। মধ্যাহ্নে ছাত্রগণের সহিত গঙ্গাস্নানে যাইতেন। অপরাহ্নে প্রিয়জনের সহিত একত্রিত হইয়া নগর ভ্রমণে নির্গত হইতেন। সায়ংকালে চন্দ্রালোকবিধৌত গঙ্গাতীরে নিকটে বর্তমান পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রাদির আলোচনায় নিমগ্ন থাকিতেন। চঞ্চলবালশিরোমণি, নিমাইপণ্ডিতের তৎকালীন অটল ও গম্ভীর ভাবমূর্ত্তি দেখিয়া, বৃদ্ধ ও প্রাচীন অধ্যাপকগণও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িতেন।

অনতিকাল মধ্যেই অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া উঠিলেও ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় জনসমাজে তাঁহার ঐশী শক্তির বিভূতি অপ্রকাশিতই রহিয়া গিয়াছিল। ইতিমধ্যে সমগ্র ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে পরাভূত ও জয়পত্র হস্তগত করিয়া কেশবকাশ্মীরী নামে কাশ্মীর দেশীয় জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া তথাকার পণ্ডিতসমাজকে শাস্ত্রবিচারে আহ্বান করিলে, সকলেই পরাভবের আশঙ্কায় হতচকিত হইয়া পড়িলেন। কারণ তাঁহারা জনরবে বিশেষ অবগত ছিলেন যে, ইনি গুপ্তবিদ্যাবলে সরস্বতীর শক্তিপ্রাপ্ত।

তখন গ্রীষ্মকাল, অপরাহ্নের নিরুত্তাপ পদক্ষেপে, প্রখর রৌদ্রতাপ অতিক্রান্ত, জ্যোৎস্নাময়ী প্রদোষে নিমাইপণ্ডিত যথাপূর্ব গঙ্গাঘাটে বসিয়া সমাগত সজ্জনগণের সহিত, শাস্ত্রালাপ ও কৌতুক রহস্যে নিযুক্ত। এমন সময় গঙ্গাতীরে পরিভ্রমণরত কেশবকাশ্মীরী, দেবোচিতরূপ, অথচ বালকোচিত স্বভাব নবীন অধ্যাপককে বিস্মিত করিবার অভিপ্রায়ে অগ্রবর্ত্তী হইয়া স্বরচিত গঙ্গাস্তব আবৃত্তি করিয়া শুনাইবামাত্র, অবহেলাভরে ও সকৌতুকে এই গর্ব্বোদ্ধত পণ্ডিতের রচনায় অজস্র ভ্রান্তি প্রদর্শন পূর্বক তাঁহার সকল গর্ব খর্ব করিয়া বিচারে পরাস্ত করিতে, নিমাইপণ্ডিতের অধিক সময় লাগে নাই।

তরুণ অধ্যাপক নিমাইপণ্ডিতের নিকট দিগ্বিজয়ীর পরাজয় স্বীকারের ফলে, যশঃগৌরব দেশদেশান্তরে বিকীর্ণ হইয়া, তিনি সমগ্র শিক্ষিতমণ্ডলীর অতিশয় শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিলেও, তাঁহার স্বভাবের চাপল্য ও পরিহাসপ্রিয়তা, তখনও দূরীভূত হয় নাই। বরং প্রতিদ্বন্দ্বী পাইলেই কূটপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া অপ্রস্তুত করিতে সঙ্কোচ হইত না। প্রবীণ অধ্যাপকগণও তর্কে

বিপর্য্যস্ত ও হতবুদ্ধি হওয়ায়, নবীনগণ তাঁহাকে দেখিলেই পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িতেন। অপরদিকে বাহ্যিক ব্যবহারে ও আলাপ আলোচনায় ভক্তিপ্রবণতা লক্ষিত না হইলেও, তাঁহার অতুলনীয় বিদ্যাবত্তা এবং অনিন্দ্য সুন্দর দেহকান্তির অলৌকিক আকর্ষণে নদীয়াবাসী বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে এইরূপ আর্ত্ত আকাঙ্খা বেদনার্ত্ত পঞ্জরের পিঞ্জরে কেবলই ধ্বনিত হইতে লাগিল, অপ্রাকৃত এই বালক অধ্যাপক যদি কৃষ্ণভক্ত হইয়া বৈষ্ণবদের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে, তবে জনগণের মধ্যে অনায়াসে কৃষ্ণচৈতন্য উদ্ভাসিত হইবে, দুর্দ্দিনের দুঃসন্ধ্যার অবগুণ্ঠন অবসান আসিবে। তাই তাঁহারা প্রত্যহ শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে সমবেত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন সহকারে সঙ্গীতের তালে নিয়োজিত করিয়া, অশ্রুব্যাকুলিত প্রার্থনা নিবেদন করিতেন যেন নিমাই পণ্ডিতের অন্তর অচিরে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরসে নিমজ্জিত হয়, নিয়মের সকল অন্তরায় অন্তরিত করিতে অসীমের অধিপতি যাহাতে সত্বর সীমার মাঝে নামিয়া আসেন, মর্ত্ত্যধামের নরলীলায়।

যজ্ঞোপবীত ধারণ অনুষ্ঠানের পরই ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণরূপে গণ্য হইলেও অধ্যাপনার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেই বিষয়ী ব্যক্তিগণ, নিমাই পণ্ডিতকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া নানা ক্রিয়াকর্ম্ম পূজাপার্ব্বণ, উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে অন্যান্য প্রধান পণ্ডিতের ন্যায়, তাঁহাকেও ভোজ্য বস্ত্র অর্থাদি উপকরণের উপহার পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু উপার্জ্জিত আয়ের অনুপাতে ব্যয় ক্রমেই বাড়িতে থাকিলেও অভাববোধ হইত না, যদিও অতিথি অভ্যাগতের অনবরত আগমন অব্যাহত ছিল এবং সাধু সন্ন্যাসী, অবধূতগণকে আমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিবারও বিরাম ছিল না।

ইতিমধ্যে মাধবেন্দ্রপুরীর মন্ত্রশিষ্য, ঈশ্বরপুরী অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে উপনীত হইলে, সামান্য দীনবেশ সত্ত্বেও তাঁহাকে দেখিবামাত্র নিমাইর তর্ক প্রবণতার প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হইল এবং ঈশ্বরপুরীও নিমাইর সিদ্ধপুরুষোচিত কলেবর দেখিয়া, অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বিমুগ্ধ নিমাই অতি সমাদরে তাঁহাকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিলে, হৃদ্যতা দৃঢ় হইয়া, অদূর ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিত অপূর্ব লীলার বীজ বপন হইল।

মধ্যপর্ব্বের পূর্ব্বাভাষ

"তোমার প্রবল প্রেম, প্রাণভরা সৃষ্টির নিশ্বাস,
উদ্দীপ্ত করুক চিত্তে ঊর্দ্ধশিখা বিপুল বিশ্বাস"।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপত্তি সময়ে নালন্দা যেমন সমগ্র ভারতের আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র রূপে পরিগণিত ছিল, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রাক্কালে,

নয়টি দ্বীপ পরিমণ্ডিত ও বত্রিশমাইল পরিবেষ্টিত, নবদ্বীপ নগরও তেমনি শিক্ষা দীক্ষার এক বিশালকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। তৎকালে সমাজের ধারক ও বাহক ছিলেন পণ্ডিতবর্গ। তাঁহারা বহুশ্রম ভারতের বিভিন্নস্থানে গমন করিয়া, সর্বশাস্ত্রে বিশারদ হইয়া নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিতেন। তাঁহাদের অগাধবিদ্যা, বুদ্ধিচাতুর্য্য এবং বাকৃজালবিন্যাস ও তার্কিক প্রতিভা, দেশবাসী বিস্ময়ে মান্য করিয়া চলিলেও, ধর্ম সংস্কারের প্রতি ইহাদের আন্তরিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত না। তদুপরি দেশব্যাপী মোশলমানরাজ শাসনের তাড়নায়, হিন্দুধর্মে নানাবিধ ব্যভিচার প্রবেশ করিয়া, সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র নবদ্বীপ ক্রমেই কলুষিত হইয়া পড়িতেছিল।

ধর্মের যথার্থ আদর্শ হইতে বিচ্যুতির ফলে বণিক সমাজ দেবদেবী পূজার নামে অজস্র পশুবলি দিয়া আপনাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং উৎসবাদি ব্যপদেশে আপনাপন বিত্তের মহিমা প্রদর্শনেই ব্যাপৃত থাকিত, যাহা ক্রমশঃ সর্বস্তরেই বিভিন্নরূপে ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল। পক্ষান্তরে সম্ভ্রান্ত সমাজস্তরে চলিতেছিল, প্রাণহীন অনুষ্ঠানের আধিক্যে বিলাসের উচ্ছৃঙ্খলতা, শুষ্কজ্ঞানের ব্যর্থবিচারে বিচলিত পণ্ডিতমহলে পাণ্ডিত্যের নিষ্ফল আক্রোশের বৃথা আস্ফালন, 'ব্রহ্মময় জগৎ' বাক্যের অনবরত আবৃত্তি করিয়াও পুরোহিত-গণের শঙ্কিত চরণবিক্ষেপে পাদচারণ, পাছে পথচারীর স্পর্শে দেহ হয় অশুচি। নিম্নস্তরে ছিল, বিধর্মী শাসকের প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হইয়া ধর্মান্তর গ্রহণের প্রবণতা। ভক্তিধর্ম অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়া, ভক্তিরসের আলোচনা নবদ্বীপ পরিমণ্ডলে প্রায় নির্বাপিত হইয়া পড়িয়াছিল।

এই মর্মান্তিক যুগসমস্যার বৈষম্যক্লিষ্ট সমাজে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রমুখ, কতিপয় ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও স্বীয় বিশ্বাসানুরূপ শাস্ত্রীয় পন্থা অবলম্বনে সাধন-ভজন করিয়া তথায় ভক্তির অম্লান আলোক প্রজ্বলিত রাখিয়াছিলেন, যেমন অগ্নি স্পর্শে পরিধেয় জ্বলিবার ভয়ে কেহই অগ্নির ব্যবহার পরিহার করে না, কিংবা ভক্তিপথে সাংসারিক অসুবিধা আসিলেও সজ্জনগণ ভক্তি সাধনা পরিত্যাগ করেন না। কিন্তু অর্থবিত্তের মোহে দর্পিত অপরপক্ষ, তাহাদিগকে কেবল যে উপেক্ষা করিয়াই চলিত তাহা নহে, অধিকন্তু নানাভাবে বিদ্রূপ ও গঞ্জনা করিত। সদা সর্বদা এই দৌরাত্ম্য হইতে ভগবৎ হস্তক্ষেপে অব্যাহতি লাভের অভিপ্রায়ে এবং সমাজে সংক্রামিত মিথ্যাজ্ঞান ও বহির্মুখী বিষয়লালসার বিষবাষ্প অপসারিত করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তিধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার বাসনায়, তাহারা সর্বদাই সঙ্গোপনে শ্রীভগবানের আশু আবির্ভাব আহ্বান করিতেন। একদিন বাহ্যজ্ঞান বিরহিত ধ্যান তন্ময়তার মধ্যে, বিস্রস্তবসন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য অকস্মাৎ হুঙ্কার করিয়া বলিলেন

যে বৈষ্ণবসমাজ কর্তৃক অবলম্বিত ধর্মকে অপ্রতিহতভাবে সর্বত্র প্রচারিত ও প্রসারিত করিতে গোপকর্পাণি ভগ। শ্রীকৃষ্ণ অতি শীঘ্রই এই নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া সকলের দৃষ্টিগোচর হইবেন, নতুবা তিনি বস্ত্রত্যাগ করিয়া বাস ও বিচরণ করিবেন।

ইতিমধ্যে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় অতিনির্দিষ্ট ষোলবৎসর বয়স অতিক্রান্ত, অধ্যাপক পুত্রকে বিবাহ করাইতে উৎসুক হইয়া পুত্রবৎসলা শচীদেবী, বনমালী পণ্ডিত নামক জনৈক ঘটকের মধ্যস্থতায় নবদ্বীপবাসী সুব্রাহ্মণ বল্লভাচার্যের কন্যা, এগার বৎসর বয়স্ক লক্ষ্মীদেবীকে পুত্রবধূরূপে নির্বাচন করিলে শুভদিনে শাস্ত্রবিধি মতে, সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর উপস্থিতিতে শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। ইহার বৎসরাধিক কাল পরে, পূর্বপুরুষের আদি নিবাস পূর্ববঙ্গ, তথা পিতৃভূমি দর্শনের অভিলাষে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ নিমাই প্রথমতঃ শ্রীহট্ট সহরে গমন করেন।

উল্লেখযোগ্য যে ভগবান যখন অবতাররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন তৎপূর্বেই তাঁহার অন্তরঙ্গ নিত্যপার্ষদগণ নানা স্থানে বিভিন্ন অবস্থায় জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া অবস্থান করেন এবং সেই অবতারপুরুষ, তাহার লীলাসহায়তার জন্য ঐশীশক্তি বলে যথাকালে যথাসময়ে তাঁহাদিগকে আহরণ করিয়া সুনির্দিষ্ট কর্মে নিয়োজিত করিয়া থাকেন।

নিমাইপণ্ডিতের বয়স তখন আঠার উত্তীর্ণ হয় নাই চাপল্যভাব ও রহস্যপ্রিয়তা অব্যাহত রহিয়াছে। পূর্ববঙ্গের বিশেষত শহরের কথ্যভাষা অপূর্বপারিপাট্যে অনুকরণ করিয়া সম্ভ্রান্ত লোকদের সহিত কৌতুক করিতে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ নাই। এমনি সময়ে তপনমিশ্র নামে একজন বিত্তশালী বয়স্ক ব্রাহ্মণ পরিহাসরত নিমাই পণ্ডিতের পদপ্রান্তে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া, সর্বসমক্ষে পূর্বরাত্রির স্বপ্নবৃত্তান্ত আনুপূর্বিক উল্লেখে নিবেদন করিলেন, তিনিই নরদেহধারীরূপে তাঁহার আরাধ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাহাকে সাধ্য ও সাধন তত্ত্বের যথোচিত উপদেশ প্রদান করিয়া সংসারবন্ধন হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। নিমাই চপলতা সংবরণ করিয়া, তাঁহাকে অবিলম্বে বারাণসীধামে চলিয়া যাইবার অভিমত প্রকাশ করিয়া, সহাস্যে বলিলেন যে, যথাকালে তিনি সেখানে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া ঈশ্বর প্রণিধানের সহজপদ্ধতি সবিস্তার জ্ঞাপন করিবেন।

তাৎপর্য্য এই, নিমাই যেন পূর্ব হইতেই পরিজ্ঞাত ছিলেন যে, তিনি পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট সহরে গমন করিয়াই তাঁহার লীলাসঙ্গী তপনমিশ্রের সাক্ষাত পাইয়া, তাঁহাকে কাশীবাসের নির্দেশ দিবেন। উল্লেখযোগ্য যে এই চপল-কিশোরের পরামর্শের বশীভূত হইয়া মহাপণ্ডিত তপনমিশ্র পৈত্রিক ভূ-সম্পত্তি

প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া তৎকালীন বিপদসঙ্কুল দুর্গমপথে, পদব্রজে স্ত্রী ও একমাত্র শিশুপুত্র সহ নৌকায়, বারাণসীর উদ্দেশ্যে রওনা হইয়া গেলেন। এই ঘটনার পর নিমাইপণ্ডিত পদ্মানদীর তীরবর্ত্তী অঞ্চলে কয়েকমাস পরিভ্রমণ করিলেও বিশেষ কোন ধর্মমত প্রচার করেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে ঘিরিয়া উদ্ভূত স্বতঃ বিশাল ভক্ত সম্প্রদায় সমগ্র পূর্ববঙ্গে বিস্তৃত হইয়া সকলকে হরিনাম কীর্ত্তনে আপ্লবিত করিয়াছিল।

প্রাসঙ্গিক উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাগমনেরও বারবৎসর পর, কাশীর গঙ্গাঘাটে, স্নানরত তপনমিশ্রের সহিত অলৌকিক ভাবে সন্ন্যাসী-নিমাইর সাক্ষাত হইলে, তাঁহার আবাসেই নিজ বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন। ঐসময় বারাণসী ক্ষেত্র, ছিল, সংস্কৃত শিক্ষার মূল কেন্দ্র; অগণিত পণ্ডিত, শত-শত সন্ন্যাসী, সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী ও লক্ষ-লক্ষ নরনারী এবং অনবরত আগত তীর্থযাত্রী পরিপূর্ণ, হিন্দু সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান। সেই সময় প্রকাশানন্দ সরস্বতী নামে, ভক্তিপথবিমুখ, ভারতবিখ্যাত এক বৈদান্তিক পণ্ডিত সেখানে বাস করিতেন। ভারতের সর্বত্র তাঁহার অনুগামীর সংখ্যা ছিল, প্রায় লক্ষাধিক। প্রেমধর্মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করাইয়া, তাঁহাকে ভক্তিপথে আনয়ন করিবার প্রয়োজনেই, কিশোর বয়সে নিমাইপণ্ডিত তপনমিশ্রকে বারাণসী পাঠাইয়া ক্ষেত্রপ্রস্তুত করাইয়াছিলেন যাহাতে যথাকালে সেখানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, একমাত্র ঐকান্তিক ভক্তির নামকীর্ত্তন দ্বারাই ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া যায়, তাঁহার এই মতাদর্শ তথায় অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। শুষ্কবিতর্কের ধূলিতে আচ্ছন্ন শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী পরিশেষে সংখ্যাতীত শিষ্যবর্গ সহ সন্ন্যাসী নিমাই প্রবর্ত্তিত মতবাদ নতশিরে গ্রহণ করিয়া তাহার কৃপাপ্রার্থীরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

প্রায় বৎসরকাল পূর্ববঙ্গে ভ্রমণরত অবস্থায় কাটাইয়া বহুতর উপহার দ্রব্যাদি এবং সঙ্গীগণ সহ নবদ্বীপ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, নিমাই অবগত হইলেন যে, তাহার দীর্ঘ অনুপস্থিতিকালে পতিগত প্রাণ পতিবিচ্ছেদ ক্লিষ্ট লক্ষ্মীদেবী সর্প দংশনের মত, প্রিয়বিরহ জ্বালায় মূর্চ্ছিত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। বালিকা পত্নীর শোকে ম্রিয়মান হইলেও,, জননীকে নানাভাবে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, সংসারে কেহই কাহারও চিরদিন আপন নয়; পত্নি-পুত্রের প্রতি আসক্তির মূলে, মিথ্যা মোহ বা অবিবেক জনিত মমতা; একমাত্র ভগবানই সকল সময়ের আপনজন, পান্থশালায় আসা যাওয়ার ন্যায় এই মৃণ্ময় জগতে কিছুকাল বাস করিয়া, সকলে সেই চিরদিনের নিজ-জনের অভিমুখে চলিয়াছে, তাছাড়া পরমায়ুর যদি কোন নির্দ্ধারিত পদ্ধতি থাকিত, তবে অদৃষ্টকে কেহই অ-দৃষ্টব্যাপার বলিত না; তাই প্রবল

দেবের নিকট পুরুষকার নিষ্ফল হইয়া যায়। এবং ব্যবহারিক জীবনে প্রাক্তনের গতিরোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। ভগবৎ শরণাগতিতে দুঃখজ্বালার লাঘব হইয়া প্রাক্তনকর্মার্জিত সুখদুঃখ সহ সন্তাপ সহজে বহন করা যায়, যেমন পথিমধ্যে আকস্মিক বর্ষণ হইলে ছাতা সহায়ক হয়।

পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিবার পথে তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিবার জন্য অনেক বিদ্যার্থী সঙ্গে আসিয়াছিল। পূর্ববার এবং নবাগত ছাত্রগণ লইয়া পুনরায় অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলে মুকুন্দসঞ্জয়ের গৃহস্থিত টোল বিদ্যাবিষয়ক কথোপকথনে আবার মুখরিত হইয়া উঠিল। নিমাইপণ্ডিত এরূপ নিপুণ ছিলেন যে পড়ুয়াদের পাঠ অনুধাবনে অসুবিধা হইত না। ফলে নিত্যনূতন ছাত্রের সমাগম হইতে লাগিল। এবার তিনি কঠোরভাবে নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিলেন। কেহ তাঁহার উপদেশ লঙ্ঘন কিংবা অমান্য করিলে যথোচিত তিরস্কৃত হইত। ছাত্রগণের প্রত্যহ গঙ্গাস্নান ও তিলকধারণ অবশ্য কর্তব্য ছিল।

এইভাবে দুইবৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিলে, শচীদেবী নিমাইকে পুনরায় বিবাহ করাইয়া সংসারে আবদ্ধ রাখিতে অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়া কাশীনাথ মিশ্র নামক ঘটকের মধ্যস্থতায় গঙ্গাঘাটে দেখা, বিত্তশালী সনাতন পণ্ডিত নামক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিষ্ণুপ্রিয়া নামে পরমাসুন্দরী একমাত্র কন্যাকে পুত্রবধূ করিতে মনস্থ করিলেন। স্বতঃ প্রণোদিত গুণানুরাগী কায়স্থ জমিদার বুদ্ধিমন্ত খাঁ এবং পরমহিতৈষী মুকুন্দসঞ্জয়, প্রকাণ্ডরূপে উৎসব করিতে উদ্যোগী হইয়া, বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনে আগ্রহী হইলেন। শুভক্ষণে মহাসমারোহে দ্বিতীয়বারের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইল। অজস্র দানসামগ্রী ও নববধূ সহ নিমাই বাড়ীতে আসিলেন। চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে যে, শচীদেবী অগ্রবর্তী হইয়া বধূমাতাকে কোলে করিয়া জ্ঞানহারা আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন।

এই বিবাহের প্রায় দুইবৎসর কাল পরে ১৫০৮ খৃষ্টাব্দের আশ্বিনমাসে বাইশ বৎসর বয়স অতিক্রম হইবার পর মায়ের আগ্রহে, পিতার পিণ্ডদান কার্য্য সম্পাদনের জন্য নিমাইপণ্ডিত গয়াধাম গমন করেন। সাথী হইলেন, মেশো চন্দ্রশেখর এবং নবদ্বীপবাসী কয়েকজন সমবয়সী বন্ধুবান্ধব। বিপ্রগণ বেষ্টিত ও ভক্তগণ অর্পিত, বহুমাল্য ও নানাবর্ণের পুষ্পশোভিত বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করিয়া নিমাইর অন্তরে ভক্তিভাব উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। যুগ যুগান্তরের পথে দূরদূরান্তর হইতে আগত কত তীর্থযাত্রী, যেই চরণচিহ্ন স্পর্শ করিয়া নিজেদের কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছে, তাহা এখন নয়ন সম্মুখে। বিমুগ্ধ নেত্রে তন্ময় হইয়া দর্শন করিতে করিতে, সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

বক্ষ প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। ভাবাবেগে নিমাই পণ্ডিত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিধাতার ইচ্ছায় যেন দৈবক্রমে সহসা সেখানে উপস্থিত ভক্তচূড়ামণি শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়া, ভূতলে পতনোন্মুখ নিমাইকে গাঢ় আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে ঈশ্বরপুরীকে প্রত্যক্ষ করিয়া, নিমাই শ্রদ্ধাভরে প্রণত হইলেন।

অতঃপর অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীতীরে তীর্থশ্রাদ্ধ সমাপন ও বিষ্ণুপাদপদ্মে পিতৃপিণ্ড প্রদানান্তে বাসস্থানে আসিয়া নিজ হবিষ্য রন্ধন করিবার পরেই, সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়াও যেন নিমাই প্রেমবন্ধনে অবরুদ্ধ বৃক্ষতলবাসী সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরী আসিয়া উপনীত হইলে, তাঁহাকে সমাদর সম্বর্দ্ধনায় নিজের জন্য প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন দিয়া ভোজন করাইয়া পরে পুনরায় পাক করিয়া আপনি আহার করিলেন। ক্রমে উভয়ের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতা, অন্তরঙ্গতায় পর্য্যবসিত হইয়া উভয়ের মধ্যে প্রত্যহই ভক্তিমহিমা আলোচনা হইতে লাগিল।

দিনকয়েক পর ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করিলে, তিনি প্রসন্নচিত্তে দশার্ণ কৃষ্ণমন্ত্র দান করিবার পর নিমাইর অভূতপূর্ব মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটিল। যেন এক অভিনব মহান নবজীবন লাভে, অন্তর্হিত পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার ভগবদ্ভক্তিভাবে আপ্লুত হইল। অনুক্ষণ একান্তে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে বিহ্বলভাবের আধিক্যে সহসা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সঙ্গীগণের সান্ত্বনা ও শুশ্রূষার যত্নে নবদ্বীপ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তথাকার বন্ধুবান্ধব আত্মীয় পরিজন এবং পণ্ডিতবর্গ তাহার উদ্ধত ও চপল প্রকৃতিতে এই পরম শান্ত মধুর, ভক্তিময় ভাবের অবস্থান্তর লক্ষ্য করিয়া অতীব বিস্মিত ও আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু ভগবৎ ভাবের আবেগে আবিষ্ট নিমাইপণ্ডিত টোলে উপস্থিত হইলেও, পড়াইতে অপারগ হইয়া পরিলেন। বেদান্তসূত্র, শব্দাদির ব্যঞ্জনা বৃত্তিলক্ষণা প্রভৃতির বিশ্লেষণ করিতে তাহাকেই কৃষ্ণভক্তির মহিমা গৌরবের তাৎপর্য্যরূপ অর্থপ্রকাশে অভীনিবিষ্ট রহিলেন।

উপবেশন স্থানে উপবিষ্ট পরমানন্দরসে নিমগ্ন নবীন অধ্যাপকের বদন ঈষৎ ম্লান, অথচ আনন্দময়, পদ্মচক্ষু নয়নজলে সিক্ত, সর্বদাই এরূপ দেখিয়া, সামান্য অপরাবিদ্যার পাঠ জিজ্ঞাসা করিয়া বিব্রত করিতে বিরত থাকিয়া, বিদ্যার্থীগণ অন্য চতুষ্পাঠীতে গমন করা স্থির করিল। নিমাই সানন্দে অনুমতি দিয়া আশীর্বাদ করিলেন, তোমাদের হৃদয়ে সর্ববিদ্যার স্ফূর্তি হউক। তখন পড়ুয়াগণের আকুল ক্রন্দনে চতুষ্পার্শ্ব যেন কারুণ্যরসে পূর্ণ হইয়া গেল। এইভাবে নিমাইপণ্ডিতের ভগবৎ প্রেমে অবসন্ন অধ্যাপক জীবন অবসিত হইল। সুরু হইল, মহাবিবর্ত্তনের সূচনা, সংসার তাপদগ্ধ, কলিহত

জীবজীবনে শান্তিসুধা সিঞ্চিত হইয়া আনন্দময়ের স্পর্শলাভের সুদীর্ঘ প্রতী-ক্ষার অবসান অবশ্যম্ভাবী হইয়া আসিল।

মধ্য পর্ব

"কত প্রেম তপন দগ্ধ হৃদয়, বিনম্র বিভাবরী,
জ্ঞান সিন্ধু উঠেছিল গীত, কত ব্যথা ভেদ করি।"

অতঃপর বিদ্যাচর্চা ও তর্কতর্কে প্রমত্ত নিমাইপণ্ডিতের জীবনে এক অভূতপূর্ব ভক্তিরসের প্লাবন আসিল। অহোরাত্র কেবলই কৃষ্ণকথা, মহিমময় কৃষ্ণমন্ত্রের মহত্ত্ব আলাপন। ক্রমে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর নিমাইকে কেন্দ্র করিয়া একটি নূতন ভক্তগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিল। আরম্ভ হইল, ভক্তিধর্মপ্রচার এবং সমবেত হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন। তাঁহার অপূর্ব ভগবৎপ্রেম ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে উচ্চনীচ, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল সম্প্রদায়ের লোকই বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। নবদ্বীপবাসী শ্রীবাসপণ্ডিত এবং তাঁহার পরিজনবর্গ নিষ্ঠাবান কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। নিমাইর প্রতি বাল্যাবধি স্নেহের আকর্ষণ থাকায় তাঁহাকে ঔদ্ধত্য ও চাপল্যত্যাগ করিয়া চলিতে বলিতেন। কিন্তু নিমাই দম্ভভরে তাঁহার উপদেশ উপেক্ষা করিতে দ্বিধা করিত না। এক্ষণে এই অভাবিত ভাবান্তরে পরম পুলকিত হইয়া তিনি তাঁহার গৃহস্থিত নাট মন্দিরে নিমাইর সান্ধ্য সঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

প্রতি সন্ধ্যায় শ্রীবাসঅঙ্গন কৃষ্ণকীর্ত্তনে মুখরিত হইতে লাগিল। বিশেষ পর্ব উপলক্ষে সমস্তরাত্র ভজনকীর্ত্তন করিয়া প্রভাতে গঙ্গাস্নানান্তে সকলে নিজ বাসস্থানে ফিরিতেন। ক্রমশঃ অন্যান্য ভক্ত সম্প্রদায় আসিয়া যোগদান করিলেন। মাঝে মাঝে অপরাহ্নকালে চন্দ্রশেখর আচার্য্যের বাড়ীতেও কৃষ্ণকথা আলোচনার আসর বসিত। প্রারম্ভে নামকীর্ত্তন হইত যাহার প্রধান পদ ছিল, 'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণযাদবায় নমঃ, যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।' ১৪৩০ শকাব্দে নিমাই কণ্ঠের শক্তি প্রাপ্ত মহামন্ত্ররূপ এই কীর্ত্তন পরিবর্দ্ধিত আকারে অদ্যাপিও প্রচলিত।

ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য পূর্বকালে যাগযজ্ঞ, পূজাআর্চনা তপস্যাপ্রার্থনা, নির্জ্জনবাস উপবাস প্রভৃতি বিবিধ উপায় প্রচলন ছিল। কিন্তু নিমাই বলিলেন, শ্রীভগবান আনন্দময় এবং তাঁহার উপাসনাও হইবে অন্তরের আনন্দ হইতে উৎসারিত। ক্রমে কীর্ত্তনানন্দের প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি পাইয়া নগরের নানা-প্রান্তে অনেক কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায় উদ্ভব হইল। নিমাই মাঝে মাঝে তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবৎ দাস্যভাবে এমন ভাবাবিষ্ট হইতেন যে, শিথিল চরণে নৃত্য করিতে করিতে সবেগে ভূমিতে পড়িয়া যাইতেন। নিমাই ও

তাঁহার ভক্তগোষ্ঠীর এই সমাচার অবগত হইয়া অতি সম্ভ্রান্ত ধনীগৃহস্থ যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন, ব্রাহ্মণসমাজের সমাজপতি সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী, ভক্ত বৈষ্ণব, কমলাক্ষ মিশ্র, কেবল ভক্তি উপদেশ প্রদানই একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল যাঁহার। অদ্বৈতাচার্য নামে সুবিদিত পরম সংবাদ লাভ করিয়া ভাবিত হইলেন, তাঁহার প্রতিদিনের আহ্বানের ফলে স্বপ্নযোগে প্রতিশ্রুত ভগবান, হয়ত এখন সর্বনয়নগোচর হইবেন। একদা সেইজন উপেক্ষাকারী নিমাইর সম্বন্ধে কৃষ্ণভক্তরূপে অভ্যুদয় স্বচক্ষে দর্শন করিয়া পর্য্যালোচনা করিতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেও বিচক্ষণতার সহিত আপনার মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, নিমাই যদি স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে আসিয়া তাঁহার মাথায় পদ তুলিয়া দেয়, তবেই প্রত্যয় হইবে প্রতিদিনের কামনা পূর্ণ করিতে শ্রীহরি নদীয়ায় নবকলেবরে অবতরণ করিয়াছেন।

এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে শ্রীঅদ্বৈত নবদ্বীপ হইতে সপরিবারে তাঁহার শান্তিপুরের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই নিমাই পদব্রজে ভক্তগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া তুলসীমঞ্চে জল দান প্রদানরত অদ্বৈতাচার্য্যকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন। বহুকাল আগে যে নিজ জেষ্ঠ ভ্রাত বিশ্বম্ভরকে প্রায়শঃ তাঁহার নবদ্বীপের বাড়ীতে খুঁজিতে আসিত, সেই সদা চঞ্চল মনোহর শিশু নিমাই, এক্ষণে যুবক বয়সে ভগবৎ ভাবাবিষ্ট নিবদ্ধ আনন্দ মূর্ত্তরূপে আপন নয়ন সম্মুখে। মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত শ্রীঅদ্বৈত গভীর স্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া কোনমতে অশ্রুসংবরণ করিলেন। অবশেষে পরম সমাদরে সম্বর্দ্ধনা করিয়া গৃহমধ্যে নিয়া বসাইলে অকস্মাৎ ঈশ্বরভাবে অবিরূঢ় নিমাই সকলের বয়জ্যেষ্ঠ, সর্বজনমান্য সপ্ততি বৎসরাধিক বয়স, সম্মুখে উপবিষ্ট অতিবৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যের মস্তকে নিজ পদদ্বয় তুলিয়া দিলেন। পরক্ষণেই আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া এই অনুচিত আচরণের পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনা চাইতে লাগিলেন। সংশয় দূরীভূত হওয়ায় অননুভবনীয়ভাবে উদ্বেলিত চিত্তে নিমাই চরণতলে পতিত শ্রীঅদ্বৈত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের এই অপরূপ জ্ঞানলাভ হইল যে, ভগবৎ প্রেম শক্তিশালী ব্যক্তি কর্তৃক অপরহৃদয়ে সহজে সঞ্চারিত হইতে পারে। গৃহে প্রত্যাগমনের প্রাক্কালে নিমাই সম্মুখে পতিত আমের আঁঠির উপর সজোরে করতালি দিবামাত্র দুইশত পক্ক আম্রসমেত একটি বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে, নিকটে দণ্ডায়মান সংশয় চিত্ত মুকুন্দকে বলিলেন, এই ব্যাপারকে অদ্ভুত শক্তি সম্পন্ন ইন্দ্রজাল ভাবিতে পার তবে ভগবৎ ইচ্ছায় অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হয়।

ইহার কিছুকাল পর শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া

নিমাইর নিত্যসহচর ও তাঁহার প্রবর্তিত মতবাদের একান্ত অনুবর্তী হইয়া পড়েন। তাঁহার জন্মস্থান পশ্চিম বঙ্গে বীরভূম জেলার একচাকা নামক গ্রাম। পিতা মুকুন্দ পণ্ডিত মন্ত্রতন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন বলিয়া, হাড়াই ওঝা নামেও পরিচিত, অত্যন্ত পরদুঃখ কাতর ও সংসার বিরাগী রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। মাতার নাম পদ্মাবতী। শিশুকাল হইতেই নিত্যানন্দ পূর্বনাম কুবের, উদাসীন প্রকৃতির ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ মনোযোগ ছিল না। অতি বাল্যকালে গৃহে আগত এক সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিয়া একাদিক্রমে প্রায় কুড়ি বৎসর ভারতের সমস্ত তীর্থস্থান পর্যটন করেন। ইহাতে যে প্রভূতজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হইয়াছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে, কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, নিমাই পণ্ডিতের অলৌকিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অবিলম্বে নবদ্বীপ অভিমুখে রওনা হইয়া পড়েন। সেখানে পৌঁছিয়া যখন ব্যগ্রভাবে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী খুঁজিতেছিলেন, তখন তাঁহার চেহারা দেখিয়া, নন্দন আচার্য তাহাকে আপন গৃহে নিয়া যান। এদিকে নিমাই অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে কেবলই বলিয়া চলিলেন, নগরে এক মহাপুরুষের আগমন হইয়াছে, তাহাকে খুঁজিয়া লইয়া আস। কিন্তু কেহই তাহার দেখা পাইল না। অবশেষে অপরাহ্নকালে নিমাই ভক্তগণ সহ শ্রীনন্দন আচার্য্যের গৃহে গিয়া উঠিলেন।

নিত্যানন্দ ঐ বাটিতে উপবিষ্ট। প্রকাণ্ড শরীর, গাত্র রং শ্যামবর্ণ, আয়ত লোচন, পরিধানে নীলবস্ত্র, বয়স বত্রিশ উত্তীর্ণ হয় নাই। অতি সাধারণ বেশধারী গৃহী যুবক নিমাইকে দেখিবামাত্র, সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দের অঝোরে আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল।

পর দিবস শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীগুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে নিত্যানন্দ প্রভু কর্তৃক ব্যাসদেবের পূজা অনুষ্ঠিত হইবার পর, নিমাই তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া গেলেন। পরম ভক্ত ও মহাপ্রাণ নিত্যানন্দের বহির্মুখী লোকদিগকে ঈশ্বর অভীমুখীন করাই ছিল জীবনের ব্রত। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে জাতিভেদ ও বাহ্যআচার, তিনি উপেক্ষা করিয়া চলিতেন এবং ক্ষমা ও দয়ার মূর্ত্ত প্রতীক শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে ছিলেন তাঁহার প্রধান সহায়ক।

ক্রমে ক্রমে নিমাইর লীলাসঙ্গী প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। হরিদাস ঠাকুর নামে একজন পরম ভক্ত অলৌকিক ভাবে নবদ্বীপ আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে শান্তিপুর বাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। ইনি ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। অতি শিশুকালে পিতৃমাতৃহীন অবস্থায়, পূর্ববঙ্গ যশোহর

জেলা বুঢন গ্রামনিবাসী, এক সন্তান বৎসলা মুসলমান রমণীর নিকট আশ্রয় নিয়াছিলেন বলিয়া, যবন হরিদাস নামে অভিহিত হইতেন। পৈত্রিক উপাধি ছিল ব্রহ্ম, তাই পরবর্ত্তীকালে ব্রহ্ম হরিদাস নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন। জন্মান্তরীণ সংস্কার বশে বাল্য বয়সেই গৃহত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী বেনাপোল অঞ্চলের কোন এক নিভৃতস্থানে পরিত্যক্ত জীর্ণ কুটিরে প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম জপে নিমগ্ন থাকেন। যাহাতে কেবল শুনিয়াও পথচারীর কল্যাণ হয়, এই জন্য উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করায়, তথাকার বৈষ্ণবদ্বেষী জমিদারের উৎপাতে ঐস্থান পরিত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রাম পরগণার, তৎকালে সাংবৎসরিক বার লক্ষ টাকা আয়ের জমিদার গোবর্দ্ধন দাসের কুল পুরোহিত বলরাম পণ্ডিতের চাঁদপুর গ্রাম আবাসে অতিথিরূপ অবস্থান করিবার সময়ে, ভগবৎবিধানে সেই স্থানেই জমিদারের একমাত্র পুত্র বালক রঘুনাথের সহিত পরিচয় ঘটে, যিনি ৫৩৮ খৃষ্টাব্দে যৌবনকালে বৈরাগ্যবশে রাজ ঐশ্বর্য্য ও নব পরিণীতাকে পরিত্যাগ করিয়া পুরীধাম সন্ন্যাসী নিমাই চরণ আশ্রয় পূর্বক কঠোর কৃচ্ছ সাধন ব্রত অবলম্বনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

যবন হরিদাসের বৈষ্ণব ধর্মমতে সাধন ভজনের অন্তহীন মহিমা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণের মধ্যেও উদ্দীপিত হওয়ায়, স্থানীয় মুসলমান মুলুকপতি, গোরাইকাজী নামক এক অমাত্যের পরামর্শে, দুষ্ট অনুচর দ্বারা হরিদাস ঠাকুরকে প্রকাশ্য বাজারে নির্মমভাবে বেত্রাঘাতের পর, মৃত ভাবিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিলে, ভাসিতে ভাসিতে নবদ্বীপ গঙ্গাঘাটে আসিয়া চেতনা লাভ করেন এবং সেখানেই গঙ্গাস্নানরত শ্রীঅদ্বৈতের সহিত সাক্ষাত। সেইসূত্রেই দর্শনাভিলাষে এক দিবস নবদ্বীপ গমন করিলে, নিমাই স্বহস্তে তাঁহার ললাট চন্দনলিপ্ত ও গলায় তুলসীপত্রের মালা পরাইয়া দিয়া প্রসাদান্ন ভোজনের উত্তম ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন, লীলাময় ভগবান বিভিন্ন ভক্তদ্বারা ভজনাঙ্গের বিবিধ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, এই ক্ষেত্রে যবন হরিদাস কর্তৃক নাম-মাহাত্ম্য প্রদর্শন করাইলেন, যাহা যুগে যুগে জগৎবাসীর আদর্শ হইয়া থাকিবে। নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণের পর হরিদাস ঠাকুর জীবনের শেষ দিন পর্যান্ত নীলাচলে তাঁহার সান্নিধ্যে বাস করিয়া ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন।

মহাজ্ঞানী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ, পরম ভক্ত হরিদাস ঠাকুর মিলিত হইবার পর, নিমাই পণ্ডিত প্রবর্ত্তিত ভগবৎ আরাধনার নব-বিধান বিপুল উৎসাহে প্রচারিত হইলে, প্রত্যেক পাড়ায় অতি উদ্দীপনায় সান্ধ্য হরিসভা গঠিত হইয়া, সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ নাটমণ্ডপে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া নগরবাসীর ঘরে ঘরে প্রসারিত হইল। পক্ষান্তরে, কতিপয় উগ্র জাত্যাভিমানী নগরবাসী এই প্রকার সার্বজনীন কীর্ত্তনের অত্যধিক প্রসারে অসহিষ্ণু হইয়া,

প্রতীকারের জন্য নদীয়ার নগরপাল চাঁদকাজীর নিকট অভিযোগ দায়ের করায়, সুযোগ সন্ধানী মোশলমান শাসক, বিরুদ্ধপক্ষ কুচক্রী হিন্দুগণের আবেদন সমর্থনে নগরের সর্বত্র সমবেত সঙ্কীর্ত্তন বন্ধের আদেশ ঘোষণা করিয়া, নিজেই কীর্ত্তনরত বৈষ্ণবগণের খোল মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ভাঙ্গিতে সুরু করিলে ভীত ও উদ্বিগ্ন ভক্ত বৈষ্ণবগণ কাজীর এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক অনাচারের কাহিনী বিষন্ন চিত্তে জ্ঞাপন করিবামাত্র নিমাই তাহাদিগকে যথাবিহিত ব্যবস্থার অভয় আশ্বাস প্রদান করিলেন।

উল্লেখযোগ্য যে, তৎকালে নবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গ, পাণ্ডিত্যের গৌরবে অধিকার করিলেও অন্তরে ছিল ভক্তিশূন্য, বিত্তলাভের উপযোগী কামনা-মূলক ক্রিয়াকাণ্ডেই, তখন তাহাদের মতে ধর্মানুষ্ঠান। ফলে ভোগ ও ঐশ্বর্যো আসক্ত ব্যক্তিগণের প্রাধান্যে সনাতন ধর্মের দীপ্তি ম্লান হইয়া, বিলাসের ব্যাপকতা ও বৈভবের প্রচার ধর্ম্মীয় আচরণে প্রতিফলিত হওয়ায় জনগণ ভক্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্মের এই গ্লানি দূরীভূত করিয়া যুগোপ-যোগী ধর্ম সংস্থাপনের প্রয়োজনেই, নিত্য নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বে জড়িত বঙ্গভূমিতে 'নদের নিমাই'র' আবির্ভাবের অন্যতম কারণ।

নিমাই পণ্ডিতের নির্দ্দেশে পরদিন অপরাহ্নে তিনটি দল মহাসমারোহে নগরকীর্ত্তনে বাহির হইল। প্রথম দলের নেতৃত্বে রহিলেন, শ্রীবাস পণ্ডিত দ্বিতীয় দলের শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য এবং তৃতীয় দলের, নিত্যানন্দ ও হরিদাস উন্মুক্ত রাজপথে নিমাই ভক্তগণের প্রেম পুলকিত কান্তি, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সর্বশ্রেণীর লোকের ভাব বিহ্বল নৃত্যের তাৎক্ষণিক আকর্ষণে অভিভূত, পথিপার্শ্বের প্রত্যেক গৃহস্থ অতি তৎপরতার সহিত, আপনাপন গৃহদ্বার প্রান্ত পুষ্পমাল্য ও মঙ্গল ঘটে সজ্জিত করিয়া অনবরত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। বহুদূর হইতে আগত আবালবৃদ্ধবণিতা মহোৎসাহে কীর্ত্তনের দলে যোগদান করিলে, দেখিতে দেখিতে প্রতিটি সম্প্রদায় মৃদঙ্গ করতালের বাদ্যে ও হরি-ধ্বনিতে মুখরিত বৃহৎ জনসমুদ্রে পরিণত হইল। মহোল্লাসে নগরের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আসিয়া মিলিত, তিনটি কীর্ত্তনের দলসহ বিশাল লোকারণ্য লইয়া, আজানুলম্বিত বৃহৎ পুষ্পমাল্যগলে, নিমাই পণ্ডিত সর্বাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে কাজীর গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

বৈষ্ণবদ্বেষীগণও এই অনির্বচনীয় অলৌকিক দৃশ্য অবলোকন করিয়া স্তব্ধ বিস্ময়ে আপন অজ্ঞাতসারেই শোভাযাত্রার সামিল হইয়া পড়িল। সহরের অতি সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তিগণ ও বিশিষ্ট পণ্ডিত বর্গে পরিবৃত এবং আপামর ভক্ত-গোষ্ঠী পরিকীর্ণ সুবৃহৎ জন সংঘের মহাকোলাহলে সন্ত্রস্ত কাজী অন্তরালে অবস্থান করিয়া পরিস্থিতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। অবশেষ বিপুল জন-শ্রেণী

তাঁহার দ্বারদেশে সমাগত হইলে, যুক্ত করে বাহিরে আসিয়া নিমাইকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে নিয়া বসাইয়া বলিলেন যে, কতিপয় হিন্দুর অভিযোগ ক্রমেই নগরে শান্তি রক্ষার জন্য পূর্বাপর বিবেচনা না করিয়া ভ্রমবশতঃ সঙ্কীর্ত্তন বন্ধ করিবার নির্দ্দেশ দিতে হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, সঙ্কীর্ত্তন সমর্থিত লোকের সংখ্যাই অত্যধিক এবং কিছু বিরুদ্ধবাদীও এই অভিযানের অন্তর্গত হইয়া রহিয়াছে. অধিকন্তু গতরাত্রে স্বপ্নযোগে এক ভীষণ দর্শন মূর্ত্তি বৈষ্ণবের প্রতি অহেতুক উৎপাত করার অপরাধে তাহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। সুতরাং সম্যক বিচারে স্বচ্ছন্দে সঙ্কীর্ত্তন করিবার বাধা থাকিবে না। নিমাই বলিলেন, স্বপ্নাবস্থায় হইলেও তুমি নৃসিংহদেবের দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছ, তোমার কল্যাণের অন্তরায় আসিবে না। কাজী সেই দিন হইতে নিমাইর একান্ত অনুগত ও পরম কৃষ্ণ ভক্ত হইয়াছিলেন।

নবদ্বীপের মায়াপুর অঞ্চলে অবস্থিত মহাপ্রভুর স্বহস্তে রোপিত কাঠ-মল্লিকা বৃক্ষ শোভিত চাঁদকাজীর সমাধিস্থল বৈষ্ণবগণ পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য করেন। স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির অন্যায় আদেশ অকুতোভয়ে অমান্য করিয়া সত্যের মহিমা জয়যুক্ত করিতে অহিংস মূলক সমবেত সার্থক সত্যাগ্রহ বা ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, অসম সাহাসিক প্রতিবাদ অভিযান, ভারতের ইতিহাসে বোধ হয় ইহাই সর্বপ্রথম নিদর্শন।

অন্ত্য পর্ব্বের পূর্ব্বাভাস

"মোচন কর বন্ধন সব মোচন করো হে, প্রভু মোচন কর ভয়"

অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সঙ্কীর্ত্তন বিরোধী কাজীকে অনুগত ভক্তে পরিবর্ত্তিত করিয়া পরবর্তী পদক্ষেপে নিমাই প্রেমধর্ম প্রকাশে ব্রতী হইয়া, নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুরকে নগরের ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচারের ভার অর্পণ করিলেন। প্রকৃত পক্ষে নিমাই নিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত এই তিনজনই বঙ্গদেশ তথা সমগ্র ভারতে নূতন বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন। নিমাই ছিলেন মূল শক্তি, অপর দুইজন তাঁহার সহায়কারী। এই কারণেই নিমাই পণ্ডিত 'মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত 'প্রভু আখ্যায় অভিহিত তৎকালে রাজনৈতিক দিক হইতে বিখণ্ডিত ভারতে শাসকগণ, হিন্দু সমাজের উপর অনবরতই নানাভাবে আঘাত হানিতেছিল। হিন্দুধর্ম্মের ধারক ও বাহকগণ তখন পারমার্থিক দৃষ্টিবিমুখ হইয়া ইহসর্বস্ব নিম্নশ্রেণীর জনগোষ্ঠির সহিত শিথিল সম্পর্ক, উচ্চশ্রেণীর রক্ষনশীলগণ কুসংস্কারের কদর্যতায় কলুষিত চিত্ত, তুচ্ছ কারণে সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে

সদা সন্ত্রস্ত সমাজের অবহেলিত জন সমাজ, ইসলাম ধর্মের সাম্য ও ভ্রাতৃ ভাবের আকর্ষণে ধর্মান্তরিত। সেই সন্দেহ দীর্ণ, হিংসা কণ্টকিত, ঘনায়মান ঈশ্বর অবিশ্বাসের ধূমায়িত ছায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হিন্দু সমাজে, ধর্ম সংস্কৃতি ও সাহিত্যে আমূল পরিবর্তন আনয়নকারী শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব। ঐশীশক্তিবলে তিনি ভক্তিধর্মকে প্রেমধর্মে পরিণত ও জাতিবর্ণ নির্বিশেষে বিভেদের অন্তরাল অপসারিত করিয়া ভগবানের সহিত যুক্ত হইবার আচার অনুষ্ঠান বিহীন সরল অনাড়ম্বর সনাতন ধর্ম প্রচলন করিয়া অনুগামীগণ কর্তৃক তাহা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করাইয়া সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করিয়া ছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে ভগবানের সহিত একটি প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করিয়া পরম অনুরাগে, তাঁহার নামকীর্তনই সর্বধর্মসার ইহাতে আচার অনুষ্ঠান, স্মৃতির অনুশাসন, নিষ্প্রয়োজন। পুরোহিতেরও প্রয়োজন নাই। দশ পাঁচ জন মিলিত হইয়া কোন দেবালয় স্থানে কিংবা নিজ দুয়ারে বসিয়া শান্তসমাহিত ভাবে নামকীর্তন করিলেও ভগবৎ উপাসনা হয়। ইহাতে সামাজিক মর্যাদার বিচার নিরর্থক। ভগবৎ ভাবনার সময় সকলেরই সমান অধিকার। চৈতন্যমহাপ্রভু প্রচারিত ভক্তিধর্ম, তাই প্রচলিত শাস্ত্রীয় ধর্মানুষ্ঠান ও সামাজিক বিধিনিষেধ বহির্ভূত এক সার্বজনীন ধর্ম সম্মিলন।

ধর্ম্মীয় আচার আচরণের কঠোরতা, আভিজাত্যবোধের অহমিকা সাম্প্রদায়িক উপাসনার উৎকট রীতিনীতির নামে পতিতজনের প্রতি উপেক্ষার উৎপীড়ন, যখন হিংসা বিদ্বেষের রূপ নিয়া মনুষ্যত্বের পরিধি ক্রমেই সঙ্কুচিত করিয়া তুলিতেছিল —তখন শাশ্বতসত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অনুসরণে প্রচারিত, আনন্দধামে প্রবেশলাভের সহজ উপায়রূপ, মহাপ্রভু প্রবর্তিত ভগবৎভক্তির এই মহারবের আশ্বাসবাণী সকলেই মর্মস্পর্শ করিল। যেকোন ধর্মাবলম্বী ভগবদ্ভক্তগণ তাই শ্রীচৈতন্যকে অবতার পুরুষ মনে করিতেন। মায়াবাদীগণের নিকটও যুগ প্রবর্ত্তক মহামানবরূপে গণ্য ছিলেন। বিরুদ্ধ পক্ষও তাঁহাকে অমানুষীক প্রতিভাধর ভাবিতেন। চৈতন্যদেবের আধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ভেই, তাঁহার নানাবিধ অলৌকিক ব্যাপার অনুধাবন করিয়া, সমসাময়িক প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে ঈশ্বরসদৃশ জ্ঞান করিতেন। অনুগামীগণের দৃঢ় বিশ্বাস সঞ্চারিত হইয়াছিল যে স্বয়ং ভগবান ধর্মের গ্লানি দূর করিতে, চৈতন্যদেবরূপে নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

ইতিপূর্বে যত ধর্মমত প্রচারিত হইয়াছে, তাহার উৎস ছিল বঙ্গদেশের বাইরে। ধর্ম প্রবর্ত্তক মাত্রই ছিলেন বঙ্গভূমির বহির্ভূত ব্যক্তি। কিন্তু চৈতন্যদেব হইতে যে ভক্তিবাদের সূচনা হয়, তাহার আন্দোলন সমগ্রভারতে প্রসারিত হইলেও, তাহা বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য এবং ইহার অনুশীলন-

কাবীগণের মধ্যে যে ভাবনে মিশ্রিত মনকে পাওয়া যায়, তাহা বাংলার সন্তান শ্রীচৈতন্যেরই অবদান।

ইহারই পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুরের নিরভিমান অনলস প্রচার কার্যে প্রভাবিত হইয়া অতি বিলম্বেই অসংখ্য লোক নিমাইর মতবাদের অনুবর্তী হইল। বহু দুরাচারী দুর্বৃত্তের হৃদয়ে ভক্তিভাবের সঞ্চার ঘটিল। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য জগাই, মাধাই নামে কুখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশ শাসদার জগদানন্দ ও মাধবানন্দ রায়ের কাহিনী, যাহাদের প্রকাশ্য রাজপথে মদ্যপান করিয়া মাতলামী, অসহায় নারীগণের শ্লীলতাহানি, যদৃচ্ছ রাহাজানি, শিষ্ট ধর্মস্থানে নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ, প্রাত্যহিক জীবনের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু নিমাই দৃপ্তকণ্ঠে যখন বলিলেন কাহারও প্রতি দ্রোহ করিলে সেই উৎকট কর্মের ফল ইহজীবনেই ভোগ করিতে হইবে এবং নিজের মঙ্গলের জন্য অপরের প্রতি অনাচরণে বিরত থাকা উচিত, তখন তাহাদের এমন ভাবান্তর হইয়াছিল যে, পূর্ববর্তী অশিক্ষিত সমাজবিরুদ্ধ গর্হিত অনাচারপূর্ণ জীবনের জন্য অন্তরে অনুক্ষণ আন্দোলিত হইয়া স্নানার্থীগণের সুবিধার জন্য অনুতপ্ত চিত্তে কঠোর শ্রমে স্বহস্তে, গঙ্গায় সহজে নামিবার সোপান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন যাহা নবদ্বীপে এখনও 'মাধাইয়ের ঘাট' নামে প্রসিদ্ধ। প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানান্তে দুই ভাই সিক্ত বস্ত্রে গঙ্গাতীরে বসিয়া দুই লক্ষ হরিনাম জপ সাঙ্গ করিয়া গৃহে ফিরিতেন। এইরূপ অতি কঠোর তপস্যার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া, তাহারা শ্রেষ্ঠ ভক্ত বৈষ্ণব রূপে খ্যাত হইয়াছিলেন যাহা নিমাই প্রবর্তিত নাম মহিমারই প্রত্যক্ষফল।

জগাই ও মাধাইর এই অপূর্ব পরিবর্তন কাহিনী সর্বত্র প্রচারিত হইলে নিমাই পণ্ডিতকে অসাধারণ শক্তিধর ভাবিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত নবদ্বীপ-বাসীগণের, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি অত্যধিক বাড়িয়া গেল। ফলে সর্বত্র অবাধে হরিনাম প্রচার সহজ হইল। এদিকে আপন নিকপম জীবনচন্দে ব্রজমাধুরীর নিগূঢ় বার্তা সকলের গোচরীভূত করিবার অভিপ্রায়ে, নিমাই ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হইয়া কোনদিন শ্রীবাস অঙ্গনে, কখনও শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে, কীর্তনরসে নিমগ্ন থাকিয়া সেই ব্রজভাবের চরমপ্রাপ্তির পরম ভূমিকারূপ সাধ্যতত্ত্বে উপনীত হইবার পাথেয় সংগ্রহের প্রচেষ্টারূপ সাধনতত্ত্ব, আপনি আস্বাদন করিয়া ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। মুক্তিকথাটি কোন দুঃখের বন্ধন হইতে অব্যাহতি বুঝায়। কিন্তু ভক্তি বলিতে বস্তুবিশেষের আস্বাদন জ্ঞাপন করে। সাধ্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি, তাই আস্বাদনীয় ব্যাপার এবং তাহা অন্তরে সঞ্চারিত করিবার সাধনা,- নামজপ ও নামকীর্তন। ভক্তিভাবকে ধরিয়া রাখিবার উপায় বহিরঙ্গে নামকীর্তন এবং অন্তরঙ্গে রসা-

স্বাদন, ইহাই ছিল মহাপ্রভুর অভিমত।

কীর্ত্তনানন্দে অনুক্ষণ অভিনিবিষ্ট থাকাকালে নিমাইর সর্বাঙ্গে মহাকম্পের উদ্ভব হইয়া, ভগবৎ আবেশে অবিরল অশ্রুধারা ঝরিতে থাকিত ক্রমে পূজাআহ্নিক করিতেও অপারক হইয়া পড়িলেন। স্নানান্তে বিষ্ণুপূজার জন্য আসনে উপবেশন করিবামাত্রই ঈশ্বরপ্রেমে অভিভূত হইয়া অচেতনপ্রায় হইতেন এবং অবিরত বিগলিত নেত্রবারিতে পরিধেয় বসন সিক্ত হইত।

এমনি ভাবাবিষ্ট অবস্থায় একদিন 'পুণ্ডরীক' বলিয়া ক্রমাগত রোদন করিতে লাগিলে, সকলে ইহাকে ভগবৎ বিরহ ভাবিয়া ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য অনুধাবনে অক্ষম হইল। অবশেষে সবাইকে বিস্মিত করিয়া, পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম নিবাসী, বিশিষ্ট বিত্তশালী ব্রাহ্মণ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-যিনি বাহ্যিক বিষয়ীর মত থাকিলেও, অন্তরে তীব্র ভক্তি ছিল সতত প্রবাহিত-বহুসংখ্যক 'বৈষ্ণবভক্ত' সমভিব্যাহারে নবদ্বীপ আসিয়া বিকালে একা সকলের অলক্ষিতভাবে অতি দীনবেশে শ্রীবাস গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া কীর্ত্তনরত নিমাইকে দর্শন করিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইলেন। আনন্দে নিমাইর আনন্দাশ্রুতে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ সিক্ত হইয়া, আরও একজন লীলাসঙ্গীর সহিত মিলন ঘটিল

অধ্যাপকের পরাভব

"তুচ্ছ আঘাতে বাজে ব্যথা আজো তাহাতে দুঃখ নাই,
সব ব্যথা হোক তোমাকেই দিয়ে, আজ শুধু তাই চাই।'

অতঃপর প্রায় এক বৎসরকাল নিমাইর নেতৃত্বে হরিনাম মহামন্ত্রই, চিত্ত মার্জ্জিত করিয়া, বাক্য ও মনের অগোচর শ্রীহরিকে অন্তরে নামাইবার একমাত্র উপায়-ইহা বিপুল উৎসাহে সর্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে নিমাই নিজেও আর্ত্তহৃদয়ে, ভক্তগণের সহিত নৃত্যগীত করিতে করিতে, অজ্ঞমূর্খ, ধনীদরিদ্র, অন্ত্যজঅস্পৃশ্য সকলের দ্বারে উপস্থিত হইয়া হরিনাম জপ ও সমবেত সঙ্কীর্ত্তনের সীমাহীন মহিমা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহামানবগণের জীবনসাধনার পথ, কত দুর্গম, কতযে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া তাঁহাদের পথ অতিবাহন করিতে হয়, কত বিদ্বেষবিষের জ্বালা সহ্য করিয়া অমৃত উপহার দিতে হয়, সেই সকল কাহিনীর মহিমা, সংসারের সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানবগণের পক্ষে পরিমাপ করা একেবারেই অসম্ভব।

উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণজনের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেও, একশ্রেণীর দাম্ভিক বর্ণাভিমানী, প্রাচীনপন্থী গোঁড়া পাণ্ডিত্যের দল, নিমাইর এই লোকপ্রিয়তার অভূতপূর্ব প্রতিপত্তিতে, ঈর্ষান্বিত হইয়া, তাঁহার মতবাদকে অবৈধ-অনাচার ও শাস্ত্রবিরুদ্ধতা বলিয়া আখ্যা দিয়া, আভিজাত্যগর্ব্বী কতিপয়

বর্ণজ্যেষ্ঠের সহায়তায়, তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল।

অপরদিকে নিমাইর ভাগবদীয়ভাবে আবিষ্টতার ও ভগবৎ প্রেমে তন্ময়তার, এমন অভ্যুদয় হইল যে, তিনি ভাবের প্রাবল্যে, প্রায়ই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যাইতেন। উচ্চভাবের গূঢ়মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম, ব্যর্থ আচার সর্বস্ব ও ভগবদ্ভক্তি হীন কিছু আত্মম্ভরি লোক, এই মহাভাবকে নিমাইর মূর্চ্ছারোগ বলিয়া প্রচার শুরু করলে, লোকমুখে ইহা অবগত হইয়া, ব্যথিত ও চিন্তান্বিত নিমাই, শুষ্কজ্ঞানী ও বিদ্যাগর্বী এই সকল ব্যক্তিগণের হৃদয়ে ভক্তিসঞ্চার করিয়া তাঁহাদিগকে কৃষ্ণনাম গ্রহণে ভক্তিপথ অবলম্বন করাইবার অভিপ্রায়ে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে মনস্থির করিলেন। কারণ সম্যকরূপে ত্যাগী সন্ন্যাসীকে সকলেই সর্বত্র সর্ব স্থানে সর্বতোভাবে সমুচিত সমাদর করিয়া তাঁহার উপদেশাদি মান্য করিয়া থাকে।

এইরূপ মানসিক অবস্থা সময়ে কেশব ভারতী নামে একজন শুদ্ধসত্ত্ব সন্ন্যাসী এই অভিনব ধর্ম প্রচারে মগ্ন হইয়া সাক্ষাত দর্শনের অভিপ্রায়ে নিমাই পণ্ডিতের গৃহে আগমন করিলেন। নবদ্বীপের অনতিদূরে, ভাগিরথী ও অজয়নদের সঙ্গমস্থলে কাটোয়া গ্রামে জনকোলাহল হইতে দূরে গঙ্গাতীরে এক পর্ণ কুটিরে নিস্পৃহ এই সন্ন্যাসী, কিয়ৎকাল পূর্ব হইতে অবস্থান করিয়া সাধন ভজনে নিমগ্ন ছিলেন। পরম সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলে, নিমাইর দেহকান্তি ও প্রেম পুলকিত ভাব নিরীক্ষণ করিয়া, অতীব বিস্মিত কেশব ভারতী অত্যধিক ভাবাবেগে কতক্ষণ ভগবৎ ভক্তি প্রসঙ্গ পরস্পর আলোচনা করিবার পর প্রস্থানকালে নিমাই ভক্তিপূর্বক আভূমি প্রণত হইয়া, তাঁহার নিকট সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হইবার উদগ্র বাসনা নিবেদন করিলেন।

এই ঘটনা পরম্পরার দিন কয়েক পর যশোহর জেলার তালখড়ি গ্রাম নিবাসী শ্রী অদ্বৈত প্রভুর মন্ত্রশিষ্য, পদ্মনাভ চক্রবর্তীর একমাত্র পুত্র, অতি অল্প বয়সেই মহাপণ্ডিত, দেবতুল্যকান্তি, লোকনাথ, অখিলব্রহ্মাণ্ডের পতি শ্রীকৃষ্ণ, নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব নয়নগোচর হইয়াছেন, এই রূপ স্বপ্নদর্শন এবং লোক মুখে নিমাই পণ্ডিতের লোকোত্তর কাহিনী শুনিয়া, তাহার সান্নিধ্যে যাইবার জন্য অধীর হইয়া পড়িলে হয়ত তাঁহার প্রভাবে পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসিবে না ভাবিয়া, উদ্বিগ্ন পিতামাতা তাহাকে সত্বর বিবাহ দিয়া সংসারে আবদ্ধ রাখিতে স্থির করিলে অগ্রহায়ণ মাসে রাত্রিযোগে সকলের অগোচরে, দ্রুত গমনে নবদ্বীপ অভিমুখে চলিয়া, সন্ধ্যায় মহাপ্রভুর আবাসে আসিয়া পৌঁছিবামাত্র, যেন কাহারও প্রতীক্ষায় বারান্দার পিঁড়িতে উপবিষ্ট উৎফুল্ল নিমাই, 'লোকনাথ আসিয়াছ' বলিয়াই ছুটিয়া গিয়া দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিলে, তিনি গৌর হরির কোলে মূর্চ্ছা গেলেন। অতঃপর অনেক

নিগূঢ় কথা বলিয়া, তাঁহাকে অবিলম্বে বৃন্দাবন গমনের নির্দ্দেশ দিয়া বলিলেন, সেখানে চীরঘাটে কদম্ব তমাল ও বকুল বৃক্ষ সুশোভিত নিভৃত নিকুঞ্জে তাঁহার ভজনস্থান নির্দ্ধারিত রহিয়াছে এবং যথাকালে "নরোত্তম ঠাকুর" নামে এক যুবক তাঁহার সাধন সঙ্গী হইবে।

উল্লেখ যোগ্য যে সন্ন্যাস গ্রহণের দুই বৎসর পর গৌড়ের রাজধানীর অন্তর্গত 'রামকেলি' হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে অকস্মাৎ 'খেতরি' গ্রামের দিকে দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া 'বাপ নরোত্তম' বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে ডাকিয়া উঠিয়াছিলেন,—যেন সেই অনাবিল আকুল আহ্বানে অনাগত আকর্ষণের আধিক্যের আতিশয্য বশতঃ। পরবর্ত্তী বৎসর মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের তিথিতে মাঘীপূর্ণিমার গোধূলি লগ্নে রামপুর বোয়ালিয়া নগরের অদূরে গড়ের হাট পরগণার, গঙ্গা নিকটবর্ত্তী 'খেতরি' গ্রামে [illegible] রাজ খেতাব প্রাপ্ত বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার, কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্ররূপে, ভুবন[illegible] এবং শ্রীজীবগোস্বামী কর্তৃক 'ঠাকুর' আখ্যাপ্রাপ্ত, নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন।

শিশুকাল হইতেই একই গ্রামবাসী কৃষ্ণদাস নামে এক প্রাচীন ব্রাহ্মণের নিকট নবদ্বীপে ভগবানের মূর্ত্তরূপ গ্রহণের কাহিনী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিতেন। ইতিমধ্যে মহাপ্রভু অপ্রকট হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া, অনুমান ষোল বৎসর বয়সে পিতৃদেব কর্তৃক নিযুক্ত প্রহরীর বাধা অতিক্রম করিয়া, সন্ন্যাসী নিমাইর লীলাস্থল বারাণসী দর্শনান্তে শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিয়া সম্পূর্ণ অর্পিত চিত্ত লোকনাথকে দেখিয়াই আপন অগোচরে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় তাঁহার অমল কমলসদৃশ অতি শুভ্র চরণতলে পতিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন।

তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত আদেশ বাক্যের অনুসরণে, নিমাই কৃপাধন্য, বিংশতি বর্ষীয় পরম সুন্দর লোকনাথ আর স্বগৃহে প্রত্যাগমন না করিয়াই, রাত্রির বিশ্রামান্তে পরদিন অতি প্রত্যুষে, অর্থাৎ নবদ্বীপচন্দ্র নিমাইর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ববর্ত্তী অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিবসে, একমাত্র সঙ্গী পণ্ডিত গদাধরের শিষ্য, সমবয়স্ক যুবক 'ভূগর্ভ' কে সঙ্গে লইয়া — জন্মের মত জন্মস্থান, পিতামাতা প্রভৃতি আপন জনের স্নেহ স্মৃতির কথা যেন বিস্মৃত হইয়া,— কপর্দ্দকহীন অবস্থায়, একমাত্র বস্ত্র ও কৌপীন সম্বল করিয়া, তৎকালে হিন্দুরাজ ও বহিরাগত মোশলমানের সহিত অনবরত সংগ্রাম জনিত কারণে, পথের সাথী ও সহায়কারী সওদাগরের সন্ধানহীন, সদা অবরুদ্ধ সমুদয় প্রকাশ্যপথ এড়াইয়া কেবলমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা নির্ভরে, দুই মাসের পথ প্রায় চারিমাসে অতিক্রমের পর, অবশেষে শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হইলে, সারাদিনের অনেক অনুসন্ধানে অরণ্যে আবৃত নিমাই বর্ণনা অনুযায়ী চীরঘাট' প্রাপ্ত হইয়া, সেই ভূমিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্বক, যেন অলৌকিক কার্য্য-

কারণ সম্বন্ধে নিমাইর জন্মসময়ক্ষণে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথির প্রদোষকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদত্ত ধ্বজাদণ্ড প্রোথিত করিয়া তথায় উপবেশন করিলেন। ইনিই শ্রীবৃন্দাবনে নিমাইর সর্বপ্রথম অগ্রিম বার্তাবহ ও স্বপ্রতিষ্ঠিত অগ্রদূত, একমাত্র অগ্রগণ্য বাঙ্গালী সন্তান

তখন ১৪৩১ শকাব্দ, অর্থাৎ ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস। নিমাই পণ্ডিত মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিতে চলিয়াছেন। এই বৎসরেই নবযৌবনে পূর্ণিমা তিথির শেষরাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া কেশবভারতীর নিকট বিধিমত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অরুণবর্ণ বসন পরিহিত, মুণ্ডিত মস্তক, চন্দনচর্চিত ললাট দিব্যকান্তি, শান্ত বক্ষ দণ্ডকমণ্ডলুধারী, প্রেমবিগলিতাশ্রু করুণ নয়ন, সন্ন্যাসী নিমাই স্বীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেন। সহসা দৈবাদেশ প্রাপ্ত হইয়া দীক্ষাগুরু কেশব ভারতী নবদীক্ষিতের বক্ষে হস্তার্পণ পূর্বক বলিলেন, জগদ্বাসীকে কৃষ্ণনাম চৈতন্যবিধান করাইবার জন্যই তোমার আবির্ভাব, তাই অদ্য হইতে তোমাকে ভগবৎ প্রদত্ত "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নাম প্রদান করা হইল। তদবধি সংক্ষেপে "শ্রীচৈতন্য" নামটি ঐতিহাসিক গ্রন্থাদিতে এবং ভক্ত হৃদয়ে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে

অন্তাপর্ব

"সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ ; তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ।
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ, সেও আছে তব ভবনে॥"

মাঘীপূর্ণিমার শুভক্ষণে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিবার পর দিনকয়েক শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে অবস্থানকালে নবদ্বীপ হইতে দ্বাদশ দিবসের উপবাসী, শচীদেবীকে দোলা করিয়া আনয়ন করিলে পুত্রের মুণ্ডিত মস্তক দেখিয়া, শোকে বিহ্বল মাতার চরণে সন্ন্যাসী নিমাই দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া পড়িলেন, নানাদিক হইতে আগত ভক্তবৃন্দের সকরুণ কীর্তন গানে চতুর্দিক মুখরিত হইল। অদ্বৈতের গৃহে চলিল, বিরাট উৎসব, যাহার রন্ধন কার্য্যের দায়িত্ব পুত্রবিচ্ছেদ কাতর, শচীদেবী স্বতঃ প্রণোদিত ভাবে নিজে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর কাটোয়াস্থিত শ্রীবাসের পল্লীভবনে এবং সন্নিকটবর্ত্তী বিশিষ্ট ভক্তগৃহে এক এক রাত্রিবাস করিয়া ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চব্বিশ বৎসর পূর্ণ হইলে, চৈত্রমাসে শচীদেবীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া, সন্ন্যাস ব্রতধারী নিমাই নীলগিরি পর্বতমালা বেষ্টিত নীলাচলের পুরীধাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে চলিলেন,—নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, এবং ব্রহ্মানন্দ।

সঙ্গীগণ পরিবৃত সন্ন্যাসী নিমাই গঙ্গার কূল ধরিয়া পদব্রজে চলিতে

চলিতে বর্ত্তমানে ডায়মণ্ড হারবারের অন্তর্গত, ছত্রভোগ গ্রাম পর্যন্ত আসিলেন তৎকালে ঐ স্থানের অপর প্রান্তেই ছিল, উড়িষ্যা রাজ্যের সীমানা এবং সেখানেই গঙ্গাপার হইয়া নীলাচলের পথ ধরিতে হইত। কিন্তু সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চল বলিয়া এলাকাটি ছিল, অত্যন্ত বিপদ সঙ্কুল এমন সময় ছত্রভোগ অঞ্চলের ভূস্বামী ও সুলতানের সেনাধ্যক্ষ রামচন্দ্র খাঁ চতুর্দ্দোলায় আকস্মিক ভাবে উপস্থিত হইয়া, অদূরে গঙ্গাঘাটে রুগ্নমান সন্ন্যাস বিগ্রহ নিমাইর তেজঃপূর্ণ দেহকান্তি দর্শনে, সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া, কোন সাহায্য করিতে পারেন কিনা জানিতে চাহিলেন। সঙ্গীগণ তাঁহাদিগকে নদীপার করাইয়া নীলাচল যাত্রার উপায় করিবার অনুরোধ জানাইলে সকলকে তাঁহার গৃহে আহারের আমন্ত্রণের প্রার্থনা রাখিয়া রাত্রির শেষভাগে বিশ্বস্ত নাবিক দ্বারা গঙ্গার অপর তীর প্রয়াগ ঘাটে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, যেখান হইতে উড়িষ্যা দেশের আরম্ভ।

সঙ্গীগণ সহ কীর্ত্তন করিয়া পথ চলাকালে রাত্রিতে কখনও বৃক্ষতলে, কোনদিন গ্রামে চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় নিতেন। গ্রামবাসীগণ ব্যস্ত হইয়া আহারের বন্দোবস্ত করিত এইভাবে কিছুদিন পর সুবর্ণরেখা নদীর অপর পারে বালেশ্বর জেলার রেমুণাগ্রামে "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ" মন্দিরে ত্রিরাত্র বাস করিয়া, প্রত্যুষে নীলাচল অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। যাজপুরে বৈতরণী নদীতে স্নানান্তে কটক সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর মন্দিরাদি দর্শন করিয়া, কিছুদিন পর পুরীর সন্নিকটে আঠারনালা গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলে,— সাধারণ সন্ন্যাসীর ন্যায় ভগবানের অবতার শ্রীচৈতন্যের ভক্তি দণ্ড ধারণের আর প্রয়োজন নাই, বলিয়া নিত্যানন্দ প্রভু তাহা ভগ্ন করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে, নিমাই কপট ক্ষুব্ধ হইয়া, জগন্নাথ দেবের মন্দিরে সঙ্গীহীন একক প্রবেশ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া, নিমেষকাল মধ্যেই যেন অচিন্ত্যশক্তি বলে সকলের আড়ালে চলিয়া গেলেন। বস্তুতঃ দেবালয়ের গর্ভগৃহে একাকী প্রবেশ করিয়া লীলাসঙ্গী সাক্ষাৎকারের যেই অপূর্ব ব্যাপার অচিরেই সংঘটন হইবে, যাহা নিত্যানন্দ প্রমুখ সঙ্গীগণ সঙ্গে থাকিলে কিছুতেই সম্ভবপর নয়, শ্রীচৈতন্য যেন নিত্যানন্দকে প্রেরণা দিয়া 'দণ্ড ভঙ্গ' করাইয়া, তাহারই ক্ষেত্রে প্রস্তুত করিলেন।

সকলের অলক্ষিতভাবে জগন্নাথ মন্দিরে পৌঁছিবার পর, মন্দিরের দ্বারদেশে বাহ্যজ্ঞান বিরহিত প্রেমবিভোর তন্ময়ভাবে বিগ্রহ দর্শন করা কালে, শ্রীচৈতন্যের মনে উদয় হইল,— দারুব্রহ্ম যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছেন। সহসা সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে, অতর্কিতে লাফ দিয়া বেদীমূলে উঠিয়াই জগন্নাথদেবকে

আলিঙ্গন করিয়া মহাপ্রেমের আবেগে অচেতন প্রায় মঞ্চতলে পতিত হইলেন। মন্দিরের বেত্রধারী 'পড়িছা' একজন সুদর্শন সন্ন্যাসীর এই বিসদৃশ আচরণে চমকিত হইয়া, উন্মাদগ্রস্ত বোধে বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইবামাত্র, দৈবক্রমে তথায় উপস্থিত, সর্বজন পরিচিত, পঞ্চদশাধিক বৎসর বয়স্ক, সম্ভ্রান্ত প্রবীণ ব্রাহ্মণ, সর্বশাস্ত্রবিৎ, উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রধান রাজসভা পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম, অবিলম্বে অগ্রসর হইয়া, নিমাইর নিশ্চেষ্ট বপু নিজ ক্রোড়ে ধারণ করিলেন, যাহাতে নিষেধবাক্য শুনিবার পূর্বেই অতি উত্তেজিত কেহ আঘাত করিবার অবকাশ না পায়।

অতঃপর অপূর্বসুন্দর মূর্চ্ছাগত নবীন সন্ন্যাসীর প্রতি মমতা ও শ্রদ্ধায় আপ্লুত, মন্দিরের সেবকগণের সহায়তায়, শুশ্রূষার জন্য নিকটবর্ত্তী নিজ বাটীতে নিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে নিত্যানন্দ ও সঙ্গীগণ মন্দিরে পৌঁছিয়া ঘটনা-পরম্পরা অবগতিতে নিতান্ত কাতরভাবে সার্বভৌমের গৃহে উপনীত হইলে, সেখানে নিমাইর সংজ্ঞাহীন মৃতকল্প অবস্থা দর্শনে, শঙ্কিত হইয়া উচ্চৈস্বরে সঙ্কীর্ত্তন শুরু করিবামাত্র, সার্বভৌমকে বিস্মিত করিয়া চেতনা প্রাপ্ত নিমাই আনন্দভরে নৃত্যরত হইলেন এবং সঙ্গীগণ সহ কীর্ত্তন করিতে করিতে সমুদ্র-স্নান ও দেবদর্শন করিয়া আসিয়া সার্বভৌমের অনুরোধে তাঁহার গৃহে মন্দির হইতে আনীত জগন্নাথদেবের প্রসাদ সকলে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে নদীয়া নিবাসী ভগ্নিপতি গোপীনাথাচার্য্যের নিকট পরিচয় অবগত হইয়া, বুঝিতে পারিলেন, নিমাইর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, একসময় সার্বভৌমের পিতা পণ্ডিত বিশারদের সহাধ্যায়ী ছিলেন। পিতার সম্পর্কে আত্মীয়বোধের প্রীতিবশতঃ এবং নিমাইর বিনীত ও মধুর প্রকৃতিতে তীব্র ভগবৎ প্রেমের সাত্ত্বিক বিকার অনুধাবনায় নির্জ্জনস্থানে অবস্থিত নিজ মাতৃস্বসার উদ্যানবাড়ীতে বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিলে, নিমাই এই ব্যবস্থায় সম্মত হইলেন। বস্তুতঃ নীলাচলের ধর্ম্মীয় উপদেষ্টা তথা সমগ্র ভারতের অদ্বৈতমতাবলম্বী গণের শীর্ষস্থানীয়, বাসুদেব ভট্টাচার্য্যকে ভক্তিমার্গে আনয়নের প্রয়োজনেই এই লীলার প্রকাশ,-যাহা সঙ্গীগণ সঙ্গে থাকিলে সুচারুরূপে সহসা সম্পন্ন হইত না। তাই বিষয়টিতে ঐশীঅভিলাষেরই অভিব্যক্তি, যাহা অস্বীকার করা যায় না।

দিন কয়েক পর, গোপীনাথ ও মুকুন্দদত্তকে সঙ্গে লইয়া সার্বভৌমের গৃহে গমন করিলে, তিনি অতি সমাদরে বসিবার আসন দিয়া, নিমাইকে লক্ষ্য করিয়া গোপীনাথকে বলিলেন যে, অতি মনোহর চিত্তাকর্ষক নবীন সন্ন্যাসী এই পূর্ণ যৌবনকালে কিরূপে স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিবে, তাহা সবিশেষ চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহাকে নিরন্তর বেদান্তশাস্ত্র পড়াইতে ইচ্ছা করিয়াছেন,-

যাহাতে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই জ্ঞানের উপলব্ধি ও হয়ত দুর্দম যৌবন বেগকে উপেক্ষা করিতে পারিবে। সন্ন্যাসী নিমাই বিনম্রভাবে জানাইলেন যে জগন্নাথ দর্শনকালে ঘোর বিপদ হইতে রক্ষাকারী সার্বভৌম পণ্ডিতের নির্দেশ তিনি অবশ্যই মান্য করিবেন।

অতঃপর প্রত্যহ অপরাহ্ণে বহু অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর উপস্থিতিতে, প্রধানতঃ সন্ন্যাসী নিমাইকে শিক্ষাদানের গর্বিত অভিপ্রায়ে, ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত ও সর্বশাস্ত্রে অসীম পাণ্ডিত্যের জন্য সার্বভৌম উপাধি প্রাপ্ত বাসুদেব ভট্টাচার্য অতি আগ্রহে বেদান্ত পাঠ ও তাহার নিপুণ ব্যাখ্যা করিতে থাকিলে কোনরূপ প্রশ্নাদি কিংবা আপত্তি উত্থাপন না করিয়া, বিনীত শিষ্যের মত সপ্তদিবস ব্যাপী বাক্যহীন নীরবে শ্রবণ করিয়া গেলে, অষ্টমদিবসে বাসুদেব সার্বভৌম নিমাইকে বলিলেন কোন কিছু প্রশ্নাদি না করায় বেদান্তদর্শনের এই অর্থপ্রকাশ তাঁহার সম্যক বোধগম্য হইতেছে কিনা তাহা তিনি বুঝিতে ছেন না, তাই জিজ্ঞাসাবাদ করিলে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির নিরিখ নির্ণয় করিয়া তদনুযায়ী তিনি আরও সরলভাবে উপদেশ করিতে পারেন। তদুত্তরে মহাপ্রভু সবিনয়ে বলিলেন তাঁহাকে কেবল শুনিবারই আদেশ হইয়াছে, প্রতিবাদ করিতে নয়। তবে যে শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন হইতেছে তাহার মর্ম অনায়াসে অনুধাবনে অসুবিধা না হইলেও এই শংকরভাষ্য বিশ্লেষণ অনুসরণেই বিভ্রান্তি ঘটিতেছে, যেহেতু ইহা বেদান্তদর্শনের স্বকল্পিত বিকৃত ব্যাখ্যা মাত্র।

সর্বসমক্ষে এইরূপ উক্তিতে ক্ষুব্ধ বাসুদেব সার্বভৌম সন্ন্যাসী নিমাইকে ক্রোধভরে কেবলমাত্র আত্মারাম সূচক শ্লোকটির মর্মার্থ আলোচনা করিতে বলিলে, তিনি যুক্তি সহকারে শঙ্করভাষ্যের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া, বেদান্ত সূত্রের সাহায্যেই ভক্তিবাদ স্থাপন পূর্বক বিস্মিত সার্বভৌম পণ্ডিতকে বলিলেন ভগবানে পরম অনুরক্তিই ভক্তি, যাহা জীবমাত্রেরই জীবনের চরম লক্ষ্য, কারণ ইহাই পরমেশ্বরে সহিত সহজে যুক্ত হইবার একমাত্র উপায় জানিয়া, আত্মারাম অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলাভ হেতু তৃপ্ত মননশীল তপস্বীগণ, সর্বপ্রকার বন্ধনশূন্য হইয়াও, ভগবানকে ভক্তিপথেই ভজনা করিয়া থাকেন এবং এই তত্ত্ব বেদান্তদর্শনেরই অনুসরণে শ্রীমদ্ভাগবতে বিস্তারিত আলোচিত রহিয়াছে।

ইহা শুনিয়া সার্বভৌম প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সহকারে স্বীয় মতবাদের অনুকূলে, উক্ত শ্লোকটির নয় প্রকার বিবিধ ব্যাখ্যা করিলে, মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া অবলীলাক্রমে ও নির্বিকার চিত্তে ভক্তিরসের সমর্থনে, ইহার আঠার রকম ব্যাখ্যা স্থাপন করিয়া শুনাইলে, স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি পণ্ডিত বাসুদেবের পাণ্ডি-ত্যের গর্ব খর্ব হইয়া, মায়াবাদের মোহ অন্তর্হিত ও চিত্তে নির্মল ভগবদ্ভক্তির

উদয় হইল। তিনি তরুণ সন্ন্যাসী নিমাইকে ভগবৎসদৃশ জ্ঞান করিয়া গললগ্নীকৃত বাসে তাঁহার ফুল্লকুসুম সদৃশ সুকোমল চরণতলে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া পড়িলে, মহাপ্রভু স্নেহভরে মস্তকে স্পর্শ করিবামাত্র, পণ্ডিতের অন্তর্দৃষ্টিতে নিমাইর রূপান্তরিত তাঁহার অপরূপ ষড়ভুজ নারায়ণ মূর্তি প্রতিভাত হইল।

তর্কশাস্ত্রে অদ্বিতীয়, বেদান্তে পরম পণ্ডিত, সহস্র সহস্র মায়াবাদী সন্ন্যাসীর উপদেষ্টা ধর্মগুরু চিত্তে ও জ্ঞানে পীন, বাসুদেব সার্বভৌমের কুয়াশাচ্ছন্ন জীবনের অবসান ঘটিয়া, যেন নবজীবন লাভের প্রথম প্রভাতে নবীন সূর্য্যের প্রকাশ দেখা দিল। সেইদিন হইতে তিনি মহাপ্রভুর একান্ত অনুরক্ত ভক্ত হইলেন। তাঁহার এই অচিন্তনীয় পরিবর্তনে সন্ন্যাসী নিমাইর প্রতি আপামর জনসাধারণের ভক্তিশ্রদ্ধা আরও অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। উড়িষ্যার সম্রাট প্রতাপরুদ্র পর্য্যন্ত চমৎকৃত হইয়া মহাপ্রভুর সর্বপ্রকার সন্তোষ বিধান তথা তাঁহার কৃপালাভের প্রত্যাশায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, প্রতি বৎসর জগন্নাথদেবের রথযাত্রার প্রাক্কালে নবদ্বীপ হইতে আগত শত শত নিমাইদর্শনার্থীর বৈষ্ণবভক্তের বাসস্থান ও প্রসাদান্নের রাজকীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন।

চৈত্রমাস পুরীধামে অবস্থানকালে, মায়াবাদী বাসুদেব সার্বভৌমকে ভক্তিবাদে অনুপ্রাণিত করিয়া, পরবর্তী চিহ্নিত লীলাসঙ্গীর সহিত মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে, নিমাই দক্ষিণ ভারতাভিমুখে রওনা হইলেন। সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধে জলপাত্র এবং বস্ত্রাদি বহন করিবার জন্য কৃষ্ণদাস নামে মাত্র একজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গী রাখিলেন। পুরী হইতে ক্রোশ তিনেক দূরে আলালনাথের মন্দিরে রাত্রিবাস করিয়া পরদিন অতি প্রত্যুষে পুনরায় পথ পরিক্রমায় বাহির হইলেন।

কথিত আছে এ সময় 'কূর্মস্থান' নামক তীর্থক্ষেত্রের পথিপার্শ্বে প্রায় চলৎশক্তিহীন, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, বাসুদেব নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে,— গলিত দেহ হইতে মুক্তি প্রার্থনায়, ঈশ্বর উদ্দেশ্যে আর্তকণ্ঠে কাতর আবেদনরত দেখিয়া,— দয়ার্দ্র মহাপ্রভু করুণাভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া রোগমুক্তি মানসে অবিরাম হরিনাম কীর্তন করিবার উপদেশ দিয়া,—প্রত্যাবর্তনমুখে সম্পূর্ণ নিরাময় পাইয়া, শ্রীহরিনামের প্রতি তাঁহার আত্যন্তিক নির্ভরতার একনিষ্ঠায় সন্তোষলাভে, যথাসত্বর শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীরূপের সহিত মিলিত হইয়া ভক্তি-ধর্ম প্রচারের নির্দেশ প্রদান করিলেন,— যদিও রূপ ও সনাতনের বৃন্দাবন গমন, তখনও গৌরলীলার পাদপীঠে আসে নাই।

''কৃষ্ণকেশব, কৃষ্ণকেশব, কৃষ্ণকেশব পাহিমাম্। রামরাঘব, রামরাঘব,

রামরাঘব রক্ষ মাম্'—আপনমনে, নিজভাবরসে অবিরত বলিতে বলিতে, ঊর্দ্ধবাহু পথ চলাকালীন, পথিপার্শ্ব যেন মুখরিত ও আপ্লাবিত হইতে লাগিল — যাহার অনিবার্য্য আকর্ষণে গ্রামগ্রামান্তর হইতে দলে দলে লোক এই নামগানের সামিল হইয়া, তাহা নিজ নিজ বসতি এলাকায় মহা উৎসাহে প্রচার শুরু করিল। এবং এই প্রণালী এত অধিক কার্য্যকরী এবং সুদূর প্রসারী হইয়াছিল যে, সর্বত্র সহজেই প্রভাবান্বিত তৎস্থানীয় সমগ্র গ্রামবাসী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত ভগবৎ আরাধনার পূর্বোক্ত অভিনব সরল পদ্ধতিতে অতিমাত্রায় অনুপ্রাণিত হইয়া, বৈষ্ণবধর্মের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল

এইভাবে চলার পথেও অমৃতলোকের আনন্দ সংবাদ আবাল বৃদ্ধ বণিতাগণের নিকট নির্বিচারে বিতরণ করিয়া রামানন্দরায়ের নিবাসস্থল 'বিদ্যানগরে' উপনীত হইয়া অদূরে প্রবাহিত গোদাবরীতে অবগাহন স্নানান্তে নির্লিপ্তভাবে পাদচারণ করিতে করিতে যেন কাহার অধীর প্রতীক্ষায় ইষ্টনাম জপে নিমগ্ন রহিলেন। ইতিমধ্যে কোন বিশেষ পর্ব উপলক্ষে কি যেন কামনা প্রকাশের দৈবযোগে, বহু সম্ভ্রান্তব্যক্তি পরিবেষ্টিত, রায় রামানন্দ দোলা আরোহণে গঙ্গাস্নানের জন্য সেইস্থান অতিক্রম সময়ে সহসা সূর্য্যের মত তেজঃপুঞ্জ কান্তি সন্ন্যাসী নিমাইকে অবলোকনে চির আশ্রয়স্থল লাভ হইল ভাবিয়া, শিবিক হইতে সত্বর অবতরণ করিয়াই তাঁহার রক্তিম চরণকমলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন।

প্রণাম মানুষকে ছোটবড় পৃথকীকৃত করে বলিয়, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম ধর্মে অপরিচিতকে প্রণামপূর্বক সম্ভাষণ প্রচলিত নয়। পরিচয় জিজ্ঞাসার ধৈর্য ধারণে অশক্ত, মহাভাবে অভিভূত মহাপ্রভু তাঁহাকে পরমস্নেহে হস্তাকর্ষণে তুলিয়া, গাঢ় আলিঙ্গনে তৎক্ষণাৎ বক্ষে আবদ্ধ করিলে উভয়েই ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া, অচেতনপ্রায় ভূতলে পড়িলেন। উৎকল সম্রাটের প্রতিনিধি তথা মহাপ্রতাপান্বিত ও সম্যক সম্মানিত স্থানীয় প্রশাসক, পরমপণ্ডিত মহৎজ্ঞানী সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, নিপুণ ধর্মবেত্ত অপূর্ববক্তা অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতি, রামানন্দ রায়ের একান্ত অপ্রত্যাশিত এই আত্মবিস্মৃত বিচলিতভাব লক্ষ্য করিয়া, উপস্থিত রাজ অমাত্যবর্গ বিস্ময়ে বিমূঢ় ও চরিতার্থতায় চমৎকৃত হইলেন।

মানবমনের সত্যোপলব্ধি এবং বিশ্বাসের পরিধি, জন্মসূত্রেই নির্দ্ধারিত না থাকিলেও, জন্মান্তরিণ সংস্কার স্বকীয় সত্যানুভূতির সহায়ক হয়। তাই ঘটনার আকস্মিকতায় সকলেই প্রথমে বিব্রতবোধ করিয়া, পরিশেষে সম্মিলিত সন্তর্পণে উভয়কে সন্নিহিত বিশ্রামভবনে আনয়ন করিলে, অতি আকস্মিকভাবে সহসা সেখানে আগত, একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ সাধুসেবা

করিবার অভিপ্রায়ে, সন্ন্যাসবেশধারী নিমাইকে তাঁহার আবাসে কিছুদিন আথিত্য গ্রহণের আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাইলে,—যেন অভিনব এক লীলা প্রকাশের প্রবেশ পথ আসন্ন। অপক ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু মধুর হাস্য সহকারে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

সর্বজ্ঞ মহাপ্রভু সর্বাগ্রেই অবগত ছিলেন যে, সেই ব্রাহ্মণ গৃহেই তাহার লীলাসঙ্গী ষট গোস্বামীর অন্যতর গোপাল ভট্টের সন্ধান পাইবেন। সন্ন্যাসী নিমাই সেই ব্রহ্মগৃহে আগমন করা মাত্র, শিশু গোপাল সহজেই হামাগুড়ি দিয়া আসিয়া তাঁহার পদচুম্বন করিয়া, স্ব-গৃহে সতত শ্রুত শ্রীকৃষ্ণ স্তুতি মন্ত্র যেন জন্মান্তরীণ সংস্কার বশবর্ত্তীতে অস্ফুটস্বরে বারংবার আবৃত্ত করিতে লাগিলে,—আনন্দিত মহাপ্রভু, তাহাকে উপনয়নের পরই পুরীধামে পাঠাইবার আগ্রহ নির্দেশ রাখিলেন। এই ঘটনা প্রবাহ আকাস্মক যোগাযোগের মত অনুমিত হইলেও ইহা পূর্ব হইতেই স্থিরিকৃত লীলাসঙ্গী আহরণের অচিন্তিতপূর্ব লীলাবিলাস মাত্র।

বয়স্ক ও সর্বশাস্ত্র সুবিদিত বিদ্বানব্যক্তি হইলেও রামানন্দ মহাপ্রভুর আচরিত মতবাদ অবগত ছিলেন না। ধীশক্তি সম্পন্ন সন্ন্যাসী জ্ঞানেই অজ্ঞাতপরিচয় অনিন্দ্যসুন্দর নবীনসন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়াছিলেন কিন্তু গৃহ প্রত্যাগমনের পর হইতেই অন্তরের অত্যধিক আকর্ষণের প্রাবল্যে সন্ধ্যা সমাগমের সাথেসাথেই সম্মোহিতের ন্যায়, অতি সাধারণ বেশে, সেই ব্রাহ্মণ আলয়ে ধর্ম জিজ্ঞাসু হইয়া, সন্ন্যাসীসকাশে উপনীত হইলে, মহাপ্রভু তাহাকে প্রথমেই বলিলেন,—মহামানবগণের অনুষ্ঠিত যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপই, সাধারণের পক্ষে আচরণীয় নয়। ঐশ্বরিক প্রয়োজনে কোন বিশেষ কর্ম নিজে পরিগ্রহ করিলেও, তাঁহারা অপরকে সেইরূপ আচরণ অবলম্বনের উপদেশ দেন না। পক্ষান্তরে এমন কতকগুলি লোকহিতকর কার্যের উদ্যোগী হইয়া থাকেন যাহা আপনি আচরণ করিয়া, অপর সকলকে সেইভাবে প্রতি-পালন করিতে নির্দেশ প্রদান করেন।

অবোধ শিশুগণ যেমন আয়নায় প্রতিফলিত আপন আকৃতির সহিত বিবিধ অঙ্গভঙ্গিতে খেলা করে সেইরূপ আপনারই প্রতিমূর্তি ব্রজাঙ্গনাগণের সহিত শারদীয় পূর্ণিমা রজনীতে,—নিত্যধামে নিত্যলীলায়িত নিত্যলীলার অনুবর্তনে মর্ত্ত্যের শ্রীবৃন্দাবনে, যোগমায়া আশ্রিত আত্মহারাভাবে যৌথ নিত্যবিলাসরূপ পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অষ্টমবর্ষীয় বালক বয়সে অপ্রাকৃত রাসলীলা, কামনাকলুষিত চিত্ত জড় জগৎবাসী জীবগণের অনুসরণ যোগ্য নয়। বস্তুতঃ জীবযাত্রা অবসানে, জীবচৈতন্যের দিব্যধামের মণ্ডলে ব্রহ্মচৈতন্যের সমীপবর্ত্তী হওয়াই 'রাস' এবং জাগতিক জীবনে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অহরহ মিলনরূপ

সুখস্মৃতির আস্বাদনে অন্তরে উপজাত উল্লাসই 'রাসলীলা'। তাই ইহা বাহ্যিক অনুষ্ঠেয় নহে; পরন্তু অনুভাবনীয়। এক্ষণে আয়ুসূর্য্য মধ্যগগন পার হইয়া, অস্তাচলের পথে প্রধাবিত। রাজকার্য্যের স্বেচ্ছাঘটিত দায়দায়িত্বের শৃঙ্খল, হস্তপদ যেন শৃঙ্খলিত। তাছাড়া সংসারী জীবনে বিবিধ সমস্যারও অন্ত নাই। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক লোকশিক্ষার জন্য আচরিত, যাহা গীতার বাণীরূপে সম্যক প্রতিভাত—তাহার আন্তরিক অনুসরণে পরমেশ্বরে নিবেদিত আসক্তিহীন জীবনযাপনই, সংসার বন্ধন দশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহার সান্নিধ্যে উপনীত হইবার সর্বোত্তম উপায়।"

এইভাবে ক্রমান্বয়ে দশদিবস ব্যাপী বৈষ্ণব ধর্মের সারতত্ত্ব কথা, রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার অতি গুহ্যতত্ত্ব, পরস্পর আলোচনান্তে, মহাপ্রভু রামানন্দরায়কে অবিলম্বে রাজকার্য্যের বিষয়লিপ্ততা হইতে অবসর লইয়া, নীলাচলে বাস করিয়া তাঁহাকে পরমানন্দময় কৃষ্ণকথা শুনাইয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্ত করিবার অনুরোধ রাখিয়া, 'বিদ্যানগরে' আগমনের অভিপ্রায় সমাপনান্তে,—পরদিবস রামেশ্বর, সেতুবন্ধ, দ্বারকা, শ্রীরঙ্গম প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রের অভিমুখে রওনা হইলেন। স্থানে স্থানে বহু মায়াবাদী বৈদান্তিক প্রভৃতিকে এবং বৌদ্ধগণের শিরোমণি, মহাপণ্ডিত রামগিরিকে শাস্ত্রবিচারে পরাভূত করিয়া, বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেন। বেঙ্কটনগরের পন্নভীল নামক নরঘাতী দস্যুকে সস্নেহ দৃষ্টি প্রদানে দলসমেত কৌপীন ধারণ করাইয়া হরিনামে প্রমত্ত ও ধর্ম জীবন যাপনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

উল্লেখযোগ্য যে, মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচারে যাঁহারা সর্বাপেক্ষা অধিক সহায়তা এবং শক্তি সঞ্চার দ্বারা যশস্বী হইয়াছিলেন,—পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণব সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকাররূপে পরিগণিত রায়রামানন্দ ছিলেন, তাঁহাদের অন্যতম। "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল।" অতি প্রসিদ্ধ এই বৈষ্ণব পদাবলী তাঁহারই রচিত,— যাহা শুনিবামাত্র মহাপ্রভু ভগবৎ প্রেমাবেশে অধীর হইয়া পড়িতেন।

দুইবৎসরকাল দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের শত শত তীর্থক্ষেত্র পরিভ্রমণের পর, নীলাচল প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, মহাপ্রভুর অতি অনুরাগী বাল্যবন্ধু, বঙ্গদেশে সুমধুর পদাবলী কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক, সর্বশাস্ত্রবিৎ ও সঙ্গীত বিশারদ পুরুষোত্তম আচার্য্য, আসিয়া নিত্যসঙ্গী হইলেন, এবং তাঁহার ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত ভাবানুযায়ী, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী গান শুনাইয়া সন্তোষ বিধানে ব্যাপৃত রহিলেন। নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, মনের ক্ষোভে ভক্তিধর্মের বিরোধী সাধুগণের বিচরণ ক্ষেত্র, কাশীধাম চলিয়া গিয়া, সর্বদা শ্বেতবস্ত্র ও উত্তরীয়ধারী সন্ন্যাসব্রত পালন করায় তিনি, 'স্বরূপদামোদর'

নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

দীর্ঘক্ষণ ভাগবতীয় ভাবাবেশে আবিষ্ট অবস্থায় পাঁচ বৎসর নীলাচলে অতিবাহিত করিয়া, শ্রীবৃন্দাবন গমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নির্দেশে নিজ রাজ্যে পথযাত্রার সুবন্দোবস্ত হইলে, মহাপ্রভু মহাপবিত্রতনে বঙ্গদেশে পদার্পণ করিলেন। সীমান্তবর্তী পাঠান-রাজ ভগবৎ প্রেমে উন্মত্ত প্রিয়দর্শন তরুণ সন্ন্যাসী দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া নদীপার হইবার জন্য সুসজ্জিত ও প্রহরী রক্ষিত তরণী ব্যবস্থা করিলে, মহাপ্রভু প্রসন্নবদনে সেই নৌকায় করিয়া গমনে, গঙ্গাতীরে অবস্থিত পাণিহাটী গ্রামে পৌঁছাইয়া পথশ্রান্তি অপনোদন মানসে পরম অনুগত গৃহস্থ রাঘবপণ্ডিতের গৃহে রাত্রিবাস করিয়া,—পরদিন কুমারহট্টে তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত, প্রভূত অর্থশালী ও প্রতিবৎসর গৌর ভক্তগণের রথযাত্রার সময় নীলাচলে যাতায়াতের ব্যয় বহনকারী শিবানন্দ সেনের বাটীতে উপনীত হইবামাত্র তাঁহার সপ্তমবর্ষীয় পুত্র পরমানন্দ তৎক্ষণাৎ প্রণত হইলে মহাপ্রভু স্নেহার্দ্র হইয়া তাঁহার মস্তকে পদতল রাখিতে গেলে সে মুখ ব্যাদান করিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠ চুষিতে লাগিল। অতঃপর মহাপ্রভু তাহাকে কৃষ্ণকথা কহিতে বলিলেই, বর্ণপরিচয়হীন এই বালক উঠিয়া দাঁড়াইয়া করজোড়ে স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক প্রস্তুত করিয়া বলিলেন—'যিনি ব্রজাঙ্গনাগণের কর্ণে কর্ণোৎপল স্বরূপ সেই শ্যাম জয়যুক্ত হউক'। কর্ণভূষণের অনুপম বর্ণনায় আহ্লাদিত মহাপ্রভু নাম রাখিলেন—'কবি কর্ণপুর'। অপূর্ব উপায়ে আরও একটি লীলাসহচর আহরিত হইল।

তৎপর দিবস বাসুদেব সার্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির বাটীতে আসিয়া তথায় দর্শনার্থী সহস্র সহস্র লোকের সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য সকলের অলক্ষ্যে নিকটবর্তী কুলিয়াগ্রামে মাধবদাসের গৃহে আগমন করিলে, সমাচার প্রচারিত হইবামাত্র সেখানেও জনারণ্য জমিয়া গেল। তাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং আন্তরিক অনুরাগে প্রীত হইয়া আনন্দিত মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে হরিবোল দর্শনদানে পরিতৃপ্ত করিয়া বৃন্দাবনধাম পরিক্রমার মানসে অবিলম্বে পদযাত্রা আরম্ভ করিলে সমবেত সকল জনতা কীর্তন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চা-দ্ধাবন চলিতে লাগিল। অবশেষে বিশাল জনসঙ্ঘের সঙ্গীগণের পুরোভাগে অবিরাম নৃত্যরত মহাপ্রভু বর্তমান মালদহের সন্নিকটে গৌড়নগরে গঙ্গাতীরে 'রামকেলি' গ্রামে উপনীত হইয়া, এক সুবৃহৎ আম্রকাননে বিশ্রামের জন্য মাটিতে উপবেশন করিবার পরই পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহ হইতে দর্শনাভিলাষী আবালবৃদ্ধ বণিতার আগমনে, সেই স্থান বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হইল।

তৎকালে গৌড়ের বাদশাহ হোসেন সাহ, অসংখ্যলোক পরিবেষ্টিত

কটিমাত্র বস্ত্র পরিহিত, অলৌকিক দিব্যকান্তি সন্ন্যাসী নিমাইকে, রাজ-প্রাসাদের আলিসা হইতে লক্ষ্য করিয়া,—ইনি কোনরূপ মহা ঐন্দ্রজালিক কিনা,— তাহার তথ্য অনুসন্ধানের জন্য 'কেশবছত্রী' নামে জনৈক গুপ্তচরকে এই বলিয়া নির্দেশ দিলেন যে,—তিনি নিজ সৈন্যগণকে বেতন দিতে বিলম্ব করিলে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া পড়ে, অথচ অন্নহীন নিদ্রাহীন থাকিয়া অগণিত জনগণ কেন কিসের প্রত্যাশায় কপর্দকহীন এই ফকিরের অনুগমন করিতেছে।

পরদিবস পুনরায়, তাঁহার অতি বিশ্বস্ত, হিন্দুমন্ত্রীদ্বয়,—সাকরমল্লিক ও দবীর খাস নামে দরবারে খ্যাত, এবং পরবর্ত্তীকালে মহাপ্রভু কর্তৃক প্রদত্ত, রূপ ও সনাতন নামে ভুবন বিখ্যাত, দুই সহোদরকে, বিষয়টি প্রশাসনের নিরাপত্তার পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গোপনে, সবিশেষ পর্যবেক্ষণ করিতে বলিলে,—উভয় ভ্রাতা গভীর রাত্রিতে বৃক্ষতলে শায়িত, সন্ন্যাসী নিমাইর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে ঈশ্বরতুল্য মহাপুরুষ জ্ঞানের ভাবান্তর বশতঃ বিমোহিতভাবে, দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া যেন কোন অনুজ্ঞার অপেক্ষায় পদতলে পতিত রহিলেন।

অতি সম্রান্ত রাজঅমাত্যের এই অতিশয় দৈন্যভাব প্রকাশের আকস্মিকতায় হৃষ্টচিত্ত মহাপ্রভু তাঁহার দুইহস্ত দুইজনের শিরে স্থাপন করিয়া তাঁহার নিত্য পরিকররূপে উপরোক্ত নাম উল্লেখে বলিলেন, রূপ যেন অচিরেই রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াগ তীর্থে গমন করে এবং যথাসময়ে সনাতন উপস্থিত হয়,—বারাণসীধামে। কখন কোন্ নির্দিষ্ট স্থানে নিজেই প্রেরণা দিয়া, তাঁহাদিগকে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার অপূর্ব লীলা প্রকাশ করিবেন তাহার বিন্দুমাত্র আভাসও প্রদান না করিয়া সহর্ষে গাত্রোত্থানপূর্বক বৃন্দাবনের পথ না ধরিয়া হরিনাম করিতে করিতে, নীলাচল প্রত্যাবর্ত্তনের পথে শান্তিপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পরমাশ্চর্য্য ও অচিন্ত্যপূর্ব সমগ্র ঘটনাটির তাৎপর্য্য এইরূপ নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে যে,—অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, সর্বতোমুখী প্রতিভাশালী, অতি বিচক্ষণ ও বিশেষ বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন এই রাজমন্ত্রীদ্বয়ের অন্তরের অন্তস্তলে সকলের অজ্ঞাতে ভক্তি ও প্রেমরসের এক সুমহান অন্তঃসলিলা ফল্গু-ধারা সকলের অন্তর্নিহিত ছিল এবং যাঁহাদের দ্বারা বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার তথা বিস্মৃত কৃষ্ণতত্ত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রেমধর্মের মূলতত্ত্ব অজস্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করাইবেন, মহাপ্রভুর নিত্য পার্যদ ও লীলাসঙ্গী পূর্ব-নির্দিষ্ট সেই রূপ ও সনাতনকে যথাসময়ে সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়েই,—বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে রওনা হইয়া, অপ্রত্যাশিতভাবে অজস্র সঙ্গীগণ সহ তথায়

উপনীত হইয়াছিলেন, যেহেতু লোকারণ্য প্রকাশিত না হইলে, রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে সদাব্যস্তভাবে অবস্থানরত বাদশাহের কৌতূহলদৃষ্টি, কটিমাত্র বস্ত্র পরিহিত সন্ন্যাসীর প্রতি আকৃষ্ট হইত না, যাহাতে তিনি রূপ সনাতনকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে সত্বর উদ্যোগী হইয়া পড়েন।

শান্তিপুর পৌঁছিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আতিথ্য গ্রহণকালে মাতা শচীদেবী আসিয়া, পুত্রের অতি প্রিয় নানাবিধ শাক মোচাঘণ্ট লাফ্‌রা ব্যঞ্জন, লাউ-পায়েস প্রভৃতি স্বহস্তে রান্না করিলে পথশ্রম ক্লান্ত মহাপ্রভু অতিশয় প্রীতিপূর্বক সমস্তই আহার করিলেন। এই সময়ে, বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর নিবাসী সপ্তগ্রামের জমিদার, গোবর্দ্ধনদাসের পরম স্নেহের পুত্র ও সদ্য-বিবাহিত একমাত্র বংশধর রঘুনাথ দাস কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাস জীবন যাপনের অনুমতি প্রার্থনা করিলে,—মহাপ্রভু এই তরুণ বয়স্ক প্রতাপ-শালী ধনীর সন্তানকে বাহ্য বৈরাগ্য বশতঃ সহসা সংসারত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া, গৃহে থাকিয়াই ঈশ্বর ভাবনার অভিনিবেশে অনাসক্তভাবে সংসারধর্ম পালনের এবং আপন আচরণ দ্বারা প্রজাগণের সম্মুখে আদর্শ স্থাপনের উপদেশ দিলেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্য ও ভোগ সুখাদিতে উদাসীন ভগবানের প্রতি সতত উন্মুখচিত্ত, রঘুনাথের সংসারে মন থাকিল না, কেবলই গৃহ হইতে পলায়নের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ইহাতে কিংকর্তব্য বিমূঢ় পিতৃদেব তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত নিঃসন্তান হিরণ্য দাসকে বিষন্নচিত্তে বলিলেন,—জন্মদাতা পিতা প্রারব্ধ খণ্ডন করিতে পারে না, পুত্ররঘুনাথের সংসারধর্মত্যাগ অপরিহার্য্য।

দশদিবস শ্রী অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে মাতৃস্নেহ সুখে অতিবাহিত করিয়া নীলাচল পুনরাগমনের পর নিত্যানন্দ প্রমুখ উৎফুল্ল ভক্তগণ, মহা-প্রভুর ঐশিক অভিরুচি অনুযায়ী আপন আচরণ দ্বারা লোক শিক্ষার নিমিত্ত, পূর্ববঙ্গের পানিহাটি গ্রামে আগমন করিলে,— সংবাদ অবগত হইয়া, রঘুনাথ তাহাদিগকে দর্শনের অভিলাষে, প্রচুর উপঢৌকন সহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। মহান ধনীর সন্তান যুবক রঘুনাথ দাসের সরল ভক্তপ্রবণ চিত্ত এবং সাধুগণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার ভাব লক্ষ্য করিয়া, অতিশয় মুগ্ধ নিত্যানন্দ প্রভু,—তাঁহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। অবশেষে তাহার সনির্বন্ধ অনুরোধে, সঙ্গে আনীত দধিচিঁড়ার আপ্যায়নে অতিশয় প্রীত নিত্যানন্দ প্রভু, কৌতুক পূর্বক অতি বিরাট যোগাড়ের উদ্যোগ লক্ষ্য করিয়া এই আয়োজন দাতা ও ভোক্ত উভয় পক্ষেরই দণ্ডস্বরূপ হওয়ায়, গ্রামবাসী-গণকে ইহার স্মারক উৎসব পালনরূপ 'দণ্ড' গ্রহণ করিতে বলিলেন, এবং এই বাক্যের সম্মানার্থে প্রতিবৎসর বৈষ্ণবভক্তগণ কর্তৃক, সেইস্থানে আয়োজিত, দধি চিঁড়া ভোগের অনুষ্ঠান, "দণ্ড মহোৎসব" অর্থাৎ গৌরনিতাই প্রেমী,

মহৎলোকের উৎসব নামে, অদ্যাবধি অপতিত নিয়মে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে, যাহার উৎসাহ উদ্দীপনা তেমনিভাবে অব্যাহত রহিয়াছে।

নিত্যানন্দ প্রভুর অযাচিত আশীর্বাদধন্য, রঘুনাথের সংসারমোহ একেবারেই অন্তর্হিত হওয়ায়, গৃহত্যাগের উৎকণ্ঠিত উগ্র বাসনা, ক্রমেই অধিকতর প্রবল হইয়া, অন্তঃপুর গমনও বন্ধ হইল। বাহিরের দুর্গামণ্ডপে রাত্রিবাস করিয়া সর্বক্ষণ পাহারারত প্রহরীগণের অলক্ষ্যে সংসার হইতে সরিয়া পড়িয়া সন্ন্যাসী নিমাইর সহিত মিলিত হইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। বার বার বিফল চেষ্টায় ধরা পড়িলেও, শেষবার কুল পুরোহিতের সাহায্যে প্রাসাদ এলাকার বাহিরে আসিলে, যেন ভগবৎ ইচ্ছায়, আর ধরা পড়িলেন না। জমিদার তনয় রঘুনাথ দাস ঈশ্বর সন্ধানে সংসার জীবন পরিত্যাগ করিয়া অজানাপথ ধরিয়া পথে বাহির হইলেন।

আশৈশব পরম যত্নে পালিত, জমিদার গৃহের একমাত্র প্রিয়দর্শন সন্তান, পদতল কুসুম কোমল, কণ্টকাকীর্ণ অপরিচিত বন পথে, অনাহারে অনিদ্রায়, পশ্চাদ্ধাবিত রক্ষীগণকে এড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর সান্নিধ্যলাভের অনুভাবনায়, অবিরাম দ্রুত গমনে নীলাচল অভিমুখে ধাবিত হইলেন। পরিশেষে দীর্ঘপথ শেষে, ক্লান্তপদে, রক্তসিক্ত বেশে পথশ্রমে অস্থিচর্ম বিশিষ্ট কৃশতনু, বিক্ষতচরণ, ধনীর দুলাল রঘুনাথ পুরীধামে উপনীত হইয়া,— যেন অতীব আগ্রহভরে অপেক্ষারত মহাপ্রভুর পল্লবসদৃশ কমনীয় চরণ তলে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে হর্ষভরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,— কৃষ্ণই কৃপা করিয়া তাঁহাকে অনিত্য বিষয়কূপ হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন। পরিশেষে রঘুনাথের অহোরাত্র কঠিন কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন পূর্বক ভজনের ইতিবৃত্তান্ত বিশ্ববাসীর বিস্ময় হইয়া রহিয়াছে।

বর্ষাকাল নীলাচল বাস করিয়া শরৎ সমাগমে, অপর সকলের অলক্ষ্যে বিজয়াদশমী দিবসের প্রত্যুষকালে, লোক সংগঠন ভয়ে, রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া, নিবিড় অরণ্যময় বিপদ সঙ্কুল ঝাড়িখণ্ডের বনপথ দিয়া, মহাপ্রভু বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অবিরাম কৃষ্ণনাম করিতে করিতে, কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থল দর্শনঅভিলাষে আত্মবিস্মৃত, মহাপ্রভু অসঙ্কোচে ও নির্বিকার চিত্তে, বন্য শ্বাপদের পালে প্রবেশ করিতেছেন; ক্ষণে ক্ষণে পথ পার্শ্বে শায়িত ব্যাঘ্র, অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন; কখনও সঙ্কীর্ণ নদীজলে, অবাধে যথেচ্ছ প্রক্ষালনরত হস্তিযূথের মধ্য দিয়া চলিয়াছেন; আবার অনুসরণকারী কুরঙ্গের পৃষ্ঠদেশে স্নেহভরে হস্ত রাখিতেছেন।

অতি বিচিত্র অথচ লোকাতীত এই ভীতিপ্রদ ব্যাপার দেখিয়া, তীর্থপর্যটন আশায় নীলাচলে আগত, একমাত্র সঙ্গী পূর্ববঙ্গীয় বলভদ্র ভট্টাচার্য্য

যুগপৎ আতঙ্কে অভিভূত ও বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িলে,— মহাপ্রভু গীত ধরিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অজস্র পাখী শতি মধুর অস্পষ্ট শব্দে কলধ্বনি করিয়া উঠিল। বৃক্ষ সমূহ কুসুমিত হইয়া পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল সমগ্র অঞ্চল যেন সুশীতল হইল গগনতল নীলাঞ্জন ছায়ায় পরিবৃত হইয়া যেন লাজনম্র নীলাম্বর পরিধান করিল।

ক্রমে রজনী আসিল লোকালয় বহুদূর আশ্রয় স্থান নাই। পাথেয় সংগৃহীত কিছু বন্যফল গ্রহণের পর, বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া সঙ্গীসহ সন্ন্যাসী নিমাই সুখে নিদ্রিত হইলেন প্রভাতে অরণ্যের উষ্ণ প্রস্রবণে মহানন্দে অবগাহন করিয়া পুনরায় অবিরত পদযাত্রার পদক্ষেপ সুরু হইল সর্বদা জনশূন্য গিরি ও পথ বনে বাহিরে ময়ূরের নৃত্য বনের শোভা পশুগণের স্বাভাবিক জীবন প্রভৃতির মধ্য দিয়া এই নির্জন ভ্রমণ মহাপ্রভুর মনের আরাম বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বারবার করিতে লাগিলেন, কৃপাময় কৃষ্ণ এই বনপথ আনয়ন করাইয়া বড়ই সুখ দিলেন শেষে বিহার প্রদেশের মধ্য দিয়া পথ চলিতে চলিতে ক্রমে কাশীধাম উপনীত হইয়া, স্নানার্থে প্রসন্ন বদনে দীনপদে মণিকর্ণিক ঘাটের দিকে চলিতে লাগিলেন

প্রভাত সময় স্নান করিতে অনেক লোক স্নান তর্পণাদি করিতেছেন। কেহ কিছুক্ষণ শ্রবণকার্যে নিরত অনেকে শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠে ব্যাপৃত এমনি সময়ে সকলেরই বিস্মিত দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল — দীর্ঘ ঋজু, পরম সুন্দর গলিত সোনার মত গায়ের রং আজানুলম্বিত বাহু করুণামাখা আয়তলোচন একটি অল্প বয়স্ক যুবকের প্রতি, যিনি অবনত মস্তকে, প্রেম বিহ্বল অবস্থায় মন্দমধুর কণ্ঠে সুস্নিগ্ধ স্বরলয়ে কৃষ্ণনাম জপিতে জপিতে মৃদু গতিতে গঙ্গাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন সকলেই মুগ্ধচিত্তের হর্ষভরে সমস্বরে ভাবাবেগ বশতঃ আপনা হইতে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকের জয়ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া সমগ্রস্থান মুখরিত হইল মহাপ্রভু ক্রমে নিকটবর্তী হইলেন।

স্নানার্থীগণের মধ্যে ছিলেন তপনমিশ্র, যাঁহাকে শ্রীহট্ট ভ্রমণকালে অবিলম্বে বারাণসী গমন করিবে —যথাকালে সেখানে তাঁহার আগমন প্রত্যাশার অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করিতে নির্দেশ করিয়াছিলেন। জগতে মহাপ্রভুর বিমল হেমের ন্যায় উজ্জ্বল অদ্বিতীয় অমানুষিক দেহকান্তির তুলনা নাই। বিস্মৃত অতীতে দেখা অতুলনীয় রূপবান, চপলমতি সদ্যযুবক নিমাই পণ্ডিত, এক্ষণে নিরীক্ষমান পরিণত যুবা মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসী হইলেও, দর্শন মাত্রই চিনিতে পারিয়া, অতিবৃদ্ধ ক্ষীণদৃষ্টি তপন মিশ্র সিক্তবস্ত্রে দ্রুত গমন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ

চৈতন্য শরীরধারী মহাপ্রভুর পদতলে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া অতিশয় সম্ভ্রমভরে তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন।

বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং বহু পূর্বেই নির্দ্ধারিত তিনটি ভগবৎ আদিষ্ট কর্ম যথাক্রম নির্বাহের অভিপ্রায়ে,—১৫৯৮ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুন চৈত্র দুইমাসকাল বারাণসী ধামে অবস্থান করিয়া, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই স্থানকেও নবদ্বীপ নগরের মতই কৃষ্ণ ভক্তিপ্লাবিত ও কৃষ্ণকীর্তন মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রথমতঃ মায়াবাদীগণের সর্বপ্রধান, প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ কাশীবাসী,—নিজেরাই ঈশ্বরভাবিত, ভগবদ্ভক্তি বিহীন,—সন্ন্যাসীদের মতবাদ পরিবর্তন করিয়া তথায় ভক্তিবাদ স্থাপন; দ্বিতীয়তঃ সমগ্র বারাণসী নগরে নামসঙ্কীর্ত্তনের বিস্তার, তৃতীয়তঃ সনাতনকে উপলক্ষে রাখিয়া জগৎবাসীকে কৃষ্ণভক্তি বিষয়ক শিক্ষাদান।

প্রণিধান যোগ্য যে, তৎকালে কাশী ও নবদ্বীপ জ্ঞান চর্চার দুই বিশিষ্ট কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইত। নবদ্বীপ ন্যায় ও তন্ত্রে বিশারদগণের আবাস এবং কাশী বৈদান্তিক জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসীদিগের প্রভাব। তন্মধ্যে বেদ ও বেদান্ত দর্শনের পাণ্ডিত্যে ও অধ্যাত্মচর্চার খ্যাতিতে, প্রকাশানন্দ সরস্বতী ভারতবর্ষে অদ্বিতীয়। অবশ্যই অনুধাবনীয় যে, মাত্র আঠার বৎসর বয়সে পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ কালে, সদ্য বিবাহিত নিমাই পণ্ডিতের, যখন সন্ন্যাস গ্রহণের কোনরূপ সম্ভাবনা সূচিত হয় নাই, তখনই তথাকার বিশিষ্ট ভূম্যধিকারী ও কৃষ্ণভক্তি তত্ত্ববেত্তা, প্রৌঢ় তপনমিশ্রকে সপরিবার কাশীবাসের নির্দেশ প্রদান করিয়া তথাকার ভক্তিহীনতারূপ ঊষর ভূমিতে ভক্তি ধর্মের স্বচ্ছন্দানুবর্তিতার পটভূমিকা তৈরী করাইয়াছিলেন যাহাতে ইহার ছয়বৎসর পর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, তাহারও ছয়বৎসর পর একত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, সেই প্রস্তুত ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, অমৃতময় কৃষ্ণভক্তিপ্রদ মন্ত্রবীজ অনায়াসে বপন করিতে পারেন।

সম সাময়িক কালে বেদ অধ্যয়ন জন্য বিশেষ সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র তথা হিন্দু ধর্মের পীঠস্থান বারাণসী, সতত গবেষণারত শত শত পণ্ডিত, আত্মানুশীলনে নিমগ্ন সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী ও সদাব্যস্ত লক্ষ লক্ষ, গৃহস্থ নাগরিকে পরিপূর্ণ। এমতাবস্থায় বিনা সংবাদে বহুকাল পূর্বে কাশীতে আগত, তপন মিশ্রের সহিত যেন অলৌকিক উপায়ে অপূর্ব যোগাযোগ সাধিত হইল। অনুরূপভাবে 'রামকেলী' অবস্থানকালে, পূর্বাপর বিবেচনা না করিয়া বৎসর মাসের অনুরোধে, যেন স্বগতোক্তিতে রূপকে প্রয়াগে এবং সনাতনকে কাশীতে মিলিত হইবার নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন,—যাহা যথাকালে, যথাভাবে যথারীতি সংঘটিত হইয়াছিল।

পরদিনই মহাপ্রভু বৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হইলেন। এদিকে গৌড় নগরে রামকেলী গ্রামে সন্ন্যাসী নিমাইকে দর্শনের পর হইতেই, বিষয় ব্যাপারে বিতৃষ্ণ এবং সাংসারিক সুখভোগে মন উদাসীন, রূপ ও সনাতন, বহু আয়াসেও রাজকর্ম হইতে অব্যাহতি না পাইয়া বরং বাদশা নির্দেশে নজর বন্দী হইয়া সম্যক গোপনে পলায়নের সুবিধার্থে সনাতনের জন্য উপযুক্ত আর্থিক ব্যবস্থা রাখিয়া, গভীর নিশীথে পরিচয় গোপনের উপযুক্ত বেশে শ্রীরূপ সুকৌশলে গৃহত্যাগ করিয়া পূর্বে নির্দেশিত প্রয়াগতীর্থ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথ অতিক্রম করা কালে, মহাপ্রভু কোথায় অবস্থান করিতেছেন, তাহার কিছুই কোনমতেও জানিতে পারিলেন না। কারণ মহাপ্রভু নীলাচল হইতে বনপথে গমন করায় এবং রূপ গোস্বামী বঙ্গদেশ হইতে গঙ্গার কিনারা ধরিয়া চলায়, পথে উভয়ের সাক্ষাত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পর প্রয়াগ তীর্থে যে বিচিত্র উপায়ে রূপ গোস্বামীর সহিত মহাপ্রভুর মিলন ঘটিয়াছিল তাহাও অভাবিত।

মহাপ্রভুর প্রয়াগে আগমনের দিন কয়েক পূর্বে তথায় উপনীত হইলেও সর্বত্র, সর্বক্ষণ সহস্র সহস্র লোক সংঘটের দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং অনবরত আগত অসংখ্য দর্শনার্থীদ্বারা পরিখারূপে পরিবেষ্টিত স্থান অতিক্রম করিয়া একান্তে তাঁহার দেখা পাওয়া ছিল, নিতান্তই দুঃসাধ্য ব্যাপার। সর্বান্তর্যামীরূপে হয়ত ইহা উপলব্ধি করিয়া, প্রয়াগে আগমন ও তাঁহার সহিত মিলন প্রতীক্ষারত,— শ্রীরূপকে দর্শনদানের মানসেই, সহসা জনসমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া অতিদ্রুত গমনে, বিন্দু মাধব মন্দিরপানে ধাবিত হইলেন, হেনকালে, যেন লোকাতীত উপায়ে, স্থানীয় অধিবাসী, অতি সম্ভ্রান্ত একজন দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ, ধাবমান মহাপ্রভুর পদতলে পতিত হইয়া, তাহার গৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণের প্রার্থনা নিবেদন করিলে, ত্বরান্বিতগতি অবরুদ্ধ হইবার অবকাশে, পথিপার্শ্বে বিশ্রামরত শ্রীরূপ গোস্বামী, ছুটিয়া আসিয়া, নিজেকে দীনহীন অস্পৃশ্য সদৃশজ্ঞানে স্পর্শ এড়াইয়া, অদূরে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবামাত্র, সন্ন্যাস বিগ্রহ পরম কৃপালু মহাপ্রভু, তাঁহাকে সস্নেহে উঠাইয়া প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,— সনাতনেরও সংসার বন্ধন ক্ষয় হইয়াছে এবং তিনিও শীঘ্রই আসিয়া মিলিত হইবেন।

অতঃপর মন্দিরে উপনীত হইলে, তথায় পূর্বেই উপস্থিত,— প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী যমুনা নদীর পাড়ে, আড়াইল গ্রামনিবাসী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গোস্বামী, বল্লভ ভট্ট, মহাপ্রভুর ভুবনমোহনরূপ এবং মধুর কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীরূপসহ তাঁহাকে কিছুদিন নির্জনস্থানে অবস্থিত, তাঁহার উদ্যান বাটীতে বিশ্রাম করিবার অনুরোধ করিলে, —মহাপ্রভু সানন্দে স্বীকৃত

হইয়া পরদিন সেখানে হৃষ্ট চিত্তে গমন করিলেন এবং সেখানেই আরম্ভ হইল, শ্রীরূপকে উপলক্ষ করিয়া জগৎবাসীর উদ্দেশ্যে দশদিনব্যাপী ভক্তি শাস্ত্র উপদেশ, যাহার সম্যক সমাপ্তি হইয়াছিল প্রয়াগের দশাশ্বমেধ ঘাটে বসিয়া।

নিপুণ আচার্য্যের মত ক্রম অনুযায় ভক্তিতত্ত্ব জীবতত্ত্ব অদ্বৈত ভগবৎতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষাদানের পর প্রসন্ন সলিলা গঙ্গাযমুনা সরস্বতীর সম্মিলন স্থান, পুণ্য পবিত্রতাময় প্রয়াগ তীর্থের শ্রীবিন্দুমাধব মন্দির প্রাঙ্গনে, অশ্রুপূর্ণ নয়ন যুগলে সম্মুখে যুক্ত কর দণ্ডায়মান শ্রীরূপকে শ্রীবৃন্দাবনধামে বাস করিয়া তথাকার লুপ্ততীর্থ সমূহের উদ্ধার ও বৈষ্ণবধর্ম বিকাশের উপযোগী গ্রন্থাদি প্রণয়নের নির্দ্দেশ প্রদান পূর্বক তাঁহার যাত্রারম্ভের প্রাক্কালে, পুনরায় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উক্তি করিয়া বলিলেন,—অত্যন্ত অভীষ্ট ও হিতকর সজ্জন সাম্মিলন লাভ না হইলে সমস্ত চিন্তাকে সরাইয়া একমাত্র ভগবৎ অনুভাবনায় নিমগ্ন থাকিয়া নির্জ্জন বাসই শ্রেয়:। কারণ নির্জ্জন বাসের একাকীত্বের ব্যক্তিত্বই তৎকালীন মানসিক অবস্থার বা যথার্থ চিন্তাশীলতার পরিচয় সেই প্রার্থিত অবস্থাতেও কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া, আপনার সাধ্যানুযায়ী সংগৃহীত ফলমূল বা শাকান্ন ভোজন করিয়া, বিনা গ্লানিতে জীবন যাপন করাও ভগবৎ আরাধনারই অন্তর্গত।

কৃষক যেমন ঋতু ও ফলন অনুযায়ী যখন যেরূপ শস্য পায় আপন শ্রমলব্ধ জ্ঞানে তাহাই আনন্দে গ্রহণ করে,—সেইরূপ কালচক্রের আবর্ত্তনে মানবজীবনে যখন যেমন সুখদুঃখাদি অবস্থা উপস্থিত হয় তাহাও বিধিদত্ত আপন কৃতকর্ম্মের ফল ভাবিয়া সংযত চিত্তে স্বীকার করিয়া লইবে [illegible] যেহেতু কার্যকারণ পরম্পরায় গ্রথিত অমোঘ নিয়তির অনিবার্য পরিনাম অনতিক্রমনীয়। পক্ষান্তরে পারিবারিক পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া, গৃহত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসজীবন হয় না, সাধকের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য তাহার সর্বাত্মক ভগবৎ প্রেমের অভ্যুদয়ে দেহাতীত যে চৈতন্য সত্তা 'আমি' তাহা ইন্দ্রিয়াতীত, দৃশ্যমান মৃত্যুলীলা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা। ধূলিমলিন ও বাসনা কামনায় কলুষিত জীব জগতের অনেক উর্দ্ধে, অপরিমিত মহিমায় গীতোক্ত যে "পরম ধাম" আপন মহিমায় নিত্য বিরাজিত,—জন্ম জন্মান্তরের পথ বাহিয়া সাধুকৃপা অবলম্বনে জীব যাত্রার অবসানে, — জীবচৈতন্যের সেই জ্যোতির্ময় আনন্দলোকে উত্তরণই মানবজীবনের পরমগতি এবং সেই পরম প্রাপ্তির গতিপথে চিত্তকে অবিরত অনুবর্ত্তনে নিযুক্ত রাখাই জীব জীবনের যথার্থ প্রয়োজন ও সার্থকতা।

এই বলিয়াই মহাপ্রভু নীরব হইলেন এবং ইত্যবসরে বাতবিচলিত

বংশ পত্রের ন্যায় মহাপ্রেমের বিকম্পিত শ্রীরূপকে লক্ষ্য করিয়া, বুকে জড়াইয়া ধরিলে, উভয়েই প্রেমাবেশে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এইভাবে প্রয়াগে আসিবার পূর্বেই সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, সম্যকরূপ সমাপন করিয়া, পরবর্ত্তী কার্য্য নির্বাহের পূর্ব নির্দ্ধারিত অভিপ্রায়, কাশীধাম প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দেশ অনুযায়ী, রূপ গোস্বামী রাজধানীর সুরক্ষিত এলাকা হইতে পলায়ন করিলে, সন্দিগ্ধ বাদশাহ, সনাতনকে কারাগৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখায়, তিনি তাহার পলায়নের সুব্যবস্থার্থে শ্রীরূপ কর্তৃক গোপনস্থানে রক্ষিত প্রভূত স্বর্ণমুদ্রা প্রলোভনের বশবর্ত্তী প্রহরীর সহায়তায় রাত্রিকালে নিবিড় জঙ্গলপথে আত্মগোপন পূর্বক পথ চলিয়া প্রভাত সময়ে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীচৈতন্য চন্দ্রশেখরের গৃহপ্রাঙ্গনে, হরিনাম কীর্ত্তনরত জনসমাবেশ লক্ষ্য করিয়া, মহাপ্রভু তথায় অবস্থান করিতেছেন ভাবিয়া, গৃহদ্বারে বসিয়া রহিলেন ইত্যবসরে আপন অনুভবে বহির্দ্বারে অপেক্ষারত কোন বৈষ্ণবকে দেখিলে তাহাকে গৃহাভ্যন্তরে আহ্বান করিতে বলিলে মহাপ্রভু সকাশে আনীত দরবেশরূপী সনাতনের স্কন্ধে হস্তার্পণ পূর্বক আলিঙ্গনে আবদ্ধ রাখিয়া সমবেত ভক্তবৃন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন।

মধ্যাহ্নে সনাতনকে সঙ্গে লইয়া তপন মিশ্রের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলে—অতুল ঐশ্বর্য ও বিরাট বৈভবের মধ্যে সুখভোগে বিলাসী জীবন যাপনকারী, দিনকয়েক পূর্বেও গৌড়ের বাদশাহের প্রতাপান্বিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, দীনহীন বেশধারী সনাতনের এই নিষ্কাম বৈরাগ্য, উপস্থিত সকলেরই বিস্মিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল, অতিশয় যোগ্য পাত্রগণ্য করিয়া, মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে নিজ সন্নিধানে দুইমাস কাল কাশীতে রাখিয়া তাঁহাকে উপদেশদানের উপলক্ষ্যে বিশ্বজনের জন্য যে আত্মতত্ত্বের অপূর্ব বিশ্লেষণ ও সাধন রহস্যের অশ্রুতপূর্ব সমাধান সবিস্তার বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বিবৃত ও শান্তিমধুর কাব্যছন্দে পরিবেশিত,—সেই সত্যসন্দেশ, অমৃতলোকপথ অনুসন্ধান তৎপর ভক্তিপথ যাত্রীগণের পক্ষে তত্ত্বান্বিত পথ চলার পরম আদরের চির অবলম্বনীয়, একমাত্র সম্বল রূপে সমাদৃত

একদিবস গঙ্গা স্নানান্তে অপরাহ্ণকালে শ্রীসনাতন অতি বিনীত বচনে বলিলেন যে,— বিধর্ম্মী সংসর্গের বিষয়মত্ত অজ্ঞানান্ধকূপ হইতে কৃপার আকর্ষণে, তাহাকে উদ্ধার করিলেও, আমি কে ত্রিতাপ কেন অবিরত দগ্ধ করে এবং সাধ্য সাধনতত্ত্ব কিরূপ, তাহা কিছুই জানা না থাকায়, তাহার সবিশেষ উপদেশ প্রার্থী উত্তরে মহাপ্রভু মধুর হাস্যে বলিলেন শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁহার অপরিজ্ঞাত কিছুই না থাকিলেও পরিজ্ঞাত বিষয়ে পরিজ্ঞান পরিপুষ্ট করিবার জন্যই এই পরিতৃপ্ত পবিত্র প্রশ্ন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ধীবলযে বলিলেন,—পারাবার স্বরূপ ভগবৎভক্তি রসতত্ত্বের মহিমা বলিয়া শেষ করা যায় না, কটাহ পূর্ণ ব্যঞ্জন হইতে, কণিকা মাত্র গ্রহণ করিয়া যেরূপ আস্বাদ অনুভব করা হয়,— সেইরূপ জীবের অশেষ কল্যাণ সাধক, পরম পুরুষার্থপ্রদ, প্রেম ভক্তির বিন্দুমাত্রই চাখাইতেছি এই অনিত্য সংসারের পরিচালক এমন এক নিত্যবস্তু রহিয়াছেন—যাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইলেই জীব শান্তিলাভ করিতে পারে। তাঁহাকে দেখিতে না পাইলেও,—তাঁহারদ্বারাই সকলে চক্ষুষ্মান, জড়ীয় বাক্যদ্বারা তিনি প্রকাশ না হইলেও,—তিনিই বাক্‌শক্তির প্রকাশক, তিনি পরম করুণাময় এবং চির মঙ্গলময়,—আত্মার অমঙ্গলের আশঙ্কায় মানুষের অসঙ্গত প্রার্থনা তাই তিনি মঞ্জুর করেন না। জীবের কল্যাণের জন্যই প্রেরণা যোগাইয়া শাস্ত্র গ্রন্থাদির প্রকটন করিয়াছেন। কিন্তু বহির্ম্মুখী মানবমনের পক্ষে শাস্ত্রীয় নির্দেশ যন্ত্রবৎ অনুসরণ হয় না বলিয়াই জাগতিক জীবনে এত যন্ত্রণা। জীব লোকে সর্বজীবের জড়ীয় দেহে প্রবিষ্ট থাকিয়া চেতনা সম্পাদনকারী, সেই মহাপ্রাণের জীভূত চৈতন্যসত্ত্বার অংশই 'আমি'।

আনন্দময় শ্রীভগবানের মূল অংশের সহিত অংশী জীবের যুক্ত হইবার উপায়,—তাঁহার প্রতি অন্তরের অহেতুকী আন্তরিক অনুরক্তি, যাহার এই ভক্তিপথ উপেক্ষা করিয়া, যথেচ্ছ পথ অনুসরণ করে,—তাহাদের প্রচেষ্টা, তণ্ডুলগর্ভ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূলতুষ লাভের নিষ্ফল শ্রমে পর্যবসিত হয়। সুতরাং চিরমধুর ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে চিত্তকে নিয়ত নিমজ্জিত রাখাই, ত্রিবিধ দুঃখপূর্ণ সংসার যাতনা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া নিত্যধামে ভগবৎ সান্নিধ্যে উপনীত হইবার সুনিশ্চিত উপায় ও প্রকৃত পথ।

জীব পরমাত্মার অংশ এবং তাহা হইতেই আবিভূত। কিন্তু জীবের বিভুত্ব ও সর্বব্যাপিত্ব শাস্ত্রসম্মত নয়। কারণ জীব ও ভগবানে ব্যাপ্য-ব্যাপকতা শাস্য-শাসকতা, নিয়ম্য নিয়ন্তৃত্ব ভাব রহিয়াছে। ঈশ্বর, নিয়ামক; জীব, নিয়ম্য। জীব অসংখ্য, যত জীব, তত জীবাত্মা। জীব বিভু নয়, একও নয়, তবে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম। জীব অণু সদৃশ হইয়াও, চিৎকণ। ব্রহ্ম পরমাত্মা বা ভগবান,—চিৎসিন্ধু, জীব তাহারই কণা,—চিৎবিন্দু। চিৎ অর্থে কেবল জ্ঞান নয়, প্রেমও বুঝায়। শ্রীভগবান প্রেমসিন্ধু; জীব তাহারই স্বজাতীয় বস্তু,—প্রেমবিন্দু। আত্মার সহিত সমবেত সম্বন্ধে, জ্ঞান ও প্রেম আত্মনিষ্ঠ, জীবাত্মার নিত্যধর্ম এবং আত্মারই স্বরূপ।

জীব বা আত্মা, নিত্য, জন্মমৃত্যু বিহীন,—দেহই ভিন্ন ভিন্ন। জন্ম-জন্মান্তরীণ সংস্কারবশেই জীবেজীবে স্বভাবের স্বাতন্ত্র। আত্মজ্ঞানের অভাব বশতঃই ভগবানের কথা বিস্মৃত হইয়া, জগৎবাসী সংসার জীবনকেই সার

বলিয়া মনে করে এবং দেহাবই আত্মবোধ হয়। ইহাই সংসার বন্ধন বা অনিবার্য্য জাগতিক দুঃখ ভোগ অনবরত ভগবৎ স্মরণেই এই ভ্রান্তির অপনোদন হইয়া থাকে।

জীবের লক্ষণ নিরূপণে শ্রীগীতায় যে,—নিত্য সর্বগত স্থানু ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ করা হয়াছে—তাহা অচল পরমাত্মাকেই নির্দেশ করিয়া তদাশ্রিত জীব তাঁহাতে স্থিত বুঝিতে হইবে। কেননা উপনিষদে ভগবৎ স্বরূপ নির্ণয়ে বলা হইয়াছে—যিনি নিত্য সমূহের মধ্যে নিত্য এবং চেতনা সমূহের মধ্যে মুখ্য চেতনা, সুতরাং নিত্যও অসংখ্য জীব, সর্বগত হইলে,—শাস্য—শাসক নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, যেহেতু ঈশ্বরই জীবসমূহের একমাত্র অদ্বিতীয় নিয়ন্তা।

জীব জ্ঞানস্বরূপ হইলেও জ্ঞাতা, তাই মূর্চ্ছা বা সুষুপ্তির পর, মূর্চ্ছিত বা সুখে নিদ্রিত ছিলাম,—এই জ্ঞান অনুভূত হয়। জীবের মধ্যে যে অন্যথা-ভাব দেখা যায়,—তাহা জীবের পরিণাম নয়, ইহা ব্যক্তিবিশেষে জ্ঞানের সঙ্কুচিত বা বিকশিত লক্ষণ। ভোগ্যপদার্থ জাত বলিয়া তাহা বিনাশশীল, কিন্তু নিত্য বলিয়া ভোক্তা জীবের স্বরূপের ব্যতিক্রম হয় না, পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে কিংবা জন্মগত উপভোগ প্রভৃতি জ্ঞানের সঙ্কোচ বিকাশ ঘটে মাত্র এবং জ্ঞানস্বরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হইলেও দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, জ্ঞানের উৎস ঈশ্বরের সমীপবর্ত্তী হওয়া,—ভক্তিপথ নির্দিষ্ট সাধনা সাপেক্ষ। উপমায় 'জ্ঞান' কে বলা যায়,—বীজ, কর্ম যেন ঐ বীজকে অঙ্কুরিত করিবার প্রচেষ্টা, 'ভক্তি'কে তুলনা করা যাইতে পারে—পত্র পল্লব ফুলফলে সুশোভিত বৃক্ষের সহিত জ্ঞানের উৎকর্ষে তত্ত্বের পরিচয় লাভ হয়—যেমন জ্ঞান হইলে আম্রকে চিনি, কর্ম প্রচেষ্টা যেন আম আহরণের উপায়, ভক্তিদ্বারা তত্ত্বের আস্বাদন হয় তাৎপর্য্য এই—জ্ঞানে, পরব্রহ্ম জ্ঞাত হন মাত্র, কর্মতৎপরতায় হয় ব্রহ্মস্বরূপের অনুসন্ধান, ভক্তিদ্বারা ব্রহ্মবস্তুর সামীপ্যে উপনীত হওয়া যায়। অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্ম যেন দেবমন্দির তোরণের দুইস্তম্ভ, ভক্তি তাহার আচ্ছাদন, যাহার অভাবে মন্দিরের সিংহদ্বার বা ফটক অসম্পূর্ণ বিবেচিত হয়।

বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কত বিচিত্র বিবিধ প্রাণীর অন্ত নাই এবং ব্রহ্মের সত্তাতেই সবকিছুর ব্রহ্মময় সত্ত বলিয়া ব্রহ্ম হইতে উদ্ভব জগতে জাত জীব ও ব্রহ্মসদৃশ বুঝাইলেও, ব্যবহারিকভাবে চিৎ ও অচিৎ ভেদ রহিয়াছে। ব্রহ্ম চিৎ, প্রাণীজগৎ অচিৎ। কিন্তু প্রাণীমাত্রই জীব নহে। প্রাণ থাকিলেই প্রাণী বুঝায়,—যাহা দৈহিক যন্ত্রের ক্রিয়া. পক্ষান্তরে চেতনাবিশিষ্ট বস্তুকে জীব আখ্যা দেওয়া হয় তন্মধ্যে চিত্ত ও ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীব শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনুষ্য মধ্যেও,—স্থান, আচার, শিক্ষা, ধর্মজ্ঞান,

প্রভৃতি ভেদে বিভিন্ন জাতীয় বর্ত্তমান এই সকলের মধ্যে যে সমাজে চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা প্রচলিত, তাহা ভাল হইলেও—এখানকার ব্রাহ্মণ উত্তম; তদপেক্ষা ক্রমান্বয়ে বেদজ্ঞ,—সংশয়চ্ছেত্ত ক্রিয়াশীল সদ্বংশের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইলেও—কর্মকাণ্ডের উত্তম অধিকারীর পরই ভক্তিযোগী অধিকতর শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু শ্রীভগবানে অর্পিতসমস্ত প্রেমিকভক্তই সকলশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সমাদৃত। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধের ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে কপিল—দেবহূতি সংবাদরূপে বিধৃত শ্রীমদ্ভাগবত গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের সর্বশেষ শ্লোকেও প্রিয় সখা অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি এই যে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে দেহমন প্রাণ সমর্পিত, নিষ্কাম ভক্তই সর্বজীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। এবং উল্লেখযোগ্য যে, সিদ্ধসংকল্প ঈশ্বরের অভিপ্রায় কখনও অন্যথা হয় না।

অতঃপর ভক্তির মহিমা বর্ণনায় বলিলেন,—পরাভক্তির প্রভাবে ভগবৎ কৃপায় আবির্ভাব ঘটিয়া, দুষ্প্রাপ্য পদার্থ সুলভ হয়। বিশ্ব

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে, সুদুর্লভ ভগবদ্ভক্তি সংজ্ঞার তাৎপর্য্যার্থ এই যে একনিষ্ঠ অনন্যচিত্ত ব্যক্তির সকল ইন্দ্রিয়গণ স্বতঃ অযত্নসিদ্ধরূপে, স্বাভাবিক-ভাবে এবং কোনরূপ কামনা বিরহিত হইয়া কেবল ভগবানের অভিমুখেই ধাবিত হয়; সেই অবস্থায় অবস্থানই ভাগবতী ভক্তি,—যাহা ভগবৎ আরাধনায় সিদ্ধিলাভের উপায় সম্পর্কে, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অথচ সহজ বিশ্ব উক্তগ্রন্থের ষষ্ঠস্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে,—উন্নত শ্রেণীর লোকগণ সংস্কারবশে ধর্মাচরণ করিলেও, তাহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই মুক্তিলাভের প্রয়াসী এবং মুমুক্ষুগণের ভিতর ভক্তিপথের পথিক অতি বিরল। এইতত্ত্ব শ্রীগীতার সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমেই বিধৃত ভগবৎ বাক্যের অনুস্মৃতি। সুতরাং সাধনার ফলপ্রাপ্তি সন্ধানরহিত চিত্তে, অব্যবহিত হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন শ্রীকৃষ্ণনামকীর্ত্তনের অনুশীলন তথা তাঁহার দিব্য নরলীলার অনুক্ষণ অনুধ্যানই, অন্তরে তৎপ্রতি ভক্তি আকর্ষণের উত্তম কৌশল। কারণে মধুকর যেমন মধুপূর্ণ পুষ্পেই স্থিরভাবে অবস্থান করে, তেমনি চঞ্চল মন রসালবস্তুর সন্ধান পাইলে অবশ্যই অস্থির হয় না।

সকলশাস্ত্রের শিরোমণি, শ্রীমদ্ভাগবত রসের বিন্যাসে, ভাবের বিস্তারে, তত্ত্বের আস্বাদনে ও স্বরূপ নিরূপণে সবিস্তার কীর্ত্তিত,—সর্বজীবের অন্তর আলোড়নকারী, অনাদিকালের নিজজন শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময় লীলাকাহিনী তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবার, অন্তরতম, বার্ত্তা। পক্ষান্তরে কৃষ্ণকথা বিলসিত, ভাগবত গ্রন্থের এমনি অপূর্ব বিশেষত্ব রহিয়াছে যে, ভবব্যাধির রসায়নস্বরূপ ইহা শুনিলেই কল্যাণের উদয় হয় এবং যে শোনায় তার মত বহুদাতা আর নাই। অধিকন্তু কর্ণমনের আনন্দদায়ক হরিকথা যে শুনিতে চায়, মঙ্গল

আলোকে ভরিয়া যায়, তাঁহার মনোমন্দির। সুতরাং কৃষ্ণকথাই সর্বাপেক্ষা সারকথা, আর সকল কথা বৃথাই ব্যথাদায়ক।

ভাগবতে বর্ণিত নন্দনন্দন, অনন্য সাধারণ, নটবররূপে নরদেহধারী শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য যেন, অরূপের রূপ শাশ্বত নিত্যরূপ। তিনি বেণুধর দেব; বেণুরব রূপ মাধুর্য্যের ঐশী আকর্ষণে জগৎবাসীকে নিত্যধামের দিকে নিত্যই আহ্বান করিতেছেন। ভক্তের বিশুদ্ধ ভালবাসার বন্ধনে,—ষড়ৈশ্বর্য্যময়, সর্বগত, সর্বাতীত, অসীম হইয়াও, সর্বথা আত্মবিস্মৃত ভাবে, মাধুর্য্যবশে সীমার মাঝে আবদ্ধ হইয়াছেন। ঐশ্বর্য্য প্রকাশের লীলামাধুর্য্যে তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশিত এবং প্রিয়ত্বের বিকাশে অনির্বচনীয় মধুরিমা লীলায়িত। ভক্তের ভগবান তিনি; আশ্রিতের আশ্রয়দাতা; শরণাগতের রক্ষক। পাণ্ডবগণ তাঁহারই রক্ষণে বিপুল কৌরবকুল অনায়াস অবহেলায় অতিক্রম করিয়াছিলেন। সংসার জীবনে তাঁহাকে নির্ভর করিলে, কোন ভয় আসিতে পারে না এবং পরমধামে উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র উপায়,—তাঁহার নামের আশ্রয় গ্রহণ। কৃষ্ণনামই সেই অব্যক্ত অরূপের, মর্ত্ত্যে ব্যক্ত মূর্ত্তরূপ।

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং পরমেশ্বর, অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিধাতৃপুরুষ তিনি। একস্থান স্থিত বহ্নির আলোক যেমন সর্বত্র প্রসারিত, তেমনি তাঁহার শক্তির প্রকাশ দ্রব্য, ক্রিয়া, কারক, চেতনা আকারে প্রকাশিত। ভগবানের স্বরূপভূত, অচিন্ত্য অনন্ত বিচিত্র অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি, তটস্থা জীবশক্তি এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি,—কার্য্যকারণরূপে নিখিল জগতে ব্যাপ্ত থাকায়, তিনি সর্বকারণ কারণরূপে অভিহিত। সৎস্বরূপ হইয়াও যাহা কর্তৃক সকল সত্ত্ব ধারণ ও স্থাপন করেন,—তাহা সন্ধিনী শক্তি; স্বয়ং চিৎস্বরূপ সত্ত্বেও, যাহাদ্বারা জ্ঞানলাভ করেন ও করান,—তাহা 'সম্বিৎ শক্তি' এবং আপনি আনন্দস্বরূপ হইয়াও, যাহার অবলম্বনে আনন্দের অনুভব করেন ও করান, তাহা 'হলাদিনী শক্তি'। এই ত্রিবিধ শক্তির সমন্বয়ের স্বরূপ শক্তিতে, তিনি আনন্দলোকে বিহার করেন;—যেস্থানে গমন করিলে দুঃখময় সংসার ভূমিতে পুনরায় প্রত্যাগমন হয় না। পক্ষান্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, স্বরূপতঃ রসময়; তিনি চিন্ময় আনন্দরস বিগ্রহ, যাঁহাকে একমাত্র পরাভক্তির অব্যবহিত আন্তরিক অনুভব ব্যতীত, জাগতিক বুদ্ধিদ্বারা জানিতে পারা যায় না। তিনিই বরেণ্য। স্মরণ্য, নিধিধ্যাসীতব্য; তাঁহাকে জানিলেই জন্ম-মরণ নিবারিত হয়। অমরলাভের আর অন্যপথ নাই,—ইহা বেদবিহিত বাক্য।

সর্বশাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত ও মহাজনগণ কর্তৃক নিয়ত অনুভূত এবং জগতের ধর্মোপদেষ্টাদের প্রত্যক্ষীভূত, মহিমময় এই সদা জ্যোতির্ময় দিব্য নিকেতনে রহিয়াছে;—সতত পরিবর্ত্তিত, অপূর্ব অনাবিল প্রশান্তি ও অতীন্দ্রিয় সুগভীর

আনন্দানুভূতির নিরবচ্ছিন্ন অনুভূতি পুণ্যপাপের স্পৃহা বিরহিত, দুঃখসুখের অস্তিত্ববিহীন, আশা আকাঙ্খার অবকাশমুক্ত — সেই ভগবৎধামে উপনীত ভক্ত,— ভগবৎ সান্নিধ্যের অভিব্যক্ত সুমহান আনন্দে নিমগ্ন রহিয়াছি — এই মহাভাবের সুপ্রতিষ্ঠিত অথচ অনির্বচনীয় স্বয়ম্ভ অনুভাবের আবেশে সতত বিভোর। এই দিব্যানুভূতির বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই, সীমা নাই, পুরাতন ভাবিয়া পরিত্যক্ত নয় কালের অধিকার বহির্ভূত, পরমশ্রেষ্ঠ প্রতি-ক্ষণই নব নবায়মান, প্রেমরসসিন্ধু এই ব্রহ্মধাম — যেমন অগাধ বিস্তারও তেমনি অসীম, তরঙ্গও অনন্ত বৈচিত্রময় কর্মী সেখানে কর্মফল দাতাকে প্রত্যক্ষ করেন, জ্ঞানী দর্শন করেন, জ্ঞেয়বস্তুর, ধ্যানী সাক্ষাৎ করেন, ধ্যেয় বিষয়কে। ইষ্টে পরমাবিষ্টতারূপ রাগাত্মিক ভক্ত প্রেমানন্দরসের মূর্ত্তবিগ্রহের সদা সামীপ্য লাভ করিয়া পরমানন্দরসে নিমগ্ন থাকেন।

এইরূপ বলিবার পর, মহাপ্রভু সহসা নীরব হইলেন — যেন প্রেমভক্তির আলোকে, উদ্ভাসিত হৃদয়কন্দর ভগবৎ ভাবনার ভাবসিন্ধুতে নিমজ্জিত আয়ত নয়নযুগল দিব্য আনন্দের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। নিস্পন্দ অক্ষিতারা যেন কাহার উদ্দেশে উত্তানভাবে অবস্থিত। বাতাহত কদলীপত্রের ন্যায় শ্রীঅঙ্গ ঈষৎ বিকম্পিত। প্রগাঢ় আনন্দে উদ্ভাসিত প্রেমঘন বদনমণ্ডলের স্বর্গীয় আভা যেন অধিকতর প্রসন্নোজ্জ্বল কিয়ৎক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর, সন্ন্যাস বিগ্রহ নিমাই ধীরে ধীরে স্বস্থ হইয়া অনুদাত্ত মধুরকণ্ঠে বলিলেন — আরামের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া সুখাভিলাষী গায়ে ধূলা লাগিবার ভাবনায় সঙ্কুচিত, কিন্তু আত্মহারা আনন্দের আতিশয্যে অনেকে আবার অনায়াসে ধূলায় গড়াগড়িও দেয় ভগবৎ প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলেই, অতর্কিতে নিজের এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে,—ভাবাবেগে দেহেন্দ্রিয়াদিতে কতৃত্বভাবে অবি-লম্বেই অবলুপ্ত হইয়া, অন্তরের অন্তহীন অশ্রুপারাবার কেবলই উদ্বেলিত হইয়া উঠে। হয়ত ইহা আমার কোনরূপ রোগ বিশেষ।

এতক্ষণ স্বপ্নমুগ্ধের মত কি কথা বলা হইয়াছে, তাহার কিছুই মনে নাই, সবই বিস্মৃত। তবে, অফুরন্ত অমৃতস্বরূপ মহাপ্রেম সিন্ধুতে চিত্ত নিত্য নিমগ্ন হইলে, কিছুই বুঝিবার জানিবার, জানিবার অবশিষ্ট থাকে না, প্রয়োজনও হয় না। কারণ মহাভাবের মহানুভবই জীবন সাধনার চরম লক্ষ্য। তাই প্রার্থনা রাখি, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অমৃতলোক অনুসন্ধান তৎপর, সকলের অন্তরে এই ভাগবতীয় ভাবের সম্যক অনুভব, অঙ্কুরিত, বিকশিত ও সম্বর্দ্ধিত হউক,— বলিতে বলিতেই শিক্ষায় সুন্দর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর মহাভাবামৃত রসসিন্ধুতে আবার নিমজ্জিত হইয়া, যেন প্রেমানন্দ লীলারসের আবেশে বাহ্যজ্ঞান বিরহিত ধ্যান তন্ময়তায় নিমগ্ন রহিলেন।

প্রগাঢ় উপদেশামৃত প্রদানের পর পুনর্বার আনন্দ সমাধিতে সমাচ্ছন্ন হইলে, শ্রীমন সনাতন পদদ্বয় আপন ক্রোড়ে লইয়া ধীরে ধীরে সম্বাহন করিলে, মহাপ্রভু নেত্রদ্বয় নিমীলিত রাখিয়াই, অত্যুত্তম মৃদুল স্বরের অনুবর্ত্তনে উচ্চারণ করিলেন,—জীব ঈশ্বরের অংশ বলিয়া, জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভেদ। কারণ ঈশ্বর সৃষ্টি কর্ত্তা হইয়াও একাধারে নিমিত্ত ও উপাদান উভয়ই তিনি, সুতরাং প্রকৃতি গতভাবে জীব ও ঈশ্বর অভেদ মনে হইলেও, জীবস্বরূপে মায়া বর্ত্তমান এবং জগদীশ্বর মায়াতীতরূপে অবস্থিত। কাজেই অভেদের মধ্যেও প্রভেদ রহিয়াছে। অধিকন্তু ঈশ্বর কারণ,—জীব তাহার নির্বাহিত কার্য্য, ঈশ্বর সর্বতোভাবে পূর্ণ—কিন্তু জীব তাহার অংশবিশেষ, ঈশ্বর জ্ঞেয় বা জানিবার যোগ্য,—জীব জ্ঞাত অর্থাৎ বিদিত বা যাহা জানা হইয়া গিয়াছে, ঈশ্বর প্রাপ্য, অর্থাৎ যাঁহাকে চেষ্টার দ্বারা পাওয়া উচিত,—জীব প্রাপক বা যে অপর বস্তুকে পায়, ঈশ্বর উপাস্য বা সদা আরাধনার বিষয়,—জীব তাহার উপাসক বা সেবক, সাধক, পূজক।

এক্ষণে নেত্রদ্বয় ঈষৎ উন্মীলন করিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন,—কারণই তো কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত, বৃক্ষ হইতেই জাত শাখা, বৃক্ষেরই অংশবিশেষ, মৃৎপিণ্ড হইতে প্রস্তুত ঘট, মৃত্তিকারই রূপান্তর মাত্র।' কিন্তু যে কারণ বা যাহার যোগমাধ্যমে, অর্থাৎ যাহাকে উপাদান করিয়া, কার্য্যের উদ্ভব,—তাহা কি প্রকারে একই বিষয় হইতে পারে? কুম্ভকারের ইচ্ছাতেই মাটি হইতে ঘটাদি প্রস্তুত,—আপনা আপনি নয়। কাজেই কারণে রহিয়াছে, কার্য্যাতিরিক্ততা। বৃক্ষের বৃদ্ধিতেই শাখাপ্রশাখার উৎপত্তি, উভয়েরই একই উপাদান,—তবুও শাখাই বৃক্ষ নয়। সেইরূপ ঈশ্বর ও জীব সত্তায় অভেদ হইলেও,—ঈশ্বর নিয়ন্তা, জীব নিয়ন্ত্রিত, কাজেই পরস্পর পৃথক বিষয়। পরন্তু ঈশ্বর সদা জনগণের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত বলিয়া, অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠানক্ষেত্র অবশ্যই পৃথক হইবে,—যেমন বাসিন্দা ও বাসস্থান এক নয়।

উপনিষদে পরমাত্মা ও জীবাত্মার স্বরূপ বর্ণনায় রূপকে বিবৃত রহিয়াছে যে,—একই বৃক্ষের উপর নীচ দুইটি শাখায় দুটি পাখী বসিয়া আছে। নীচের ডালের পাখীটি অপর পক্ষীকুলের দৃষ্টি এড়াইয়া কিংবা আগন্তুক পক্ষীর সহিত সংগ্রাম করিয়া, সদা আহার্য্য ফলাদি আহরণে ব্যস্ত। উপরের পাখীটি কিন্তু নির্বিকার অবস্থায় অবস্থিত, নিজ মহিমায় আপনি নিমগ্ন,—যেন জাগতিক বিষয়ব্যাপারে উদাসীন। জীবাত্মারূপ নীচের পাখীটি অর্থাৎ দেহাশ্রিত আত্মা যদি পরমাত্মারূপ উপরের পাখীটির অর্থাৎ আত্মার আশ্রয়-দাতা পরমপুরুষের ভাবের সামিল হইতে পারে, তবেই জীব জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

তীর্থক্ষেত্রকে, অসাধারণ শক্তি এবং সর্বতোমুখী প্রতিভাবলে পুনর্বার সমগ্র ভারতের প্রধান তীর্থক্ষেত্রে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন।

একাগ্র ছিল তাহা সাধনা, অক্লান্ত অধ্যবসায়, অপরিসীম ধৈর্য্য। বার্দ্ধক্যকে সমীহ করিবার প্রয়োজনে আড়ষ্ট না থাকিয়া, সংস্কৃত ভাষায় বহুকাব্য, নাটক ও বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন—যাহা অদ্যাবধি বিদগ্ধ জনগণের বিস্ময়ের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্রীজীবগোস্বামীও বহু লুপ্তশাস্ত্র উদ্ধার এবং নানাবিধ দার্শনিক গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিয়াছিলেন।

এদিকে কাশীধামে ভক্তিহীন মায়াবাদের অত্যধিক অভ্যুদয়ে চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র প্রভৃতি অনুগত ভক্তগণ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া, প্রতিকারের কোন উপায় করিবার কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিলে,—মহাপ্রভু প্রতি উত্তর না করিয়া, ঈষৎ হাসিলেন মাত্র। পরক্ষণেই করজোড়ে উপস্থিত একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রধান, তাঁহার নব নির্মিত গৃহে পরদিবস শুভ পদার্পণে পবিত্র করিয়া, মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার অনুরোধ করিলে, মহাপ্রভু মৃদুহাস্য প্রকাশে সম্মত হইলেন। সেই সমৃদ্ধিশালী ব্রাহ্মণগৃহে,—প্রকাশানন্দ সরস্বতীসমেত বারাণসীর সমস্ত বিখ্যাত সন্ন্যাসী, বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ এবং সম্ভ্রান্ত নাগরিকবৃন্দ নিমন্ত্রিত ছিলেন। যথাসময়ে অতিমন্থর গতিতে, অবনত মুখে, মহাপ্রভু সেইখানে উপস্থিত হইবামাত্র,— দীর্ঘাকৃতি, বিদ্যুতের ন্যায় তীব্র দীপ্তিমান, তপ্তকাঞ্চনের মত কান্তি, প্রসন্ন বদন, উন্নত ললাট, কমল নয়ন, যেন হঠাৎ আবির্ভূত দেবতা সদৃশ,—অপূর্ব দর্শন মুণ্ডিত মস্তক তরুণ সন্ন্যাসীকে দর্শন করিবা মাত্রই সমবেত সন্ন্যাসীগণ আপনাদের অতি অজ্ঞাতসারে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলে,— তাঁহাদের প্রধান বলিয়াগণ্য। প্রবীণ প্রকাশানন্দ সরস্বতী, সন্ন্যাসী নিমাইকে সসম্মানে সম্বর্দ্ধনা করিয়া সভার সুবৃহৎ চন্দ্রাতপতলের সর্বমধ্য আসনে বসাইলে, চতুর্দ্দিকে যেন স্বয়ংদীপ্ত মধ্যাহ্নসূর্য্যের তেজোময় দীপ্ত শোভা পাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ কুশল জিজ্ঞাসা ও বারাণসীতে অবস্থানের প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি আলোচনার পর, সন্ন্যাসীগণের পুরোধা প্রকাশানন্দ পুরোবর্ত্তী হইয়া মহাপ্রভুকে বলিলেন যে,— সন্ন্যাসধর্মের সর্ব প্রধান কর্ত্তব্য বেদান্তভাষ্যের অনুশীলন ও স্বাধ্যায় পরিত্যাগ করিয়া, স-ধর্মের বিপরীত উচ্চসংকীর্ত্তনাদিতে মত্ত হইয়া ভাবোন্মাদের ন্যায় আপনার আচরণে আমরা অতীব মর্মাহত। তৎকালীন ভারতের অদ্বিতীয় বৈদান্তিক প্রকাশানন্দ সরস্বতীর, এইরূপ বচনে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া মহাপ্রভু মুদিত নেত্রে যেন আত্মসমাহিত ভাবে

উত্তর করিলেন.—কলিযুগে কৃষ্ণনামই মহামন্ত্র; জাতিবর্ণ নির্বিশেষে অজ্ঞবিজ্ঞ, পণ্ডিতমূর্খ সকলেই যে কোন সময় যথাতথা কৃষ্ণনাম জপ করিলেই, বহির্মুখীচিত্ত অন্তর্মুখী হইয়া ভগবানের সহিত যোগযুক্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করে; নিরবচ্ছিন্ন নামজপেই ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হয়।

যে কেহ যে কোন অবস্থায়, মধুর অপেক্ষাও অতি সুমধুর, সকল নিগম, অর্থাৎ বেদাদিশাস্ত্র সম্মত, মঙ্গলকর চিন্ময় কৃষ্ণনাম, হেলায় অথবা শ্রদ্ধায় যদি অবিরত উচ্চারণ করে, তবে সেই নামই তাহাকে ভবসমুদ্র ত্বরিতে তরাইতে তৎপর হয়। অধিকন্তু ভগবানে সমর্পিত চিত্ত ভক্তের বেদান্তদর্শনে প্রতিপাদিত, কঠিন কঠোর যোগপদ্ধতি অনুসরণের কোন প্রয়োজন হয় না। কারণ যে কৃতি ব্যক্তিগণ কৃষ্ণকথামৃত সাগরে অনায়াসে বিহার করেন, তাঁহারা কৃচ্ছ্রসাধন লভ্য, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ রূপ চতুর্বর্গ পুরুষার্থকে তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞান করেন। নৃত্যগীত লোকরঞ্জনের জন্য ইচ্ছাকৃত অনুষ্ঠিত হইলে, তাহা পরিহাসের বিষয় হয়, সুতরাং সেই ক্ষেত্রে উপেক্ষণীয়। কিন্তু নামের অপরিহার্য্য শক্তিতে, ভগবৎ ভাবাবেগের প্রেমোদয়ে নৃত্য কীর্ত্তন অশ্রুবর্ষণ প্রভৃতি যখন আপনা হইতে আসিয়া যায়, তাহা নিবারণ করিবার অবকাশ হয় না।

বেদান্তভাষ্য অনুসরণ না করিবার উদ্দেশ্য — বেদবেদান্ত ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা বিহীন ঈশ্বরের বচন সংগ্রহ, সূত্রকারে সংক্ষিপ্ত বাক্যে, আপনি ভাস্কর সেই বেদবাক্যের ভাষ্যরূপ ব্যাখ্যা, প্রায়শঃ নিজমত স্থাপনের প্রয়াসেই মনঃকল্পিত। তৎসময়ে উম্মার্গগামী বামাচারী কাপালিকগণের তান্ত্রিক প্রভাব, অতিক্রম করিবার জন্যই, ঐশী অভিপ্রায়ে বৌদ্ধধর্মের প্রকাশ। পরিশেষে বেদবহির্ভূত বৌদ্ধধর্মের অপ্রতিহত গতিতে লুপ্তপ্রায় বৈদিকধর্মকে পুনরুদ্ধার জন্য সাক্ষাৎ শঙ্কর, শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব। এবং তৎবর্ত্তৃক বেদান্তের অদ্বৈতভাষ্য, যাহা পরবর্ত্তীকালে শ্রীমৎ রামানুযাচার্য্যের বিশিষ্টা দ্বৈতবাদের সূর্য্যালোকে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল, সেই অনাদৃত ভাষ্য এক্ষণে আর অনুশীলন আবশ্যক নাই।

ভগবান ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। ভক্তিদ্বারা তাহার সমীপবর্ত্তী হওয়া যায়। ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তিরূপ ভক্তিই, জীবের পরম পুরুষার্থ্য,—যাহা বেদবেদান্ত সর্বশাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত। সুতরাং বিষ্ণুভক্তিরূপ বৈষ্ণবধর্ম, বেদসম্মত। যাবতীয় অবতার কোন একটি বিশেষ ঐশ্বর্য্যের প্রকাশিত রূপ; শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত ভাগবতীয় ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ প্রকাশ। তাই তিনি স্বয়ং ভগবান এবং নরবপুই তাঁহার স্বরূপ। সেই ভক্তবৎসল ভগবানকে ভক্তি করা কেবল বেদের উপদেশ নয়, তাহা যুগপ্রবর্ত্তক মহাজনগণের

আপনাপন উপলব্ধির অভিজ্ঞতায় লব্ধ, যুক্তি পূর্ণ সিদ্ধান্ত। এবং শঙ্করাচার্য্য বিরচিত ভগবৎ ভক্তি প্রকাশক মালা প্রভৃতির মাধ্যমে অনুমোদিত। কাজেই বেদান্তদর্শনের শঙ্করভাষ্য তৎকালীন বৌদ্ধধর্মের প্রভাবকে পরাভব করিয়া, ধীরে ধীরে ভক্তিধর্ম প্রসারের উপযুক্ত ক্ষেত্রপ্রস্তুতের প্রয়াস মাত্র।

সর্বোপরি সকল ধর্মাবলম্বীগণের আদরণীয় স্বয়ং শ্রীভগবানের মুখপদ্ম হইতে নিঃসৃত, তাঁহারাই বাঙময়ী মূর্ত্তি শ্রীমদ্ভবতগীতা,—কেবলমাত্র অনন্যা ভক্তিদ্বারাই অভীষ্ট আরাধ্যকে জানিবার, প্রত্যক্ষ করিবার, এবং তাঁহার সান্নিধ্যে উপনীত হইবার একমাত্র উপায় বলিয়া, নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—যাহা উপেক্ষা করিলে বেদউপনিষদ অমান্য করা হয়। পরন্তু শ্রীগীতার শঙ্কর ভাষ্য পরমাত্মাকে পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া জীবাত্মাকে তদাশ্রিত বলা হইয়াছে। আশ্রিতবস্তু, আশ্রয়দাতাকে ভক্তি করিবে,—ইহাই বিধেয়।

মানুষ দেহমাত্র নহে। দেহাশ্রিত আত্মা বা জীবাত্মাই যথার্থ সত্তা। আত্মা দেহ হইতে পৃথক বস্তু। দেহেরই মৃত্যু হয়। দেহধারী আত্মা জন্মমৃত্যুর অধীন নয়। জন্মজন্মান্তরীণ কর্মসংস্কারের বশেই, জীবাত্মা কর্মভোগের জন্য জীবদেহ পরিগ্রহণ করিয়া থাকে। বস্ত্র ব্যবহারের অযোগ্য বোধ হইলে তাহা পরিত্যক্ত হইয়া, যেমন উপযুক্ত পরিধেয় গ্রহণ করা হয়, তেমনি ইহজীবনে ভোগ্যকর্মের অবসানে, কৃত কর্মের সংস্কার আহিত জীবাত্মা, ভিন্নদেহ ধারণ করে। দেহের বাল্য, যৌবন ও জরার মত,—মৃত্যুও দেহের একটি অনিবার্য্য অবস্থা মাত্র। কাজেই জীবন অমূলক নয়।

দেহ ধারণ করিলেই দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাই পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া নিত্যধামে উত্তীর্ণ হইবার উপায় নির্দ্দেশই গীতার প্রধান শিক্ষা,—যাহা ভগবৎ বাক্যরূপে সমাদৃত।

বেদের অনুসরণে শ্রীগীতাতেই উল্লেখ রহিয়াছে,—রুচির বৈচিত্র হেতু ঋজু কুটিল যে কোন পথই, ধর্মাপপাসু অনুসরণ করিয়া চলুক না কেন, সকলেরই অভিলষিত গন্তব্যস্থান ভগবৎ প্রাপ্তি। এই পথ পরিক্রমার উপায়স্বরূপ,—ভগবানের অসংখ্য নামের, যেকোন একটি। নিষ্ঠাপূর্বক ধ্যান, চিন্তন বা জপ করিলে, সেই ধ্যানের বিষয়ীভূত দেবতা অভিমুখে সতত ধাবিত চিত্ত, অন্তকালে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়। উপনিষদের নিগূঢ় নির্য্যাস, নিত্য ও অপৌরুষেয় গীতার এই বাণী,—বেদের সর্বোত্তম ভাষ্য বলিয়া স্বীকৃত এবং শ্রীগীতার মতে ভগবানের সমীপে উপনীত হওয়াই জীব জীবনের পরম প্রাপ্তি,—জীবের সত্তাকে বিলীন করা নয়।

বেদান্তদর্শনে আভাসিত, কঠিন কঠোর যোগমার্গীয় সাধনপথ অনুসরণ ব্যতীত, একমাত্র কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র অবলম্বনেই, সর্বেশ্বর ভগবানের সহিত যুক্ত

হইবার যোগ্যতা লাভে, দুঃখময় সংসারগতি হইতে মুক্তিলাভ, তথা দিব্য-লোকের অমৃতধামে গতিপ্রাপ্ত হওয়া যায়—অদ্ভুত প্রতিভা, গভীরশাস্ত্রজ্ঞান ও অপূর্বপাণ্ডিত্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত সহিত,—বেদবেদান্ত শাস্ত্রাদির এইরূপ ভগবদ্ভক্তি অনুকূল তৎপর্য্য স্থাপন পূর্বক, সমবেত সন্ন্যাসীগণের মায়াবাদের অনাদিমোহ নিদূরিত ও মনপ্রাণ ভগবৎ প্রেমরসে অনুপ্রাণিত করিবার প্রয়াসে, কাশীবাসী সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর চিত্তক্ষেত্র, ভক্তিলতাবীজ বপনের উপযুক্তরূপে, কর্ষিত করিয়া, মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বাসায় চলিয়া আসিলেন।

এই ঘটনার দিবস দুইপরে, বারাণসী পরিত্যাগের প্রাক্কালে, একদিন প্রভাতকালে মহাপ্রভু সহসা মাধবমন্দির অঙ্গনে আসিয়া, নৃত্য ও কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে—চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত, সহস্র সহস্র মুগ্ধপ্রাণ নরনারীর সম্মিলিত হরিধ্বনিতে আকাশ বাতাস অনবরত প্রতিধ্বনিত হইতেলাগিল। মন্দিরের সন্নিকটবর্ত্তী নিজ আশ্রম হইতে, চিত্তআকর্ষণকারী মধুর কীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণ করিয়া এবং সমবেত ধন্যপ্রাণ জনগণের মধ্যস্থলে, স্বর্ণ সদৃশ বাহুদ্বয় উর্দ্ধে উত্তোলিত, তেজোমণ্ডিত স্বর্ণনির্মিত পুত্তলীর ন্যায় পরিলক্ষিত শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নৃত্যপর দৃশ্য লক্ষ্য করিয়া, পরমজ্ঞানী, সন্ন্যাসীর শিরোমণি,—প্রকাশানন্দ সত্বর মন্দিরাভিমুখে ধাবিত হইয়া, দুইবাহু তুলিয়া সকলের সমক্ষেই কীর্ত্তনে যোগদান পূর্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বেই অন্তর দ্রবীভূত হইয়া অশ্রু বিগলিত নয়নযুগল হইতে অবারিত বারিধারা বহিতে লাগিল,—যাহা কোন মতেই নিবারণ করিতে না পারিয়া কীর্ত্তনরত সহস্রাধিক লোকের সমক্ষেই—বিজ্ঞোত্তম, জগৎমান্য, গম্ভীরপ্রকৃতি কৌপীণ-ধারী 'প্রকাশানন্দ' সন্ন্যাসীপ্রবর, অন্তরে উথলিত অলৌকিক আনন্দেরভারে বাহ্যজ্ঞান বিরহিত অবস্থায়, রোদন করিতে করিতে,—মহাপ্রভুর দুইটি পদ ধরিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া, ইষ্টলাভের উপায় প্রার্থনা করিলে,—হতচকিত সন্ন্যাসী নিমাই, তৎক্ষণাৎ প্রতি প্রণাম করিলেন।

অত্যন্ত অভিমানী প্রকাশান[illegible] অশ্রুসিক্ত হৃদয় অভিমানশূন্য হইয়া তথায় ভক্তিলতা বীজ অঙ্কুরিত [illegible]ছে, প্রত্যক্ষ করিয়া এবং বহু লোক সমাবেশ স্থান [illegible] সাধনতত্ত্ব বলি[illegible] উপযুক্ত নয় ভাবিয়া, মহাপ্রভু বাসায় ফিরিয়া গেলেন। অপরাহ্নে সঙ্গীহীন প্রকাশানন্দ সেখানে আসিলে, প্রেম [illegible]ত মহাপ্রভু সহাস্য সাদর সম্বর্দ্ধনায় বলিলেন,—অসীমের অধিপতিকে

সসীম জীব জীবনে সর্বদা সংরক্ষণ করিতে, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন প্রয়োজন। কর্মকৃতফল ভোগ করিতেই হইবে ভাবিয়া, সুখদুঃখ উৎপত্তির কেন্দ্র ইন্দ্রিয়াদিকে ক্রিয়াহীন রাখিয়া, শরীরযাত্রা নির্বাহেব উপযোগী, যদৃচ্ছালাভের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট, জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ চিত্তে কর্মকরিয়া, যাহারা ইন্দ্রিয় ও বাসনা উদ্ভূত সুখদুঃখ হইতেও অব্যাহতি ইচ্ছা করেন,— তাঁহারা 'শান্তরস' আশ্রিত পরমপথের পথিক। শ্রীভগবান মহ ঐশ্বর্য্যময়,— এই জ্ঞানের সহভাবে ভক্তিপূর্ণ আরাধন — 'দাস্য' ভক্তিরসের

অপর তিনটি ভজনরস, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর,—প্রেমভক্তির অন্তর্গত। অর্জুন কিংবা গোপ বালকগণের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখ্যভাব, যশোদা কিংবা শচীমাতার বৎসলতা, গোপাঙ্গনা কিংবা বিষ্ণুপ্রিয়ার আন্তরিক প্রীতির মধুরিমার, অনুসরণই,— এই সমুদয় নিগূঢ়, অথচ অতি উপাদেয় ব্রজলীলা মাধুরীর ভক্তিরস, অন্তরে সঞ্চারিত করিবার সহায়ক। পরবর্ত্তীকালে, ভাগবতীয় ভাবের রস বিচার, প্রবোধা নন্দনামধারী,—প্রকাশানন্দ সরস্বতী, জীবের মঙ্গলের জন্য, অতি জীবন্তভাবে, নিজকৃত "চৈতন্যচন্দ্রামৃত' গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা অদ্যাপিও বিদগ্ধজনের পরম আদরণীয়।

অতঃপর মহাপ্রভুর সবিশেষ নির্দ্দেশের অনুসরণে,—সূক্ষ্মদর্শী, মহাযোগী প্রকাশানন্দ, শ্রীকৃষ্ণের মধুর বাল্যলীলা প্রকাশস্থল,—শ্রীবৃন্দাবনধামে, "ক্ষেত্র সন্ন্যাস" গ্রহণ পূর্বক অবস্থান করিয়া, অবশিষ্ট জীবনকাল অতিবাহিত করিবার মানসে, চিরতরে বারাণসী পরিত্যাগ করিবার সংবাদ বিস্তৃত হইলে, বিস্মিত ও বিমুগ্ধ নানাস্থানের সন্ন্যাসীগণ, সন্ন্যাসী নিমাইকে, স্বয়ং নারায়ণের মূর্ত্ত প্রকাশ জ্ঞান করিয়া, দর্শনে নিজেদের কৃতার্থমন্য করিতে, তাঁহার বাসস্থানে ক্রমাগতই আসিতে লাগিলেন।

অনিবার্য্য সংসার দুঃখের জ্বালা জুড়াইবার জন্য কেবল সমীপে উপবেশনের উদ্দেশ্যে অসংখ্য নরনারীরও অনবরত আগমনের বিরাম ছিলনা। তদুপরি আপনাপন সমস্যা নিবেদন করিয়া, তাহার প্রতীকারের উপায় প্রার্থনা করিবার সুযোগ সন্ধানে সর্বক্ষণ অপেক্ষারত নানা শ্রেণীর জনগণের ভিড়ে প্রবেশ পথ সতত পরিবেষ্টিত। সহসা আসিয়া কাহারও পক্ষেই মহাপ্রভুর একান্ত সান্নিধ্যে যাইবার উপায় নাই। সকলকেই দর্শনদান ও যথোচিত উপদেশ প্রদানের এইরূপ সদা ব্যস্ত অবস্থায়,—রাজ্যচ্যুত ও জাতিভ্রষ্ট, একদা গোবিন্দের অশিক্ষিত সুবুদ্ধিরায়,— যেন নিতান্তই দৈবযোগে, মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ প্রত্যক্ষে পরিয়াসন সময়কালে, শরীর মধ্যে সেবাৎ

সাক্ষাৎ পাইয়া, তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন

রাজত্ব থাকাকালীন সময়ে. তাঁহার আজ্ঞায় একটি দীঘি খনন করাইবার আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া, হুসেন খাঁ নামে একজন পাঠান কর্মচারী, কার্য্যনির্বাহ না করিয়া প্রদত্ত সম্যক অর্থ আত্মসাৎ করায়,—তিনি তাহাকে বেত্রদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে স্বধর্মী লোকগণের সহায়তার ষড়যন্ত্রে সুবুদ্ধি রায়কে বিতাড়িত করিয়া,— হোসেন খাঁ নিজে শাসনভার গ্রহণ করে এবং এককালে অন্নদাতাকে প্রাণে না মারিয়া, প্রতিহিংসাবশে, শৌচের জন্য রক্ষিত বদনার জল, বলপূর্বক সুবুদ্ধিরায়ের মুখব্যাদান করিয়া ঢালিয়া দেওয়ায়, তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার অনুশাসনে, তিনি জাতিচ্যুত এবং হিন্দু সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত বলিয়া গণ্য হইয়া পড়েন।

বিভ্রান্ত সুবুদ্ধিরায় গৌড়ীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট প্রতিবিধান প্রার্থী হইলে,— তাহারা পরবর্তী জন্মে সদাচার সম্পন্ন হিন্দুগৃহে জন্ম লাভের কামনা করিয়া,— তাঁহাকে তপ্তঘৃত পানে জীবন বিসর্জনের বিধান দেয়। অতি নিষ্ঠুর এই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থায় বিভ্রান্ত হইয়া শাস্ত্র সম্মত অপর কোন বিকল্প নিয়মের প্রত্যাশায়, তিনি কাশীর পণ্ডিতবর্গের নিকট গমন করেন। অনিচ্ছাকৃত ভাবে বিধর্মী স্পর্শিত জল গিলিয়া জাতি খোয়ানর জন্যে,—তাহারা বিশেষ বিবেচনাপূর্বক পরিমিত তপ্তঘৃত পান করিয়া জঠর শুদ্ধি এবং পাপ ক্ষালনের নিমিত্ত স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণাসহ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজনের পাঁতি দিলে,— সেই সময়ে সাধ্যাতীত এই নির্দ্দেশে কিংকর্তব্য বিমূঢ় সুবুদ্ধিরায়, অন্ততঃপক্ষে পাপ দূরীকরণের কোন সহজ উপায় প্রার্থনায় পূর্ববৃত্তান্ত সম্যক ব্যক্ত করিয়া, মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইলেন। প্রখ্যাত পণ্ডিত শ্রেণীর এইরূপ পরিহসনীয় ও বিচিত্র পাঁতিতে বেদনার্ত্ত ও লজ্জিত মহাপ্রভু, তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবন বাস করিয়া অহরহ কৃষ্ণনাম জপ করিবার উপদেশ দিয়া বলিলেন,—কৃষ্ণনাম অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলেই সকল পাপের অপনোদন হয়, যেমন সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকার নিমিষে নাশ হইয়া যায়, যদিও বদ্ধ গুহায় বাসকারী সেই সূর্যালোকের আভাস হইতে বঞ্চিত থাকে। অধিকন্তু নামের মহিমাগুণে, অন্তঃকালে ঈশ্বর স্মরণ হইয়া, পরবর্ত্তী গতি লাভ হয়,— দিব্যধামের পথে। লোকাচারের নির্মম নিষ্ঠুরতায়, কোন কসুরেরই নিরসন হয় না, বরং দণ্ড বিধায়ককেই মহাপাপে নিমজ্জিত করে; কারণ ভগবানে ভক্তিলাভই জীব জীবনের কাম্য এবং জীবনান্তোর ভগবৎ স্মরণই সর্বপাপের মহা প্রায়শ্চিত্ত। অস্পৃশ্যতা শাস্ত্র সম্মত নয়, ইহা

ব্যক্তিগত শুচিতা ও পার্থক্য রক্ষার চাতুর্য্য মাত্র।

শরণাগত সুবুদ্ধি রায়কে উপলক্ষ করিয়া, পরমকৃপালু মহাপ্রভু আপাত পাতিত্য দোষ হইতে পরিত্রাণ, তথা লোকাচার বিরুদ্ধ কর্ম হইতে উদ্ধার লাভের উপায়, চিরদিনের জন্য জগৎবাসীকে শিক্ষা দিলেন ক্রমশঃ দর্শনার্থী এমন অত্যধিক বাড়িতে লাগিল যে, বাসগৃহের সঙ্কীর্ণ অঙ্গনে, এই সংখ্যাতীত জনতার জমায়েত হওয়া অসম্ভব হইয়া পথি পার্শ্বস্থিত লোকদের প্রাঙ্গণেও জনারণ্য জমিয়া কর্মব্যস্ত পথিকগণের পথচলা কঠিন হইয়া পড়িল। এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া এবং অভীপ্সিত কার্য্য সমাধা হওয়ায় আর অধিককাল তথায় অবস্থান করা অপ্রয়োজন বিবেচনায়, বিচিত্র চরিত্র মহাপ্রভু একদিন অকস্মাৎ রাত্রিকালে, সকলের অলক্ষ্যে কাশীধাম হইতে পূর্ব ন্যায় বনপথে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

জীবমাত্রকেই সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখা, অনবরত ইষ্টদেবতার নাম জপে অভিনিবিষ্ট থাকা, ভগবৎ ভক্তগণের যথাসাধ্য আনুকূল্য বিধান করা,— এই ত্রিবিধ সাধনপন্থা এবং সাধুসঙ্গ, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত অনুশীলন, তীর্থ পরিক্রমা, আরাধ্য দেবতার অর্চনা,— এই পঞ্চবিধ সাধনাঙ্গের নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া, চৈতন্যদেব সর্বধর্মের সমন্বয়ে, ভক্তিভাবনা ও ধর্মসাধনাকে যেন গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সকলের সমান কর্ত্তব্যের অন্তর্গত এবং সর্ব শ্রেণীর জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য উপায়ে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পরিকল্পনাদ্বারা, ধর্মীয় জগতে এক মহান ঐক্যের সন্ধান দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ যে সকল পণ্ডিতবর্গ ইহার প্রচারকার্যে সহায়ক এবং ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহারা সকলেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের রচিত সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থাদিতে প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া, বহু সাধক সাধনায় সিদ্ধি ও দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। ইদানীং কালের ধর্ম বিমুখিনতার প্রাবল্যের মধ্যেও অতি উচ্চশিক্ষিত কৃতবিদ্য মনিষী ব্যক্তিগণ, অসীম ধৈর্য্যে ও অক্লান্ত গবেষণায় ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া চলিয়াছেন।

মানবজীবনে দুঃখের অবধি নাই। সংসারে যাতনা আছে; ব্যথাও অনেক। অশান্তির অনল হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই। এই নিয়ত দহন জ্বালায় জড়িত বহির্মুখী চিত্তকে পরম ঈশ্বরে নিত্য নিযুক্ত রাখিয়া শুভ চিন্তা, মাঙ্গলিক প্রত্যয়, কল্যাণ বোধকে সদা জাগ্রত রাখিবার উপায় স্বরূপ, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত বৈদিক আর্য্যধর্ম ও বেদবিরুদ্ধ

লোকায়ত ধর্মের অভূতপূর্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবাত্মক প্রেমধর্মের অভিনব অবদান, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করিয়া ভাষার ক্ষেত্রেও মৌলিকতার সঞ্চার এবং সমাজচেতনায় অভূতপূর্ব নবজাগরণ ঘটাইয়াছিল।

তৎকালে সঙ্গীতে সুমধুর ও মর্মস্পর্শী পদাবলী গানের মাধুর্য্যে বঙ্গদেশ অদ্যাবধি প্লাবিত। ভক্তি প্রেমের এই শক্তির আস্বাদনে এবং বস্তু বাঙ্গালী জাতি নবীন পুলকে দেশে দেশে [illegible] এই অপূর্ব জীবনবেদ সার্থকভাবে এখনও প্রচারে প্রবৃত্ত। ভাগবতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ ভক্তবৃন্দ কর্তৃক, বৈষ্ণবধর্মের অবাধ শক্তি সঞ্চারিত, জীবের পরম আশ্রয় মহামন্ত্র হরিনাম সঙ্কীর্তনের বিজয় দুন্দুভি নিনাদ অতি আধুনিক কালের বহির্মুখ কোলাহল মুখরিত জগতের অন্তরলোকে গভীর আশ্বাসের উৎসাহে আন্দোলিত করিয়া তুলিতেছে [illegible] এবং একটি অনবচ্ছিন্ন অনুভূতির অন্তর্ব্যাপ্ত সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা দিতেছে। একদিন অকস্মাৎ ভাববিহ্বল অবস্থায় [illegible] নিমাই বলিয়াছিলেন —পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচারিত হইবে এই মহানাম, সেই ভবিষ্যৎবাণী, তাঁহার আবির্ভাবের পাঁচশত বৎসর পরেও প্রোজ্জ্বল হইয়া সর্বতোভাবে সার্থক্যলাভ করিয়া চলিয়াছে।

চব্বিশ বৎসর বয়সে ১৫১০ খৃষ্টাব্দে নিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দীক্ষাগুরু প্রদত্ত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে নীলাচলে [illegible] ১৫১০-১৫১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছয় বৎসর কাল [illegible] আহরণ এবং প্রেমধর্ম প্রচার অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষের সর্বতীর্থক্ষেত্র বিশেষভাবে দাক্ষিণাত্য, গৌড়দেশ, বারাণসী, বৃন্দাবন অঞ্চল পরিভ্রমণে কাটাইয়া ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অবশিষ্ট আঠার বৎসর নীলাচল ক্ষেত্রের পুরীধামে অবস্থান করিয়া, নিরন্তর ভগবৎ নামজপ সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার এমন অবস্থা হইত যে, উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্তন করিতে করিতে অনবরত প্রেমাশ্রু বিগলিত হইয়া বাহ্যজ্ঞান পর্য্যন্ত লোপ পাইত।

পরবর্তীকালে যে সকল অনন্য সাধারণ মহাপুরুষ ও বৈষ্ণব সাধক মহাপ্রভু প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের গৌরববর্দ্ধন এবং সমগ্র ভারতে তাহা প্রচারের প্রধান সহায়ক হইয়াছিলেন তাঁহারা নীলাচলে আসিয়াই মিলিত হইতেন। তাঁহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া, মহাপ্রভু বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—কৃষ্ণ ভজনে জাতিকুল বিচার করিতে নাই, কুলশীল উচ্চবংশে জন্মলাভ করিয়াও, যদি কেহ হরিভক্তি পরায়ণ বিবেচিত না

হয়, তবে সেই ব্যক্তিকে বর্ণশ্রেষ্ঠ বলা যায় না; অধিকন্তু সর্বশাস্ত্রবেত্তা হইয়াও, যদি তাহাদের কেহ আত্মাভিমানী গণ্য হয়, তবে তাহার প্রতিও ভগবানের প্রসন্ন কৃপা বর্ষিত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ অভিমত এই শ্রীহরির নাম সংকীর্ত্তনই মহা স্বস্ত্যয়ন, ইহা শুনিলেই মঙ্গল হয় এবং যে শোনায় তাঁহার মত বহুদাতা আর নাই। শ্রীকৃষ্ণের নাম অবিরত উচ্চারণ, ছন্দবদ্ধ পদে তাঁহার লীলামাধুরী উচ্চস্বরে ভাষণই কীর্ত্তন, যাহার আন্তরিক অনুশীলনে অন্তরে মাধুর্য্যময়ী কৃষ্ণ প্রেমরস ধারার প্রস্রবণ সূচিত হয়, ফলতঃ এক অভিনব ভাব দর্শনের অপূর্ব সুষমায় প্রাণমন সদা সাত্ত্বিক গুণে পরিব্যাপ্ত থাকয়, জন্ম জন্মান্তরের মলিন সংস্কার অপসারিত হইয়া যায়, অন্তর অভিভূত হয় ভগবৎ ভাবনায়। অধিকন্তু যেখানে শ্রদ্ধাসহকারে হরিনাম কীর্ত্তিত হয়, শ্রীহরি সঙ্কীর্ত্তন অপার্থিব বিধায় শ্রীহরি সেখানে স্বয়ং অধিষ্ঠিত হন এবং সেই স্থানও পবিত্র হইয়া যায়। পবিত্রতাই সাধনার সামগ্রী এবং ঈশ্বর সামীপ্য লাভের সহায়। চির পবিত্র হরিনাম অবিরাম জপ করাই আপনাকে পবিত্রীকরণ এবং পবিত্রীকৃত অন্তরই অন্তর দেবতার বিশ্রামের আসন। সুতরাং হরিনামই সর্বসময়ের শ্রেষ্ঠ উপাসনা, শ্রীহরির সমীপে উপাবেশন।

আধ্যাত্মিকতা বা অন্তর শুদ্ধির অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে, মহাপ্রভু উপদেশ রাখিয়াছেন যে,— সর্বদা ভয়যুক্ত শ্রীকৃষ্ণনাম অবিরোধে জপ বা কীর্ত্তন প্রভাবেই দুর্বাসনাজনিত বহির্মুখীনতারূপ মনের মালিন্য মার্জ্জিত হইয়া চিত্তে শুদ্ধাবস্থা আসে, দাবানল সদৃশ দুঃসহ ত্রিতাপ জ্বালায় নিরবচ্ছিন্ন সন্তপ্ত জীবনের দুঃখরাশি প্রশমিত হইয়া, অন্তর ভগবদ্ভক্তিরূপ চিন্ময় জ্যোৎস্নার আলোকে, আপ্লুত হয়, হৃদয়ে ভাগবতীবিদ্যার আবির্ভাব ঘটিয়া মনপ্রাণ অলৌকিক আনন্দভরে উদ্বেল হইয়া উঠে, প্রতিক্ষণই ভগবৎ উপলব্ধিরূপ অমৃতের আস্বাদন লাভে, সর্বেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইয়া, পরমানন্দময় অম্বুধিতে অবগাহন হয়, জীবাত্মার।

মহাপ্রভু ইহাও সবিস্তার ব্যক্ত করিয়াছেন যে, স্থানকাল ও রুচির পার্থক্যবশতঃ নানা ধর্মমতে প্রচলিত ভগবানের বহুবিধ নাম মাত্রেই ভগবৎ শক্তি অর্পিত রহিয়াছে এবং সেই নাম গ্রহণ সম্পর্কে, শুচি অশুচি জনিত মনোগত অবস্থায়, খাওয়া শোওয়া, পথচলা প্রভৃতি শারীরিক অবস্থায়, দিবা রাত্রি, ঝড়বৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক অবস্থায়, কোনরূপ বিধি নিষেধ নাই। অর্থাৎ যে কোন সময়ে, যে কোন স্থানে, যে কোন

রূপে নামজপ করা যাইতে পারে। নাম জপের মাধ্যমে ভগবানের সহিত যুক্ত হইবার এই সহজ সাধ্য সরল উপায়, বিশ্ববিধাতা জীবের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া বিধান করা সত্ত্বেও বহির্মুখ মানবমন যে তৎপ্রতি উন্মুখ হইয়া নামজপে অনুরক্ত হয় না, ইহা ব্যক্তিবিশেষের দুষ্প্রারব্ধজনিত দুর্দ্দৈব যাহার অপনোদন জন্য সদা সাধুসঙ্গ করা কর্ত্তব্য।

নামজপের যথার্থ মানসিকতা সম্পর্কে মহাপ্রভুর বিশেষ পরামর্শ এই যে,—আপনাকে সর্বতোভাবে ভগবান কর্তৃক আবৃত ভাবিয়া, মনে প্রাণে নিরভিমান রহিয়া, সর্বকিছু ব্যাপারে সহনশীল থাকিয়া, ভগবৎ পরায়ণ, অথচ সম্মানার্হ নয় এমন ব্যক্তিরও মানদ হইয়া, সাংসারিক সুখ সমৃদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠাভিলাষের প্রবণতার মোহ পরিহার [illegible]য়া, সকল চিন্তা সমস্ত কাজে, সমগ্র নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখীন রাখিয়া, শ্রীহরির নাম কীর্ত্তনীয়। পক্ষান্তরে ধনজন, সুন্দরী ভার্য্যা কবিত্ব শক্তি প্রভৃতির কামনা বিবর্হিত চিত্তে—জন্ম জন্মান্তরে যেন ভগবানের প্রতি অহৈতুকী নিষ্কাম ভক্তি অব্যাহত থাকে, এই নিরবচ্ছিন্ন প্রার্থনার আন্তরিক অনুগত ভাবে 'নামজপ' বিধেয়।

মহাপ্রভু উল্লেখ করিয়াছেন যে,—অমৃতনাম এইরূপ শ্রদ্ধাসহকারে জপ করিতে করিতে, পরাবিদ্যার অধিগমে আনন্দ চিন্ময় রসাত্মক মূর্ত্তি, যখন অন্তরের অন্তঃস্থলে আন্দোলিত হইয়া ভক্তিভাবের তীব্র আকুলতার অভ্যুদয় দেখা দেয়, নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের পদধূলি সদৃশ দাসানুদাস জ্ঞান করিয়া, দুঃসহ সংসার সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার মানসে, নেত্রদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে; ভাগবতীয় ভাবের আতিশয্যে জড়িত কণ্ঠস্বর রুদ্ধ এবং সর্বাঙ্গ পরমানন্দভরে রোমাঞ্চিত হইতে থাকে, ভগবৎ বিরহে নিমেষ পরিমিত সময় যুগের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সমস্ত জগৎ বিতৃষ্ণাভরে শূন্যময় প্রতীতির অনুভবে, ভগবৎ সান্নিধ্য লাভের বাসনায় নয়নে বারিধারা নামিয়া আসিতে থাকে; পরন্তু ভগবান যে অবস্থায় রাখিয়াছেন, তাহাতেই মনের সন্তোষ বিরাজ করে,— তখনই 'নামজপ' সার্থক্যলাভ করিয়া ভগবৎ কৃপার আবির্ভাব ঘটে।

মহাপ্রভুর বিশেষ অভিমত এই যে, সর্বতোভাবে একনিষ্ঠ এই ভক্ত-হৃদয় কন্দরে, বাক্য ও মনের অগোচর সর্বান্তর্য্যামী ভগবান স্বয়ং স্ফুরিত হইয়া থাকেন। মঙ্গল আলোকের নিবিড় স্পর্শে ভরিয়া যায় ভক্তের মনো-মন্দির। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই মানসিক ভাবের সমারোহ এমন

পর্য্যায়ে উপনীত হয় যে, দুই বর্ণ বিশিষ্ট 'কৃষ্ণ' শব্দ অমৃততুল্য মনে হয়, উচ্চারিত হইলে, রাশিকৃত রসনালাভের লালসা জাগে, শ্রুত হইলে, অর্বুদ কর্ণ অর্জ্জনের স্পৃহা আসে, চেতনায় অঙ্কুরিত হইলে, যাবতীয় বহির্মুখী ইন্দ্রিয় গ্রাম পরাভূত হইয়া যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বর্ণিত সাধনার অবলম্বন স্বরূপ উপরোক্ত নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, উপরন্তু আপন চরিত্র ও আচরণের মধ্যে তাহার সম্যক প্রতিফলনে, স্বয়ং জীবজীবনের বহির্মুখী অঙ্গনে ভাবগঙ্গার প্লাবন প্রবাহিত করিয়া,— সংশয়ের প্রদোষ প্রহর, আলোকের আশ্বাসে উল্লসিত করিয়াছিলেন। ভগবৎ বিরহ বেদনার সেই আন্তরিক আতিশয্যের দশাকে,— অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিরহ জনিত চিন্তা উদ্বেগ, মুগপ হর্ষ, উৎকণ্ঠা দৈন্য, দম্ভ ও বিনয়ের উদয়কে,— তৎকালীন বৈষ্ণব ভক্তগণ 'দিব্যোন্মাদ' আখ্যায় অভিহিত করিয়া উহারা বলিয়াছেন যে উপাস্যের প্রতি উপাসকের নির্ব্বিচারে ঐকান্তিক নির্ভরতার এই প্রেমভক্তি নিবেদনরূপ ভগবৎ আরাধনার প্রবর্ত্তনই যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক চৈতন্যদেবের চির অনর্পিত অবদান।

সময় বিশেষে ভগবৎ বিরহে মহাপ্রভুর যখন ভাবাবেগ হইত, আরাধ্য দেবতার সহিত বিচ্ছেদ জনিত সেই তীব্র ব্যাকুলিত চিত্তের সাম্যভাব ফিরাইয়া আনিতে, সর্বক্ষণের অন্যতম প্রধান সহচর, রায় রামানন্দ, স্বরূপ, দামোদর, তাৎক্ষণিক ভাবানুযায়ী, যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ও জগন্নাথবল্লভ নাটকের শ্লোক আবৃত্তি এবং জয়দেব ও চণ্ডীদাসের রচিত পদাবলী কীর্ত্তন করিলে, মহাপ্রভু বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া, তাঁহার আত্মহারা আবেশের জন্য অপরের মন কষ্টের কারণ হওয়ায়, মার্জনা চাহিয়া বলিতেন,— কৃষ্ণ কথাই যথার্থ কথা; আর সব কথাই বৃথা ব্যথাদায়ক কৃষ্ণলীলা কথা আলোচনাই ভবব্যাধির মহৌষধ; কর্ণমনের আনন্দদায়ক রসায়ন। কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র অলভ্যকে লাভ করিবার বৃথা বাসনা বিলাস নহে, বরং অধরাকে ধরিবার একমাত্র সহজ ও উত্তম উপায়। অভয়মন্ত্র কৃষ্ণ নামের এমনই মহিমা যে, কেবল মাত্র শ্রবণে কিংবা উচ্চারণেও বহির্মুখী চিত্তের সকল সংশয়ের নিরসন ঘটিয়া, সমগ্র প্রাণমন ভরিয়া উঠে, স্বতঃস্ফূর্ত অদ্ভুত আনন্দে; শোকতাপ দূরীভূত হইয়া যায়। দীপ্র দীপ্তিমান, বজ্রসম বলীয়ান সূর্য্য-সদৃশ অমিত শক্তির কৃষ্ণনামের কৃপাস্পর্শে, চঞ্চল মন শান্ত হইয়া আসে

ভক্তহৃদয় সুখ-মুদিত নয়নে নামগানেই নিমগ্ন থাকে।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সুবিজ্ঞাত হইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ,—ইহাই মহাপ্রভুর অভিমত। সুখাদ্য বস্তু পুষ্পান্ন, মিষ্টান্নের উপাদান, প্রস্তুত প্রণালীকে যদি বলা হয়,—তাহার তত্ত্বালোচনা, তবে তাহা আস্বাদের সুখানুভূতিকে বলিতে হয়,—বস্তুটির রসালোচনা। সেইরূপ পরমব্রহ্ম বস্তুর তত্ত্বালোচনা বিধৃত রহিয়াছে, সকল উপনিষদের সার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়,—যাঁহার প্রবক্তা জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, পক্ষান্তরে শ্রুতি যাঁহার স্বরূপের সন্ধান করিয়া তাঁহাকে মধুব্রহ্ম, আনন্দব্রহ্ম নামে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার নিরবধি রসের বৈচিত্র্য বিলাস আস্বাদনের নির্দ্ধারণ রহিয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে,-যাহার প্রবর্ত্তক ভক্ত শিরোমণি শ্রীল শ্রীশুকদেব।

শ্রীভগবান সর্বভূতের পরমসুহৃদ ও দুঃখময় সংসারভূমি হইতে উদ্ধারকর্ত্তা, ইহারই দিগদর্শন রহিয়াছে, , শ্রীগীতায়। কিন্তু তিনি কত মধুর, কত প্রেমিক, কত আপন, ভক্তহৃদয়ে তাঁহার যে যথার্থই নিত্য আনাগোনা,-সেই অপ্রাকৃত মিলনের অপূর্বকথা গীতায় নিজে বলেন নাই। তাই রসময় ভগবানের অলৌকিক রসের আলোচনা সমৃদ্ধ ভাগবতের বক্তা, ভগবদ্ভক্ত। সুতরাং ভগবৎভক্তি লাভ করিতে ইচ্ছুক, রসিক ভক্তবৃন্দের পক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতই অনুধাবনীয়, কীর্ত্তনীয়, বন্দনীয়, আস্বাদনীয়।

করুণাময়ী গঙ্গা আপন মনে, আপন পথে, আপন গতিতে, নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। যাহার ইচ্ছা হয় গঙ্গাতীরে গমন পূর্বক অবগাহন করিতে পারে; কিংবা প্রয়োজন মত গঙ্গাবারি বহন করিয়া লইয়া যায়।

এইক্ষেত্রে সজ্জন দুর্জ্জনের পার্থক্য নাই। অপরপক্ষে ভাগবতকথাগঙ্গা ভগবৎ রসাপপাসু ভক্তগণের মিলনস্থানে, কাহাকেও আশ্রয় করিয়া উদিত হইয়া থাকেন এবং ভক্তবর্তৃক বিবৃত একমাত্র এই ভাগবত কথাতেই পরম অমৃত বা সংসার মুক্তির রস পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য যে, যাঁহারা পরমার্থ তত্ত্ব চিন্তাপরায়ণ, অধ্যাত্মরসে রসিক, ভক্তগণের অনুগত হইয়া কেবল পারমার্থিক তথ্য ভাবনাতেই দিনাতিপাত করিয়া থাকেন, রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকেই, এই অমৃতরস আস্বাদনের অধিকারী জ্ঞান করিয়া, তাঁহাদিগের বুদ্ধিকে এমনভাবে পরিচালিত করেন,—যাহাতে ভ্রান্তি হইতে পরমসত্যে উপনীত হইয়া, অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে দিব্যজ্ঞানের আলোকে

পৌঁছাইয়, মৃত্যুময় সংসারভূমির অন্তরালে অবস্থিত অমৃতধামের সন্ধান পাইয়া, জীবনলীলা অবসানে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারে।

প্রাসঙ্গিক উল্লেখযোগ্য যে, বাহিরের সুখদুঃখ, মানঅপমান প্রভৃতি ব্যাপার সকল গ্রহণ করে, —মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি; কিন্তু আনন্দকে অনুভব করিতে হয় হৃদয়বৃত্তিদ্বারা। বুদ্ধি বিকশিত হয়, —অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতায়; হৃদয় প্রসারিত হয়, —তপস্যায় ও পবিত্রতায়, যাহাকে সাধনা বা অভীষ্ট লাভের ব্রত বলা হয়। সাধনাদ্বারা ঐহিক সিদ্ধিলাভ হয়; পরমাত্মার সহিত অন্তরে যুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু ভগবানকে লাভ করা যায় না। পক্ষান্তরে ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণলীলা কথার এমনি মহিমা যে ইহা শুনিলেই চৈতন্যস্ফূর্তিরূপ মঙ্গলের উদয় হইয়া, অনাদিকালের নিজজন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রাণময় প্রেমে আকর্ষিত হয় এবং এই পরম অনুরক্তিরূপ ভালবাসার বশেই ভক্তাধীন ভগবান ভক্তের সমীপবর্ত্তী হইয়া থাকেন; তাঁহাকে আপন করিয়া পাওয়া যায়, —ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের অভিনব শাশ্বতী বার্ত্তা।

ভগবান প্রেমের ঠাকুর; সর্ব্বভূতের সুহৃদ। তিনি পরম মঙ্গলময়। কিন্তু বাক্য ও মনের অগোচর তিনি। তাই নিজে না চাহিলে, জীবের পক্ষে তাহাকে জানা বা পাওয়া সম্ভব নয় বলিয়া, অসীমের অধিপতি দয়াহীন সংসারের সীমার মাঝে, নরবপু ধারণ করিয়া, জীবজগতের কল্যাণের জন্য, শান্তির শান্তছন্দে, বারবার ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া লীলাবিস্তাররূপ ধর্ম্ম সংস্থাপন পূর্বক ঘোষণা করেন, —তিনি নিজেই ভক্তহৃদয়ের অনুরাগ প্রার্থী; ভক্তহৃদয়ের আকুল আহ্বান, তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন না; কর্ম্মাধীন ভক্তের ভাবনায় ভগবানও ভাবিত, —ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতে প্রতিপাদিত।

সংসার জীবনের সতত অস্থির, আপাতমধুর ক্ষণিকের তৃপ্তিদায়ক, বিষয়-বস্তুর অপরিহার্য্য বিমুগ্ধ আকর্ষণ হইতে সরিয়া গিয়া, ভক্ত হৃদয় যখন নিত্য, শাশ্বত, অপরিবর্ত্তনীয় রসাল ভগবৎ লীলা আস্বাদনে আকৃষ্ট হয়, তখন মধুমক্ষিকা যেমন কোন পুষ্পে মধুর স্বাদ পাইলে, তাহার রসগ্রহণে লাগিয়া থাকে, তেমনি ভাগ্যবান প্রেমিক ভক্ত, চেতনার মহাতীর্থে তন্ময় হইয়া, মধুর হইতেও সুমধুর ভগবৎলীলা প্রসঙ্গের অনুধ্যানে নিরন্তর নিমগ্ন থাকিয়া অসীমের উৎসঙ্গে সমাহিত হয়; ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা শ্রবণের তাৎপর্য্য।

বাহ্য প্রকৃতির উপকরণকে, অপরিমিত ভোগের দৃষ্টিতে দেখিলে, আত্মার

স্বাভাবিক আনন্দ খর্ব হইয়া পারমার্থিক প্রীতি পরিণত হয়, কৃত্রিম পণ্যে। ফলতঃ অন্তরতমের প্রতি আন্তরিক অনুরাগের অন্তরঙ্গ অনুভবের অভাবে, মনের মালিন্য অপসৃত না হওয়ায়, —অজ্ঞানতার অঞ্জনে পরাজ্ঞানের স্নিগ্ধ জ্যোতির প্রভবে প্রতিফলিত হয় না, সীমিতমন সীমাতীত হইয়া মুক্তির মোহনস্পর্শ-রূপ অসীমের সন্ধান লাভ করিতে পারে না, সংসার মোহাবর্ত্তে পতিত, দুঃখ-হত, বেদনা পীড়িত, ত্রিতাপ ক্লিষ্ট. জীবনের জ্বালা, ভগবানকে সন্তপ্ত করে না।

পক্ষান্তরে ভগবৎ প্রসঙ্গের অবিরাম অনুশীলনে যাঁহার অন্তর প্রতিনিয়ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বসতি অভিলাষ করে এবং ভগবৎ বিচ্ছেদজনিত আর্ত্তি, দর-বিগলিত অশ্রুধারারূপে অবিরত বক্ষ সিক্ত করে, —তাঁহার যাবতীয় আসক্তির বন্ধন, সকল ভ্রান্তির ভাবনা, অপগত হইয়া মনপ্রাণ উত্তীর্ণ হয়, ভগবৎ নির্ভর-ধার তীর্থপথে, মৃত্যুভীতির বিভীষিকা বিদূরিত হইয়া, সকল সময়ের বন্ধু ভগবানের প্রতি অনুরক্ত চিত্ত' উপনীত হয় নির্ভয়ের বন্দরে। তখন অহং এর অহঙ্কার অপসৃত, দুঃখময় সংসার সমুদ্রে নিপতিত ভক্তের ভগবান, বাত্যা-ক্ষুব্ধ উদ্বেল উদধির অপরপারে, দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া অসীম করুণায় অপরিসীম মমতাভরে, অপার আগ্রহে অপেক্ষা করেন, জীবলীলা অবসানে ঈশ্বরগত প্রাণ, নবাগত ভক্তকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিবার প্রত্যাশায়, —ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের অপরূপ সিদ্ধান্ত।

সারাজীবন নানাভাবে প্রাণপণ প্রয়াস করিয়াও, যখন পরিপূর্ণভাবে আশ্রয় করিবার কিছুই পাওয়া যায় না, —তখনই অন্তরে ভাগবত সচেতনা জাগরিত হয়; যিনি সর্ব্বব্যাপী, সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা, সর্ব্বভূতের আশ্রয়, যিনি আপনশক্তিতে বিশ্বজগৎ পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহাকে জানিবার বাসনা জাগে। শ্রীমদ্ভাগবতে এই অদ্বিতীয় বস্তুর স্বরূপ বর্ণনায় উল্লেখ রহিয়াছে, বাষ্প, জল ও বরফের ন্যায়, —ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান একই তত্ত্বের তিনটি বিভিন্ন অবস্থার নাম। ব্রহ্মরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনুস্যূত জ্যোতিস্বরূপ পরতত্ত্ব; পরমাত্মারূপে সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট জীবতত্ত্ব, ভগবান রূপে দিব্য-ধামে নিত্যলীলারত, এই ত্রিবিধতত্ত্বের কৃষ্ণস্বরূপেই জীবের আশ্রয়তত্ত্ব

সুতরাং নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থিরস্থিতির একটি দৃঢ় ও প্রশান্ত স্থিরতার বিশ্বাসে ও আত্মসমর্পণের অনবচ্ছিন্ন অনুভূতিতে অন্তর্ব্যাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকেই ভজনা করিলে, মানবমনের সহিত দিব্যচেতনার যোগসূত্র রূপে

জীবহৃদয়ে যে অধ্যাত্মচেতনা রহিয়াছে; তাহা ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া, অতি মানস চেতনার উদ্ভব ঘটে। তখন সীমা ও অসীমের শাশ্বত বিরোধ নিরাকৃত হইয়া। অন্তরস্থ শূন্যমন্দির পূর্ণ হয়, অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দের অপ্রাকৃত পদপ্রভায়; চিরজীবনের আশ্রয়কে অনলস অনুসন্ধানের শুভ্র অবসান হয়,— ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের বিশেষ বার্ত্তা।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণবিরহ ব্যাকুলিত ব্রজভাব মহাভাব, মহাপ্রভুর জীবনে মূর্ত্ত হইয়াছিল, —নীলাচলে সমুদ্রপ্রান্তে কাশীমিশ্রের বাড়ীতে, গম্ভীরা নামক ভিতর দিকের ক্ষুদ্রকক্ষে অবস্থানকালে। ঐ সময়ের ধ্যানতন্ময় অবস্থায় মহাপ্রভু উপদেশ রাখিয়াছেন, —মানবজীবনের চিত্তলোক আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি-কর্ত্তার লীলাবিলাস হইলেও এই নশ্বর জগতে শ্রীভগবানই একমাত্র স্থায়ীবস্তু। তিনি অনন্তকাল ধরিয়া একইরূপে রহিয়াছেন। তাই তাঁহার মর্ত্ত্যলীলা স্থায়ী ও রসাল বিষয়। চঞ্চল মনকে এই নিত্যলীলারসে আবিষ্ট করিবার উপায়' রসময় শ্রীকৃষ্ণের সহিত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, —এইরূপ কোন একটি প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাহারই অনুভবে অন্তনিবিষ্ট থাকা। এই অবস্থায় যে তত্ত্বপরিণাম, অর্থাৎ ঈশ্বরানুকৃত স্বভাব প্রাপ্তির উপায় রহিয়াছে যাহা সকল সাধনার একমাত্র লক্ষ্য, তাহা অধিগত হইলে, —জন্মবন্ধন হইতে বিনির মুক্ত হইয়া জীবাত্মার দুঃখময়ও মৃত্যুআকীর্ণ সংসারভূমিতে পুনরাবৃত্তি ঘটে না। অনাময় পদ প্রাপ্তিতে জীবের উত্তরণ হয়, দিব্যধামে চিন্ময়ভূমিতে।

এই তমসাচ্ছন্নযুগে বা কলিকালে পার্থিব বিষয়ভোগে সন্নিবিষ্ট ও চঞ্চলমন জীবগণ প্রায়ই মন্দভাগ্য, মন্দমতি মন্দস্বভাব, অল্পায়ু বিশিষ্ট এবং সর্ব্বোপরি সাংসারিক নানা চিন্তা, বিবিধ রোগ শোকদ্বারা উপদ্রুত। এইরূপ কলিহত জীবের পক্ষে মনের আবিলতা দূর করিয়া ভগবানের সহিত আত্মার আত্মীয়তা স্থাপন পূর্ব্বক, চিত্তের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনদ্বারা তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হওয়া সম্পর্কে, কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নামশ্রেষ্ঠ 'হরিনাম' মহামন্ত্রই একমাত্র উপায় নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন —কলিযুগে এই নামভিন্ন আর অন্যগতি নাই, অবিরত শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তনে রত থাকিলে ভগবৎ প্রেম উপজাত হইয়া, সরস অন্তর লীলারস আস্বাদনের উপযোগী হয় এবং লীলাময়ের লীলাসঙ্গী হইবার লালসা জাগে। পক্ষান্তরে হেলায় বা শ্রদ্ধায় কৃষ্ণনাম জপ করিলেও ক্রমশঃ অনুরাগের অন্তরঙ্গতায় মনের মালিন্য অপসৃত হইয়া, অন্তরে

আসে দিব্য আলোকের আভাস। সুতরাং চিত্তে ভগবদ্ভক্তির অস্পষ্ট প্রকাশ অনুভব করিলে তাহাকেই অবিরাম কৃষ্ণনাম জপদ্বারা লালন করিতে হইবে, —যেমন চারাগাছকে বৃদ্ধি পাওয়াইতে বত্নপূর্ব্বক জলসেক করিতে হয়; রক্ষা করিতে বেষ্টনী লাগে; আগাছার জঙ্গল ছাঁটিতে হয়।

সর্ব্ববিষয়ে নিরাসক্ত হইয়াও, মহাপ্রভু ছিলেন ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি আসক্তচিত্ত; সকল প্রকারে নিশ্চেষ্ট থাকিয়াও, আপামর জন সাধারণকে ভক্তিধর্ম্মে প্রণোদিত করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইত এবং ক্ষণিকের অদর্শনে তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। ঈশ্বরানুভূতি ও ঈশ্বরপ্রীতির এক মহান আদর্শ তিনি। বিদ্যার গর্ব্বে আচ্ছন্ন, মর্য্যাদারমোহে বিমূঢ়, কুসংস্কারের জঞ্জালে পরিবৃত সামাজিক পরিবেশ এবং ভক্তিধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় সেই সময়ে, নবদ্বীপ নগরে মহাপ্রভুর জন্মগ্রহণেরও বহুকাল পূর্ব্বে রচিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদিতে উল্লেখিত, বিশেষভাবে মহাভারতে একাধিকবার লিখিত, —কলিযুগে চন্দনমাল্য শোভিত, গাত্ররং স্বর্ণবর্ণ, নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ সন্ন্যাস আশ্রমধারীরূপে ভগবানের নরলোকে আবির্ভাবের আভাস এবং শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্দের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত— অবিরাম মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত, অকৃষ্ণবর্ণ শরীর, সর্ব্বদা ভক্তগণ পরিবেষ্টিত ও অতিশয় বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ কর্তৃক সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞদ্বারা সদা অর্চ্চিত নরদেহধারী ভগবান কলিকালে নামজপ রূপ ভক্তিধর্ম প্রতিষ্ঠা করিবেন। এই সকল ভবিষ্যবাণী অনুধাবনে এবং সমগ্রজীবনব্যাপী তাঁহার বিবিধ অলৌকিক আচরণের আলোকে, অধিকন্তু, যুগোপযোগী ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, —শ্রীমদ্ভগবত গীতার এই চিরন্তন বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে, সমসাময়িক সূক্ষ্মদর্শী বিদগ্ধ ভক্তিশাস্ত্র রচয়িতাগণ, শচীদেবী গর্ভে জন্মগ্রহণকারী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য শরীরধারী নিমাই পণ্ডিতকে; সর্ব্বকারণ কারণ শ্রীভগবানের মর্ত্ত্যভূমিতে মূর্ত্তরূপ পরিগৃহীত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু বিশেষ প্রকারের কোনরূপ নূতন ধর্মমত প্রচার করেন নাই। ভগবান রসস্বরূপ ও ভক্তানুরাগী এবং কেবলমাত্র ভগবৎ নামজপ দ্বারাই তাঁহার সহিত যোগস্থাপন করা যায়, —শাস্ত্রাদি সম্মত বিলুপ্তপ্রায়, এই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম স্বয়ং আচরণ করিয়া তাহা নির্ব্বিচারে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সম্যক প্রচারই ছিল মহাপ্রভুর জীবনব্রত, সেই যুগসন্ধিক্ষণে, বাহ্যিক আচারসর্বস্ব প্রাণহীন অ-

মুষ্ঠানের পর্য্যবসিত পর্য্যাপ্ত পঙ্কের পঙ্কিলতায় পর্য্যবসিত ধর্ম্মাচরণ এবং শুষ্কতর্কে শীর্ণ ও কপোলকল্পিত ভাষ্যে বিকৃত দর্শনশাস্ত্র সমূহ নিজমহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া হরিনামের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে পরমার্থলাভের সন্ধান দিয়া, প্রেমধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। দূর দূরান্তরে অবস্থিত, তৎকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ ও বিত্তশালী, তাঁহার লীলাবিলাসের সহযোগী পরিকরগণকে যেরূপ অলৌকিক উপায়ে একে একে আহরণ করিয়া, পরিশেষে, তাহাদিগকে বৃক্ষতলবাসী ভিক্ষাজীবি সন্ন্যাসীরূপে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহা কোনরূপ আকস্মিকতার অভিব্যক্তি না বুঝাইয়া, যেন পূর্ব হইতেই স্থিরীকৃত এক অচিন্ত্যনীয় লীলা বৈভব নির্দ্দেশ করে।

নীলাচলে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর থাকা অবস্থায় গৃহী ভক্তগণ সর্ব্বদাই মহাপ্রভুকে মধ্যাহ্নে প্রসাদ গ্রহণ করিবার নিমন্ত্রণ করিতেন কিন্তু যিনি প্রত্যহ অন্ততঃ একলক্ষ হরিনাম জপ করেন, কৌতুকভরে তাঁহাকে 'লক্ষপতি' আখ্যায়িত করিয়া তাঁহার গৃহেই কেবলমাত্র দেহরক্ষার উপযুক্ত যৎসামান্য আহার্য্য গ্রহণে স্বীকৃত হইতেন। এই সময়ই মহাপ্রভু কোন লীলাসহচরকে এমন নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন, যাহার তাৎক্ষণিক অভিপ্রায় কাহারও সহসা উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয় নাই। শৈশবকাল হইতে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, শক্তিশালী ধর্মপ্রচারক নিত্যানন্দ প্রভুকে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য নবদ্বীপ প্রেরণ না করিলে, অনতিকাল মধ্যে লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির হয়ত অনায়াসেই বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণে আগ্রহ হইত না, এবং অনেকেই সামাজিক কঠোরতার উৎপীড়নে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিত।

সদ্য বিবাহিত জমিদারতনয় রঘুনাথ দাসের সংসারত্যাগ বাসনা সমর্থন করিয়া তাঁহাকে নীলাচলে গমন করিতে বলিয়াছিলেন। অপরদিকে তপনমিশ্রের সংসারে বিরাগীপুত্র রঘুনাথকে পিতামাতার জীবতকাল পর্য্যন্ত গৃহে বাস করিবার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বেশ্বর বলিয়াই অন্তর্নিহিত ভক্তিভাব সম্যক অবহিত হইয়া, দাক্ষিণাত্যের বালক রঘুনাথভট্টকে উপনয়নের পরে সন্ন্যাসগ্রহণের অনুমতি দিয়াছিলেন। বিশাল ঐশ্বর্য্যের অধিকার ও মন্ত্রীত্ব পদ হইতে অব্যাহিত নিয়া, শ্রীধাম বৃন্দাবনে অবস্থান পূর্বক, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও ভক্তিমূলক গ্রন্থাদি প্রণয়নের উপদেশ দিলেন, —রূপ ও সনাতন ভ্রাতৃদ্বয়কে। পক্ষান্তরে রাজকার্য্য হইতে অবসর-গ্রহণ করিয়া, পরিজনসহিত গৃহে থাকিয়াই

সর্বক্ষণ কৃষ্ণভজনে নিমগ্ন থাকিবার অভিমত জানাইলেন, —রায়রামানন্দকে

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমহাপ্রভু সাকার উপাসক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আরাধ্য দেবতা হইলেও সকলেই ক্রমশঃ এই মহাপ্রেমিক, মহানকর্মীর উপদেশের অনুরাগী হইবে, এইরূপ নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে, অপর কোন ধর্ম্মমতের প্রতি অবজ্ঞা করেন নাই। ব্যক্তিগতভাবে পরমজ্ঞানী এবং মহাপণ্ডিত ছিলেন তিনি। কিন্তু পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া দিব্যপ্রেমে সমুজ্জ্বল তাঁহার দিব্যজীবনই সকলকে আকৃষ্ট করিত। তাঁহার ব্যবহারিক জীবনও ছিল অতি বিচিত্র। ঐশীশক্তিপ্রভাবে অন্তরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া কাহাকেও লঘু দোষে গুরু দণ্ড দিয়া গুরুতর অপরাধীকে মার্জ্জনা করিয়াছেন। কৃষ্ণনাম না করিয়া তাঁহার গুনকীর্ত্তন করিলে বিরক্ত হইতেন। কোন নারীকে তাঁহার পাদস্পর্শও করিতে দিতেন না কিন্তু পুরীধামে অপলক নেত্রে বিগ্রহ দর্শনকালে আত্মবিস্মৃত জনৈক রমণী ভিড়ের চাপে অন্যমনস্কভাবে তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিলে তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলেন। বিষয়ীলোকের সংসর্গ এড়াইয়া চলিলেও, অনেক নিঃস্বব্যক্তিকে নিজ মহিমায় বিত্তশালী করিয়াছিলেন। নিজে সংসারত্যাগী হইলেও, সংসারী লোককে আপন কাজ নিপুণভাবে সাঙ্গ করিতে বলিতেন, —যেন আলস্যের শিথিলতায় কর্ত্তব্যের বোঝাকে লঘুভাবে গ্রহণ করা না হয়।

বটফলের একটি ক্ষুদ্র বীজ হইতে যেমন বিশাল বৃক্ষ সৃষ্ট হইয়া, তাহা ক্রমশঃ অনন্ত ফল দান করে, তেমনি একদা যাহা ছিল মহাপ্রভুর সুমহৎ বক্ষে বীজরূপে নিহিত, সেই অমৃতফলরূপ ভক্তিধর্মের সযত্ন সেচনসিক্ত বীজকোষ মহামহীরুহের ন্যায়, প্রসারিত হইয়া তাহার মুক্তগুচ্ছ, অপ্রমত্ত ও পরিপূর্ণ অপার্থিব আনন্দ পরিবেশের অবিচল সুশীতল ছায়ায়, সংসার তাপদগ্ধ জীবের সর্বসন্তাপ দূর করিয়া পরমপথের পথনির্দ্দেশ করিতে, নিরবধি কালের জন্য দৃঢ়মূলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এইরূপ অবধারণ করিয়া,-মাত্র সাতচল্লিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়া আটচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমে পদার্পণের অব্যবহিতকাল পরেই, মর্ত্ত্যলীলা সংবরণের ইচ্ছায়, অত্যধিকরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভগবৎ বিরহ বৈভবে বাহ্যজ্ঞানবিরহিত তন্ময়তায় - একদিবস আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণ অন্ধকারে উদিত চন্দ্রিমার অমৃতধারারূপ ভুবন ভোলান অনাবিল জ্যোৎস্নার আলোকধারায় স্নাত নীলাম্বুরাশির অতন্দ্র তরঙ্গের উর্দ্ধমুখী বিকাশে যেন পুষ্পায়িত ফেনিল বিপুল নীলাভ জলরাশিতে,— যমুনাতীরবিহারী গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের

শ্যামলসুন্দর চিত্তবিনোদনকারী প্রশান্তমূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া,-আত্মসমর্পণের জন্ম ঝাঁপ দিলে, মৎস্যশিকারী ধীবরগণ, মেঘম্লান তারার আলোয় দৃষ্ট পরমতৃপ্তির দুর্লভ প্রশান্তির আনন্দে উদ্ভাসিত বদনমণ্ডল ও সমগ্রদেহে প্রবহমান স্নিগ্ধকারুণ্যের শান্ত প্রভায় অতিশয় সমুজ্জ্বল অদৃষ্টপূর্ব দিব্যকান্তি, করুণ কোমলআভা গভীরসুন্দর, সেই অচেতন প্রায়' হিরণ্যপ্রভ দিব্যদ্যুতিমান অপার্থিব তনু তীরে তুলিয়া আনিবামাত্র, তাহারা অলৌকিক আনন্দের ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া উর্দ্ধবাহু নৃত্য করিতে লাগিল।

উদ্বেলিত দুর্ভাবনায় উৎকণ্ঠান্তরে অনুসন্ধানরত চৈতন্যগত প্রাণ পার্শ্বচর ভক্তগণ, দূর হইতে এই অপূর্ব দৃশ্য অবলোকনে সত্বর সেখানে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিলে মহাপ্রভু সংজ্ঞা লাভে, কমলউন্মীল নয়নযুগল ঈষৎ উন্মীলন করিবামাত্র তাঁহার সৌম্যশান্ত প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে একটি স্বর্গীয় সারল্যের দিব্যদ্যুতি খেলিয়া গেল। অস্ফুটে মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, —তিনি মোহনমুরলীধারী নন্দনন্দন ব্রজকিশোর কৃষ্ণের মিলন সুখে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষণিকের চপল দর্শন দিয়াই-ভবভয়ভঞ্জন, পরাণবল্লভ, বনকুসুমে ভুষিত শ্রীকান্ত অন্তর্হিত হইলেন।

যদিও মিলন অপেক্ষা বিরহকেই দেহেন্দ্রিয় ও মনের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে গরিষ্ঠ বলা হইয়া থাকে, যেহেতু সতত সান্নিধ্যে, একটি হৃদয় আর একটি হৃদয়ের সংস্পর্শ পাইয়া উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেও, একের অপরের ইচ্ছার নিকট সর্বক্ষণ সমর্পিত থাকিতে হয় বলিয়া, সামীপ্যবশতঃ কল্পনাবিলাসের স্বতঃ স্ফূর্ত বিকাশ ঘটে না। অপরদিকে বিরহকাতর তপ্তচিত্তের বক্ষঃফলকের অন্তরালে অভিমানকুণ্ঠিত অন্তরবেদনা বিশ্বকে বিষণ্ণমূর্ত্তিতে প্রকাশ করায় সংসারকে মনে হয়, মরুখণ্ড; কেবল যেন জ্বালা আর উত্তাপ। তখন প্রিয়তমের ভাবনা ব্যতীত, অন্যচিন্তা মনে স্থান পায় না।

পক্ষান্তরে বৃক্ষের মূলে কীট বাসা বাঁধিলে যেমন বসন্তসমাগমে পত্র পল্লবে ঔজ্জ্বল্য দেখা যায় না, তদ্রূপ নিরবচ্ছিন্ন প্রিয়জন বিচ্ছেদে সন্তপ্ত হৃদয় যখন বিশুষ্ক হইয়া আসে, সেই আয়োজনহীন অনবধানসময়ে, প্রার্থিতের আকস্মিক আবির্ভাবেও রসমাধুর্য্য যথাযথরূপে উদ্বোধিত হয় না। তবে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রই আকাশে উদিত পূর্ণচন্দ্র দেখিতে পাইলেও সহসা গাঢ়মেঘে কিরণ জাল ঢাকা পড়িয়া, চন্দ্রমা ক্ষণিকের জন্য দৃষ্টির অগোচর হইয়া যেমন মেঘমুক্ত হইবার

অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত ও আগ্রহী দ্রষ্টার উৎসুক বাঞ্ছাই করে-সেইরূপ ক্ষণে ক্ষণে অদর্শন জনিত বিরহব্যাকুলতা কি বা বিস্মরণরূপ বিস্মৃতির মধ্যদিয়াই প্রিয় মিলন সুখের মনোহারিতা যথার্থভাবে অনুভব হয়।

পরন্তু মহাসমুদ্র হইতে আহৃত এক গণ্ডুষ জল এবং ফেনিলোচ্ছল জলাম্বুরাশির মধ্যে বস্তুহিসাবে প্রকৃতিগত পার্থক্য না থাকিলেও অঞ্জলীবদ্ধ বারির যেমন সমুদ্র অভিমান সাজে না তেমনি জীব যদি আপনাকে ভগবান মনে করে, সেইক্ষেত্রে দ্রষ্টারূপ অসীম সমুদ্রের অনন্ত তরঙ্গের অপার চমৎকারিত্ব অনুভবে দর্শনের ন্যায় অনির্বচনীয় রসস্বরূপ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীভগবানের বহু বিচিত্র আনন্দরস আস্বাদনে অপারক হয়। কাজেই নিজকেই ব্রহ্ম ভাবা নয় - প্রতিদিন প্রতিক্ষণ চিন্ময় স্মরণে ব্রহ্মসদৃশ হইয়া উঠিতে হইবে, তবেই অনুভূতি অভিব্যক্ত হইবে যে তিনিই পরমগতি একমাত্র আশ্রয় ও অনাবিল আনন্দ। মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত প্রান্তরে পতিত পথিক যেমন তাহার ছায়া সুনিবিড় শান্তনীড়ে ফিরিয়া যাইতে চাহে যেখান হইতে তাহার পথযাত্রা সুরু হইয়াছিল, সেইরূপভাবে কোন অলৌকিক মহিমার দিব্যভূমি হইতে জীবন যাত্রা আরম্ভ হইয়া এই তাপদগ্ধ সংসারভূমিতে বিস্তীর্ণ হইয়াছে তাহা প্রতিনিয়ত ভাবনায় ধরিয়া রাখিতে হইবে।

অন্যপক্ষে পতিকে অস্বীকারকারী পত্নী যেমন কলঙ্কিনী নামে অভিহিত হইয়া উপেক্ষিত মন সংসার জীবন যাপন করে — সেই প্রকার বিশ্বপতিকে অস্বীকার বা নাস্তিকরূপ আখ্যাত হইয়া ব্যাধিজীর্ণ মানসিকতার ন্যায় তাহাদের সমাজ জীবন বহন করিয়া থাকে। অধিকন্তু পিতা হইতে পুত্র জাত হইলেও স্নেহ ও সম্মানের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচারের যুক্তিতে পরস্পর পৃথকত্ব স্বীকার না করিলে যেমন উভয়ের মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পায় না তেমনি ব্রহ্ম হইতে জাত জীব যদি নিরবচ্ছিন্ন স্মরণরূপ সাধনার দ্বারা অন্তর্গূঢ় আনন্দের উৎসশক্তি চালিত করিয়া সৃষ্টিকর্তার প্রতি আত্মনিবেদনরূপ ভক্তির সৌরভে জীবন সুরভিত করিতে অবহেলা করে তবে অজ্ঞাত পিতৃপরিচয় পুত্র যেমন পিতার মায়ামমতা তথা উত্তরাধিকার লাভে বঞ্চিত হয়, সেইরূপ আত্মবিস্মৃতির ফলে আত্মম্ভরিতার উদ্ভব ঘটিয়া, সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্মে ভগবৎ প্রসন্নতা বিকীর্ণ হইতে পারে না, জীবন বল্লভের পদপল্লব জীবনতরীতে স্পর্শিত হইয়া পার্থিবদেহ ভাগবতী তনুতে পরিণত হয় না, জীবন দেবতার সহিত বিচ্ছেদ সঙ্কটের নিরসন ঘটে না, অন্তরে আনন্দরসানুভূতি তিরোহিত হইয়া।

জীবন শূন্যগর্ভ মরীচিকায় পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং "জীবেতে ঈশ্বরবুদ্ধি কভু না করিবে।"

অতঃপর রাসরসবিহারী, রাধিকাহৃদিরঞ্জন, কুঞ্জকাননচারী শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদ জনিত বিরহানলে অতিশয় ব্যাকুল, রাধাভাবে বিভাবিত, সদা সচকিত নয়ন, মহাপ্রভুর রাত্রির বিশ্রামও অন্তর্হিত হইল। সর্ব্বক্ষণ প্রিয়তম ভক্তগণ পরিবেষ্টিত থাকিয়াও, ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে একুশে জুন, মতান্তরে দশই আগষ্ট অলৌকিক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, লৌকিক অধিষ্ঠানে অবতীর্ণ গৌরহরি চিরতরে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

বহু অনুসন্ধানেও তাঁহার চিন্ময়দেহের সন্ধান না পাইবার কারণ স্বরূপ গ্রন্থাদিতে উল্লেখ রহিয়াছে,—অতি প্রত্যূষে সমুদ্রে স্নানান্তে "জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে" বলিতে বলিতে অপার রহস্যময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু দ্রুতপদে সন্নিকটবর্ত্তী "টোটাগোপীনাথ" মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র, দরজা আপন হইতে অবরুদ্ধ হইয়া গেল। পশ্চাদ্ধাবিত নিত্যসহচরগণ, তৎক্ষণাৎ কপাট উন্মুক্ত করিয়া, সেই ত্রিভুবনবরেণ্য আনন্দমূর্ত্তি গৌরতনু দেখিতে পাইলেন না,—বুঝিবা তিনি বিগ্রহে বিলীন হইয়া গেলেন, যেন অপার্থিব দেহ পার্থিব রঙ্গমঞ্চ হইতে মায়া যবনিকার অন্তরালে সরিয়া গেল।

কিংবদন্তি অনুসরণে দেবলগণের জ্ঞাত সিদ্ধান্ত এইরূপ,—একত্রিশে আষাঢ় রথযাত্রার পরদিন, জগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা মন্দিরে অবস্থানকালে, [illegible] সমীপে [illegible] ধ্যানতন্ময় সমাধিমগ্ন মহাপ্রভুর লৌকিক শরীর ক্রমে শীর্ণকায় হইয়া [illegible] যেন কর্পূরের ন্যায় উবিয়া গেল যেমন অপরাহ্নে সূর্য্য ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হইতে হইতে [illegible] অদৃশ্য হইয়া যায়।

তৎকালীন জনশ্রুতি অনুসারে [illegible] অভিমত—[illegible] মন্দির অভ্যন্তরে গর্ভগৃহের [illegible] মহাপ্রভু বাহ্যতঃ স্থূলদেহ সহসা চিন্ময়দেহে রূপান্তরিত হইয়া [illegible] প্রভাবমণ্ডিত দারুব্রহ্মে মিশিয়া গেল—সেই সময়কার অভূতপূর্ব্ব জ্যোতিপ্রভার অলৌকিক দীপ্তিতে [illegible] স্তূপে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, গর্ভমন্দির।

তারপর অবিচল নিয়মে অবিরত ধাবমান অনন্তস্রোত সলিলে মহাকালের কতনা জটিল কুটিল বিচিত্র পথ বাহিয়া পাঁচ শতাব্দীকাল ব্যাপী দিবারাত্রির মালা রচনা করিয়া গিয়াছে। ষড়ঋতুর লীলারঙ্গে লীলায়িত, বনস্থলীর প্রফুল্ল শ্যামরেখায় তৃণসার নীলাভূমির বক্ষে বহুবিধ বর্ণচ্ছটা আসিয়াছে; আবার চলিয়া গিয়াছে। কত দ্বন্দ্ব, কতনা আত্মঘাতী সমারোহের সর্ব্বনাশে, পৃথিবীতে

নব নব ইতিবৃত্ত রচিত হইয়াছে। পতন অভ্যুদয় বন্যা পথে রাজা রাজ্যপাট অপসারিত হইয়া, জনগণের রাষ্ট্র গঠন হইয়া উঠিয়াছে। ভাব জগতেও দেখা দিয়াছে জাগরণের অভিনব আত্মপ্রকাশ।

পক্ষান্তরে আধুনিক বিজ্ঞানের নিত্য নূতন অভিনব আবিষ্কারের ফলে, বিজ্ঞানগর্ব্বী পাশ্চাত্য সভ্যতা যেন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া, মহামানবগণের উদার বাণীতে আর জাগ্রত জীবনদর্শন দেখিতে পাইতেছে না। ধনী দরিদ্রের বৈষম্য-বিচারে, কর্ম্মবাদের অমোঘ বিধান অস্বীকার করিতে চাহিতেছে। বিষয়ের মধ্যেই বিষয়াতীতকে ধরিতে পারিতেছে না। মৃত্যুকে কালস্রোত হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হওয়া ভাবিতেছে। অনির্ব্বচনীয় বস্তু আত্মার অস্তিত্বেও সন্দিহান হইয়া পড়িতেছে। ধর্মক্ষেত্র ভারতভূমিতেও কতবিধ ধর্ম্ম বিপ্লব ঘটিয়া ধর্ম্মজীবন যাপনের পথে নানারূপ বৈশিষ্ট্যের বৈকল্য অনুপ্রবেশ করিয়াছে। ধর্মকর্মের নামে অর্থহীন দানের প্রশ্রয়ে জাতীয় শক্তির সীমাহীন অপচয় ঘটিতেছে।

এই বিরোধ সংক্ষোভে আন্দোলিত, সংশয় সন্দেহে নিপীড়িত ও নৈরাশ্য-যাতনায় ক্লিষ্ট, পরিবর্ত্তনশীল জগতের অশেষ ছলনার বহুতর বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যেও কালের তিমির রজনী ভেদ করিয়া চিরভাস্বমান ধ্রুবতারকার মত দিব্য-জ্যোতির জ্যোতির্ময় প্রভায় ভাস্বর, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অমৃতময় পথনির্দ্দেশ, তথা পরমপথ প্রদর্শক আনন্দময় মহামন্ত্র, বিশ্বনিখিলের মহাজনারণ্যের অন্তঃ-শীল ভক্তিঅশ্রুনীরে বিধৌত অন্তর মন্দিরের শুভ্র সিংহাসনে, প্রেম ও প্রসন্নতার গম্ভীরনির্ভর বাণীরূপে, নিত্য প্রবাহিনী নির্ঝরিণীর মত চিরবিরাজিত।

তাঁহ মহাপ্রভুর লৌকিক দেহের সৎকার, তথা দেহাবশেষ সংগৃহীত হওয়া সম্ভবপর না হইয়া থাকিলেও, সারাবিশ্ব তাঁহার পুণ্য স্মৃতি সৌরভে বন্দন, মনমোহন মর্ম্মর প্রতিমূর্ত্তি শোভিত ও বন্দনামুখরিত উপাসনা মন্দিরের সংখ্যা যেন অন্তহীন।

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ তনয় স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং :
রম্যা কচিদুপাসনা ব্রজবধূ বর্গেন কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতম্ প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

ব্রজনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আরাধ্য, শ্রীবৃন্দাবন তাঁহার ধাম,
ব্রজবধূ বর্গের আচরিত মধুর ভাবেই তাঁহার উপাসনা।
সাত্ত্বিক পুরাণ ভাগবতই শাস্ত্র, তাঁহার প্রতি প্রেমই পুরুষের সাধনীয়,
ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম আদরণীয় মত॥

লেখকের অনুলেখা

(৮) পৃষ্ঠার পর হইতে

শাস্ত্রজ্ঞানে মস্তিষ্কপুষ্ট পণ্ডিতবর্গের শুষ্ক হৃদয়ক্ষেত্রে ভগবৎ অভিনিবেশ অন্তর্হিত হইয়া, ব্যবহারিক-জীবনে তান্ত্রিক অভিচারের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল।

তৎকালীন হিন্দুগণের মানসিকতা এতদূর ভীরু ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, মোশলমান শাসক কর্তৃক দণ্ডিত হইবার ভয়ে, বহিরঙ্গ ধর্মানুষ্ঠানে অক্ষম জনগণ, প্রকাশ্যভাবে সমবেত কীর্ত্তন উৎসবাদি করিতে শঙ্কিত হইত। অধিকন্তু-উগ্র সাম্প্রদায়িক তাড়নায় ও কুসংস্কারের কালিমায় সমাজ জীবনে উদ্‌ভ্রান্তি ও অবক্ষয় ক্রমবর্দ্ধমান। পক্ষান্তরে বঙ্গের বাহিরে অহংসর্ব্বস্ব অদ্বৈতবাদের বিজয়কেতন ভক্তিধর্ম্মের ঐতিহ্য বিলুপ্তপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল। ভারতব্যাপী ধর্ম্মজীবনের তথা সমাজ জীবনের সেই নিদারুণ সঙ্কট সময়ে, নিরুপায় জনজীবনকে বেদবিহিত যুগধর্ম্মে প্রণোদিত করিয়া জীবের অন্তর্গত অজ্ঞানতার তিমিররূপ সামাজিক কলুষ ও ধর্ম্মের গ্লানি অপসারিত করিতে, করুণাবতার শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, বিধি নিষেধের জটিলতা-বিহীন, সকলের সহজে গ্রহণযোগ্য অশ্রুতপূর্ব্ব ভাবাত্মক প্রেমধর্ম্ম অর্থাৎ ভগবৎ নামজপ বা নামকীর্ত্তনের দ্বারা চিত্তশুদ্ধ করিয়া, ভক্তানুগ্রহকাতর ভগবানের সমীপবর্ত্তী হইবার পর সঙ্কেত মন্ত্র; সেই চির অনর্পিত অবদান অর্থাৎ বেদানুগ অথচ অশ্রুতপূর্ব আধ্যাত্মিক মতবাদ পরম শ্রদ্ধার সহিত, অদ্যাবধি অব্যাহতগতিতে সারা বিশ্বে প্রসারিত হইয়া সুসমৃদ্ধ

রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরে পত্রহীন পলাশবৃক্ষে রক্তরাঙ্গা পুষ্পের সমারোহ যেমন সহজেই আত্মহারা পথিকের সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তেমনি ত্রিতাপদগ্ধ সংসারে তাঁহার সর্ব্বত্যাগী জীবনের অলৌকিক ব্যক্তিত্ব প্রভাব ও করুণার বাণী তাঁহাদের বিমুগ্ধ অন্তরে এত অসামান্য অনুরাগ সঞ্চারিত করিয়াছিল যে, তদানীন্তন ভারতবিখ্যাত নৈয়ায়িক, উড়িষ্যার হিন্দু রাজার সভাপণ্ডিত — বাসুদেব সার্ব্বভৌম; দক্ষিণ প্রদেশের বিদগ্ধ রাজ্যপাল, বৈষ্ণবকবি রায় রামানন্দ; উত্তরভারতের বিশ্রুতকীর্ত্তি বৈদান্তিক প্রকাশানন্দ সরস্বতী; বাংলার দুর্দ্ধর্ষ নবাব হোসেন শাহের প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী প্রখ্যাত ভ্রাতৃদ্বয় রূপ, সনাতন; এবং বিরাট বিত্তশালী জমিদার পিতার তনয় লোকনাথ ও রঘুনাথ, মহাত্যাগব্রত গ্রহণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট পারমার্থিক আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৌপিন পরিহিত নবীন অরুণপ্রায় গৌরবর্ণ তনু, স্নিগ্ধদীপ্তি ঢালা চন্দন

চর্চিত ভাল, অধরে নয়নে প্রসন্ন সরল হাসি,—এই তরুণ তাপসের মধুর রহস্যময় প্রভুশক্তির মহান ইচ্ছারূপ অতীন্দ্রিয় বহ্নির অলৌকিক প্রভাবে জ্যোতির্ময় অন্তর, এমন অচিন্ত্যপূর্ব দিব্যজ্ঞান সমৃদ্ধ হইয়াছিল যে,—সেই অপ্রাকৃত অনুভবের গুঞ্জনে অনুক্ষণ গুঞ্জরিত তাঁহাদের প্রাণের কেন্দ্রকুহর হইতে অমিয় মন্দাকিনীর ন্যায় উচ্ছলিত সত্যের গৌরবদীপ্ত প্রদীপ্ত ভাষার মধুবর্ষী বিবৃতি,—বিবিধ সৎ গ্রন্থাদিতে অপার করুণার বাণীরূপে অভিব্যক্ত হইয়া, অদ্যাপিও বিদগ্ধ বিশ্ববাসীর সংশয় সন্দেহের কুহেলিকা উৎসারণ পূর্বক,—বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তকে, শতদলে বিকশিত ঊর্দ্ধমুখী স্নিগ্ধ পল্লব সরসিজের মত, প্রতিনিয়ত নন্দিত করিতেছে;—যেমন বসন্তবাতাস পুষ্পেপত্রে বিচিত্র বর্ণ আকীর্ণ করিয়া, তাহার অনুভববেদ্য গীতিলেখায় অনুপ্রাণিত, সংবেদনশীল অবচেতন মনকে, সুপ্তহৃদয়ের অতি গভীরে নিবদ্ধ কোন প্রিয়স্মৃতি অনুভাবনায় অলক্ষিতে অভিনন্দিত রাখে।

যাহা চেতনায় ব্রহ্মচৈতন্য সঞ্চারিত করে; মানসিকতাকে উদ্দীপ্ত করে, পরমার্থ লাভের পথে, রুচিকে জাগাইয়া তোলে, আত্মানুশীলনের অভিমুখে,—তাহাই শাশ্বতকালের সার্থক রচনা সম্ভার। করুণাবতার মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তাহারই সার্বকালিক বীজ বপন করিয়াছিলেন,—অনুগত অনুগামীগণের আলোকসাধারণ অন্তরক্ষেত্রে।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত অচিন্ত্য ভেদাভেদ মতবাদে, অর্থাৎ যিনি জীবের সহিত এক না হইয়াও, অচিন্ত্যরূপ এক। পক্ষান্তরে পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীবরূপে একই চৈতন্যশক্তির বহুধারূপে হইয়াও, এক নহেন,—সেই পরাৎপর বস্তুকে অন্তরের অনুভূতিতে উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার সহিত আত্যন্তিক সম্পর্কের অন্তহীন দৃঢ় যোগসূত্র স্থাপনের উপায় প্রাপ্তির পথে, কামনাহীন ভক্তির স্থান অতি উচ্চে শুদ্ধ ভক্তি বা ইষ্টের প্রতি পরম অনুরক্তিই পরাবিদ্যালাভের প্রকৃষ্ট পথ,—ইহাই মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত। কারণ গ্রীষ্মকালের উষ্ণবৃষ্টি ধারায় অভিসিক্ত ঊষর ধরণীর উর্বরতা লাভের মত, ভক্তিরস হৃদয়ে সঞ্জীবনীশক্তি প্রদাতা এবং সাধনার মেরুদণ্ডস্বরূপ; অন্তরের আনন্দ, প্রাণের আরাম, মনের বিশ্রাম। ভক্তিলেশ হীন জীবের সংসারজীবন,—সতত অবসাদে অবসন্ন, যেন স্রোতহীন অকল্যাণের উৎস; জীবনপথ,—লোভ আর অজ্ঞানতার অন্ধকূপে, বন্দী নিরালম্ব অন্ধকার সদৃশ। জীবনযাত্রা,—কলুর চোকঢাকা বলদের মত, বিরক্তির তিক্ততায় নিয়মমাফিক একইবৃত্তে অস্বস্তিকর অনবরত অনুগমনের অনুভূতিহীন অনুবৃত্তি।

স্বেচ্ছাকৃত অহং প্রভাবিত কর্ম মানসিকতাকে আসক্তির জালে জড়িত

করে এবং এই বন্ধনদশায় জাগতিক দহনজ্বালা হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায় না বলিয়া,— জীবনপথে নৈরাশ্যের আঁধার নামিয়া আসে। পক্ষান্তরে ভক্তিবাসিত কর্মে অহং-এর ভূমিকা বর্জিত থাকায়, ভগবৎ করুণা স্পর্শের অনুভূতি অনিবার্য্য সংসার যাতনার মধ্যেও মনকে অবসাদে অবসন্ন হইতে দেয় না, সঙ্কট অনায়াসে সরিয়া যায়, অন্তরে আসে ভরসার ভাব। কারণ কর্মের লক্ষ্য যখন নিজের স্বার্থসাধনে নিয়োজিত, তাহাই বন্ধনঅবস্থা এবং ভগবৎ উদ্দেশ্যে কর্ম অনুষ্ঠিত হইলেই, তাহা অবন্ধন। আসক্তির ধূমায়িত ভস্মরাশি হইতে, ঈশ্বর নির্ভরতার দিব্যবহ্নি আহরণ করিতে একনিষ্ঠ ভক্তিই উপযুক্তরূপে সার্থক উপায়।

জীবনপথ সকলের পক্ষে সমান নয় রুচি বিভিন্ন, সমস্যাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, পরিবেশ পৃথক। কিন্তু ইষ্টের প্রতি ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদনের ক্ষেত্রে, কোন মতবাদেই মত বৈষম্য নাই। ভক্তিমার্গই বিভিন্নভাবে বিভাবিত, একই পরম চেতনার প্রতি একত্রিত চিত্তে অগ্রসর হইবার সর্ববাদী সম্মত, সার্বজনীন সাধনপথ। মহাপ্রভু তাই — অনুগত জন আপামর সাধারণ এবং ভিন্ন ধর্মীকেও ভক্তিপথ অবলম্বনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ভক্তিবাদে ভগবানের সহিত আত্মিক আকর্ষণ নিবিড় করিবার চিন্তা সূত্র 'মধুররস',— যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিসাধনার শ্রেষ্ঠরস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এবং এই রসকে চেতনায় সতত সঞ্চরমান রাখিবার সুনির্দিষ্ট উপায় — উপাস্যবস্তুকে চিত্তের বিষয়ীভূত করিয়া, তৈলধারার ন্যায় প্রত্যয় প্রবাহে অহরহ তাঁহার নাম স্মরণ। অর্পিত অন্তরে আরাধ্যের অবিরত নাম গ্রহণ পূর্বক দীর্ঘকাল একস্থানে অবস্থিতিই উপাসনা বা ইষ্টদেবতার সমীপে উপবেশন। আত্যন্তিক জপসাধনাই জীবনস্বামীর নিকট আত্ম সমর্পণের আহুতি। অবিরাম নামজপের মধ্য দিয়াই অরূপ ভক্তহৃদয়ে লীলাভরে রূপায়িত হইয়া থাকেন, অসীম অন্তরে সীমাবদ্ধ হন। অবোধ শিশুর স্নেহভারে যেমন পিতা নত হয়, আত্মসমর্পিত ভক্তের আহ্বানে তেমনি বিশ্বপিতা প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্দের প্রারম্ভেই প্রতিপাদ্যরূপে বলা হইয়াছে,— শ্রীভগবান একমাত্র বাস্তববস্তু এবং জীবের অন্তর তাঁহার সহিত ভক্তিদ্বারা যুক্ত হইলেই তাপত্রয় উন্মূলন হয়। পক্ষান্তরে 'নরবপু তাঁহার স্বরূপ' বিধায় নিখিল বিশ্বের মানবহৃদয়ে তাঁহাকে জানিবার, তাঁহার সামীপ্যে উপনীত হইবার অভীপ্সা সমানধর্মী জীবের স্বভাবধর্ম। যেমন তরলজলের বরফে

পরিণত হওয়া শৈত্যাধিক্য জনিত আকস্মিক সৃষ্ট বিকার বা নিসর্গ,— তেমনি ভগবৎ বিমুখতারূপ সাময়িক মানসিক বিকার, পারিপার্শ্বিক প্রভাবিত মনের আগন্তুক অবস্থা — স্বভাবগত বা নিত্যধর্ম নহে। সুতরাং অধরাকে ধরিবার, অবিজ্ঞেয়কে জ্ঞানের সীমানায় আনিবার, বিশ্বপতিকে আপন করিয়া পাইবার, অলভ্যকে লাভ করিবার যে প্রচ্ছন্ন আন্তরিক আকুতি — তাহা জীব মাত্রেরই সহজাত ধর্ম।

যেহেতু পরমার্থ স্বরূপ পরমেশ্বর, স্বরূপতঃ আনন্দ রসময় এবং আনন্দের স্বাভাবিক ধর্ম আনন্দময়তার অভিব্যক্তি অপরের অন্তরে প্রসারিত করিয়া দেওয়া, —তাই সচ্চিদানন্দব্রহ্ম চিৎ সত্তায় যেরূপ পরমানন্দ স্বরূপে বিরাজিত, স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট চিদ্রূপ জীব, যাহাতে স্বীয়প্রচেষ্টায় সেইরূপ শুদ্ধসত্য চিদানন্দরূপে অবভাসিত হইতে অব্যবহিত হয় তাহাই সৃষ্টিকর্তার ঐশী অভিলাষ পক্ষান্তরে সদা সন্তপ্ত সংসারেও সহসা যে রম্য অনুভূতির সাড়া জাগে, যাতনাদগ্ধ জীবনকেও রমণীয় বোধ হয়, ধৌতশ্যামল আলোঝলমল বনগিরি পর্বতের নৈসর্গিক শোভা, চিত্তকে মুগ্ধ করে,— তাহা বিশ্বমাঝে পরিব্যাপ্ত আনন্দময়ের সতত অধিষ্ঠানের বহিঃপ্রকাশ হইলেও জন্মমুহূর্ত হইতেই বিষয়াদির সতত সংশ্লিষ্ট জীব মায়াশক্তি প্রভাবে, বিশ্বলীলা বৈচিত্র্যের এই অলক্ষ্য অধীশ্বর তথা রসময় অন্তর্যামীকে বিস্মৃত হইয়া পড়ে।

মোহাভিভূত মনের এই অবাঞ্ছিত মালিন্য বা অবিদ্যাচ্ছন্ন আত্মবিস্মৃতি অপসারিত করিয়া, চিত্তবৃত্তিকে পারমার্থিক পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাখিবার গৌণ-ভাবনায় — ধর্মসংহিতা সমূহে অধিকারী ভেদে বিবিধ বিধিব্যবস্থা বিদ্যমান। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিরূপিত মহানাম নির্বিচারে সকলের পক্ষেই গ্রহণে বাধা নাই। পরন্তু এই মহামন্ত্র অনুশীলনে আনন্দঘনময় বিগ্রহ শ্রীভগবানের সহিত প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয় — যাহা প্রায় পঞ্চশতবর্ষ ব্যাপী অসংখ্য ভক্তিপ্রাণ নরনারীর অভ্রান্ত আত্মিক অভিজ্ঞতার অসংশয় আলোকে প্রতিবোধিত। ইষ্টের প্রতি শরণাগতির সম্বন্ধ স্থাপন ব্যতীত, পরমপদের অন্বেষণ দুরাশা মাত্র।

সাধারণ বিজ্ঞান নানাবিধ অজ্ঞাত তথ্য উদ্ভাবন দ্বারা ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ প্রদান করে —যাহা প্রায়শঃ ভোগবিলাস বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। অপরদিকে মন্ত্রশক্তি অন্তরে প্রসুপ্ত ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্য উদ্বোধিত করিয়া, ভোগবাসনা প্রশমনে প্রণোদিত করে। অধিকন্তু মন্ত্রগুণ প্রভাবে মাজ্জিত নির্মল চিত্ত অন্তরদেবতার সহিত সহজে সংযুক্ত হইয়া থাকে,— যেমন বিমোচিত লৌহখণ্ডই চুম্বক সংলগ্ন হয়। অন্তরে নিত্য বিরাজমান আত্ম-

বন্ধুর সহিত আত্মবৎ যোগসাধন হইলেই, অলৌকিক আনন্দের আত্মপ্রসাদে জীবন নিবিড় সুধায় ভরিয়া যায়। পরন্তু যিনি আনন্দময় ও জ্ঞানস্বরূপ, জীবের ধ্যেয় বস্তু, দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায় বা কাষ্ঠে অগ্নির ন্যায়, দেহেন্দ্রিয়াদিতে সতত অনুস্যূত রহিয়াছেন এবং ইন্দ্রিয়াদির অভিব্যঞ্জক চিত্তেই চেতনারূপে যাঁহার বিশেষ প্রকাশ,— সেই পরম ব্রহ্মপুরুষ প্রসন্ন চিত্ত সুনির্মল হৃদয়াকাশে প্রকাশিত ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন।

সংসার নির্লিপ্ত, কলুষকামনা বিরহিত পবিত্র অন্তর পরাবিদ্যার প্রশস্ত আধার গণ্য হওয়ায়, সর্ববিদ্যার উৎস শ্রীভগবান সেই হৃদয় কন্দরে সর্বদা স্ফুরিত হইয়া থাকেন। কারণ পবিত্রিত স্বচ্ছ চিত্তরূপ অন্তরদর্পণে বিশ্বব্যাপী বিরাজিত বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরূপ অবশ্যই প্রতিবিম্বিত হইবে — যেমন পরিষ্কৃত আয়নায় সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হয় অন্তরমন্দিরে অন্তরদেবতা প্রকাশিত হইলেই সর্বপাপ নাশ হয়,— যে প্রকার সূর্য্যের উদয়ে কুহেলিকা অপসারিত হইয়া থাকে তাই সাধনার প্রাথমিক সোপান — চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিতে, 'হরিনাম' অনুশীলনকেই সর্বোত্তম উপায় বলিয়া মহাপ্রভু 'নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই মন্ত্রধ্যানে অন্তরিন্দ্রিয় ক্রমশঃ প্রক্ষালিত হইয়া এমন এক অপরূপ গভীর নির্ভর নির্ভীক আনন্দের চেতনাভূমিতে আরূঢ় হয় যে,— আস্পৃহার তীব্র সংবেগে দেহেন্দ্রিয়াদি পর্যন্ত প্রাণবন্ত ও রসনিবিড় হইয়া চিত্ত অন্তরপুরুষের সদা সান্নিধ্য অনুভব করে এবং পরম চেতনার সহিত ব্যক্তিচেতনার সংযোগ স্থাপনই জীবনসাধনার মূলনীতি

জগতে জাত হইয়াই কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ মদ, মাৎসর্য্য প্রভাবিত পরিবেশে সামাজিক বিধিব্যবস্থা অনুযায়ী নবজাতকের জাগতিক জীবনের যাত্রা আরম্ভ যাহা প্রায়শঃ জন্মান্তরীণ সংস্কারের অনুগামী হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ত্যাগ, মহত্ত্ব, ধৈর্য্য, ইন্দ্রিয়সংযমে অভ্যস্ত হইবার পরিমণ্ডলে, শাস্ত্রীয়অনুশাসন অনুসারে চেতনাকে জগদতীত সত্ত্বার অভিমুখীন করাই, পারমার্থিক জীবনের যাত্রাশুরু যাহা পুরুষকার প্রয়োগে অধিকৃত করিতে হয়। কারণ সর্বপ্রাণীর আত্মার আত্মীয়, বিশ্বলীলায় রত বিশ্বাত্মার সহিত বাহ্যিক বাহুল্যে বিভ্রান্ত, সতত চঞ্চল মনের যে আত্মিক বিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়া রহিয়াছে, প্রাণহীন যদৃচ্ছা প্রবৃত্ত পথে তাহার পুনরপি মিলন সম্ভবপর নয়,— যেহেতু সেই প্রচেষ্টা প্রায়শঃ উৎপথগামী হইবার উপক্রম হয়। তাই সংসার মোহাভিভূত মর্ত্ত্যের মানবকে অসৎ পথ হইতে নিবৃত্ত, তথা সৎপথে প্রবৃত্ত করিতে, আপনি আচরিত, শাস্ত্রপ্রমাণ সিদ্ধ, যুগোপযোগী ধর্মসাধনার কর্ত্তব্য পথ প্রদর্শন পূর্বক, মানবাত্মাকে ঊর্দ্ধায়নের অভিমুখে

অভিনিবিষ্ট রাখিবার অভিপ্রায়ে, অসীমের অধিপতি সীমার মাঝে ইহলোকে, অবতার বা অবতারকল্প দেবমানবরূপে, অবতীর্ণ হইয়া থাকেন

স্বধর্মাচরণের আটটি উপায় বেদে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে,— জপ, উপাসনা, অধ্যয়ন সত্যবাক্য, সন্তোষ, দান, ক্ষমা, লোভশূন্যতা। অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত যেই পন্থা আশ্রয় করিলে, সংসারগতি নিবৃত্ত হয়, সর্বজীবের কল্যাণ হয়, আন্তর উদ্ভাসনের মধ্য দিয়া অন্তর হয় অন্তর্মুখী, অতি মানস চেতনার বিকাশে আসক্তির আবেশ শিথিল হইয়া আসে, ভাগবতীর ভাব প্রকাশ অন্তঃকরণে পরিতৃপ্তি বিরাজ করে, অর্জ্জিত অর্থের সম্যক সাহবয় লাভ হয়.—তাহাই শাস্ত্র সুগত ধর্মপথ।

বেদবিহিত সেই আদর্শের অপার অনুশীলনায় যখন বিভ্রান্তি দেখা দেয়, অনাচার ও কদাচারের কলুষিত প্রভাবে, পঙ্গু ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে, সনাতন ধর্ম, স্বেচ্ছাচারের আতিশয্যে আচ্ছাদিত হয়, ভক্তিমার্গ, যথার্থ গ্রহীতার অভাবে বেদের অনুশাসন হারাইয়া গিয়া, ভগবৎ কেন্দ্রিক সভ্যতা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, জগতে জড় অসাম্য বিস্তার লাভ করে— ধর্ম জীবনের সেই সঙ্কটময় প্রয়োজন সময়েই, মানবজাতিকে সম্যকরূপে ভগবৎ চেতনার পথে পরিচালিত করিয়া ধর্মের অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করিতে,— বিশ্বপতির প্রচ্ছন্নরূপে ধরায় আবির্ভাবের লগ্ন হয়, আসন্ন।

সমগ্র ভারতভূমি যখন রাজন্যবর্গের পরস্পর বিরোধীতায় খণ্ড, ছিন্ন বিক্ষিপ্ত, পাশ্চাত্যের উন্নততর জীবনযাত্রার নবজাগরণ প্রভাব, ভারতীয় ভাবুক জনগণকেও ইহসর্বস্ব জড়বাদের প্রতি উৎসুক দৃষ্টির অপ্রতিহত আবেগে আকৃষ্ট করিতে উদ্যত, পুথির প্রাচীর ঘের দুর্ভেদ্য বিদ্যার দুর্গবাসী জ্ঞানগর্ব্বী পণ্ডিতগণ কেবল বিমূঢ় বিতর্কে ব্যতিব্যস্ত, বিদ্বেষ ব্যাধি-ক্ষয়িত ও ঝঞ্জাক্ষুব্ধ অনুদার সমাজনীতির বক্র পথে সুযোগসন্ধানী বৈদেশিক ধর্মীয় অনুচরগণ নিঃশব্দচরণে সমাজজীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, সুকৌশলে নিজ ধর্মমত প্রতিষ্ঠায় অতি তৎপর, রাজশক্তি প্রভাবিত প্রবোচনা প্রয়োগে এবং ঐতিহ্য বিস্মৃত ধর্মধ্বজী যাজকগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সামাজিক কঠোরতায় পরিতাপ জর্জ্জর নিম্নবর্ণের জনগোষ্ঠী, দলে দলে ধর্মান্তরিত হইতে প্রলুব্ধ, বৈদিক সভ্যতার সহনশীলতা ও উদার মনোভাব, উচ্চবর্ণের ঐশ্বর্য্যশালীদের ব্যবহারিক জীবনে ক্রমেই অপহৃত, মানসিকতায় সাম্য, শান্তি ও প্রীতির মনোবৃত্তি পদে পদে অন্তর্হিত, ভগবৎ অভিনিবেশের সনাতন পথ, বিবিধ বাহ্যিক আড়ম্বর ও লৌকিক অনুষ্ঠানের অন্তহীন মনোগত প্রাকারে পরিবেষ্টিত, তামসিক তমিস্রায় আচ্ছন্ন সমাজজীবনে, ভক্তিধর্ম বিলুপ্তপ্রায়, ধর্ম

বিকৃতির বন্যাস্রোতে অমৃতময় জীবনলাভের অনুচিকীর্ষা একেবারেই অবলুপ্ত, ভেদবুদ্ধির পঙ্কিলতার আবর্তে, জনজীবন সদা বিঘূর্ণিত, নদীগর্ভে নিমগ্ন ব্যক্তির ভাসমান মৃতদেহ আশ্রয়ে তীরে আসিবার চেষ্টার ন্যায়, তাপত্রয়ে নিমজ্জিত জীবনিচয় উদ্ধারের আশায়, প্রাণহীন উদ্ভট ক্রিয়াকলাপ আশ্রিত, পুরুষ প্রকৃতি সমাজপতিদের নিপটকপট মানসিকতার উন্মার্গ বিধান, অনাদরে অপপ্রয়োগের অবিরত আশঙ্কায় অবহেলিত সমাজস্তর সদা শশঙ্কিত, ভক্তিপ্রাণ নরনারীগণ আপনাপন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের প্রতিকূলতায় কিং কর্তব্যবিমূঢ়, আত্মপ্রচারে পর্যবসিত পারিবারিক মৎসরবাদিতে, চিত্ত দীপ্তহীন, সদাচার সমস্যা সঙ্কুল,—

লোকাচার সর্বস্ব, অনুদার, ভক্তিরহিত বিবিধরূপে বিপর্যস্ত সমাজের দুর্লক্ষ্য ধর্ম বিপ্লবের সেই দুর্যোগময় পরিবেশের মহা যুগসন্ধিক্ষণে — দেবদ্যুতিতে ভাস্বর, করুণা কিরণ বিকচ নয়ন প্রেমভক্তির রসঘন বিগ্রহ, প্রসন্নদীপ্তিতে সমুদ্ভাসিত সুগৌরতনু, পেলব কুসুম কান্তিসদৃশ দিব্যমূর্তি, শ্রীচৈতন্যদেব, গভীর আঁকাবাঁকা গতিতে প্রবাহিত সৌন্দর্যময়ী গঙ্গাতীর বর্তী অঞ্চল গৌরবঙ্গের অঙ্গনতলে অনাড়ম্বর অথচ আধ্যাত্মিক বহ্নিতেজে আলোকজ্জ্বল সর্বাত্মক মহৎ গৌড়ীয় প্রেমধর্ম প্রবর্তন করিয়া প্রদীপ্ত মহিমার বিরল সংযত সর্বোত্তম শাস্ত্রবাক্যের উদার আশ্বাসে অনিন্দিত নন্দন লোকের গম্ভীর নির্ভয় বার্তা ঘোষণায় বলিয়াছিলেন,— ধর্মের ধ্রুবভূমিতে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সমান আসনের অধিকারী।

সর্ব সংস্কারের আবেশমুক্ত সুসংহত অথচ বলিষ্ঠ, তাঁহার নবপ্রবর্তিত নিগূঢ় জীবনরসে সরস বিশ্বজন কল্যাণের জ্যোতিস্নাত এই অশ্রুতপূর্ব অভি-নব নববিধান,— উন্নতঅনুন্নত, ধনীদরিদ্র বিদ্বানমূঢ় সকলশ্রেণীর মর্মমূলে প্রাণের নিঃশ্বাস বায়ুর মত, মৌন মাধুর্যধারায় প্রসারিত করিবার প্রতিজ্ঞা কঠিন দৃঢ়সঙ্কল্পে, অপ্রাকৃত অনুরাগরূপ বৈরাগ্যের স্তব্ধব্যকুলতায় আনন্দবেদনার অন্তঃশীলা অশ্রুজলের নীরবনীরে পুণ্যপ্রেমের প্রতীতি চিরগৌরব সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের অব্যবহিত পরেই—নিঃসঙ্গ নিঃসম্বল দণ্ড কমণ্ডলুধারী, উদ্বেলিত স্নেহোদীপ্ত, নিরভিমান, রিক্তভূষণ, সর্বত্যাগী, সীমাহীন লাবণ্যের গম্ভীর কোমল পরিব্রাজকরূপে,— একাগ্র সাধনার অদম্য নিষ্ঠায়, অক্লান্ত অধ্যবসায়ের অসীমধৈর্যে, অকুণ্ঠ আশার দুর্জয় আশ্বাসে,—ছয় বৎসর কালব্যাপী সচল উত্তুঙ্গ বনস্পতির মত, প্রচ্ছন্ন তপস্যার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে,— অকর্মণ্য বিদ্যা-মানী ভক্তিহীন মূঢ়বিজ্ঞ দাম্ভিকের, অক্ষম ঈর্ষাপ্রবণ বিস্ময় বিস্ফারিত নিষ্প্রভ আত্মকেন্দ্রিক চিত্তকে ভগবদ্ভক্তির অলৌকিক বিমল আলোকে

উদ্ভাসিত করিতে করিতে, আনন্দোচ্ছল স্বচ্ছতার স্নেহমিশ্রিত গভীর বিশ্বাসে—তপনতপ্ত মাঠপ্রান্তর ও বনানীতে আড়াল আকাশের পথচিহ্নহীন দুর্লক্ষ্য সঙ্কট সঙ্কুল অরণ্যবীথির নির্জন যাত্রাপথে, নিঃশঙ্ক চরণের শ্রান্তিক্লান্তিহীন পদব্রজে,—সমগ্র ভারতের বিশিষ্ট ধর্মচর্চা কেন্দ্রসমূহ, মনোরম ঔদাসীন্যের বেদনাভরা প্রসন্নতায় পর্যটন করিয়া,—নির্লিপ্ত নির্মল হৃদয়ের নিবিড় অন্তরঙ্গতার সুমধুর মাধুর্যময় অনুরাগের পরাগপুঞ্জে, সর্বত্রই অপরাজেয়, প্রতিরোধ্য, অপ্রকৃত সুধাবর্ষী শক্তিমত্তার সর্বোন্নত পরিচয় প্রকাশের নির্ভীক মহিমাগৌরবে,—সংসার ধূলি জালে আকীর্ণ ধাত্রীর অপরপারে স্বর্গীয় উচ্ছ্বাস রসে ভরা, পরিপূর্ণ চৈতন্যের অনির্বচনীয় আনন্দময় নবজীবন প্রাপ্তির বিচিত্রমধুর অভয়বার্তারূপ যুগান্তর নব অর্থে ভরা, সকল তর্কের অতীত স্বকীয় অভ্রান্ত শাস্ত্র সিদ্ধান্তের শ্রেষ্ঠতার পরাকাষ্ঠা, নূতনতর ভাষ্য গৌরবে প্রতিপন্নপূর্বক,—সংসারমোহ অন্ধ, যুগধর্মের মলিনমেঘে দৃষ্টি সমাচ্ছন্ন, আত্মবিস্মৃত জাতির বহির্মুখীনতারূপ, সুপ্তির তিমির যবনিকা অপসারিত করিয়া, নিশ্চল অন্তঃপ্রকৃতির মানসতরঙ্গতলে, দিব্যজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান ভগবৎ পরিমণ্ডিত অতীন্দ্রিয় মহিমময় মাহাত্ম্যসমুজ্জ্বল যেই স্নেহসিক্ত ভাবরসের প্রশান্ত প্রস্রবণ, সেই জাতীয় মহান ঐক্যের অব্যক্ত মঞ্জীর গুঞ্জন মিলনমধুর স্বর্গীয় শান্তিবাণীর অমৃত নির্ঝর প্রবাহিত করিয়াছিলেন,—সেই রসঘন অনুভূতির মহনীয় প্রভাব, প্রাচ্যদিগন্তের সাহিত্য সঙ্গীত, চিত্র শিল্প প্রভৃতি প্রাদেশিক সংস্কৃতিসমূহ পর্যন্ত ভক্তিধর্মের আনুকূল্যে প্রভাবিত হইয়া, বিদগ্ধ প্রতিভার প্রচার মাধ্যমে, সর্বস্তরের জনমানসের দিব্যপ্রেম তরঙ্গিত, সংশয় কুহেলিকামুক্ত প্রাণকেন্দ্রকে, অপরিম্লান আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য বিলসিত জয়ধ্বনিময় ঐশ্বরিক ভাবপ্রবাহ সম্পাতে অদ্যাপিও উর্মিমুখর করিয়া তুলিতেছে যেমন শীতের কুয়াশায় আচ্ছন্ন বনানী, বসন্ত সূর্য্যের রসময় সৃষ্টিধর্মী শক্তির আলোকধারায় উদ্দীপ্ত হইয়া সগৌরবে জাগিয়া উঠে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আধ্যাত্মিক ভাবধারার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য,—স্বধর্মাচরণ কেবল পারত্রিক অভীষ্টলাভের উপায় নয়; কিংবা ঐহিক সুখসম্পদ ও সম্ভ্রম প্রাপ্তির হেতু নহে। অধ্যাত্ম অভিনিবেশে মনের নির্মলতা সম্পাদন করিয়া চারিত্রিক প্রকর্ষ, তথা মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনও জৈবধর্মের অন্তর্গত। তাই তরুণ বয়সে 'নিমাই পণ্ডিত' নামে অধ্যাপনাকালে, বিদ্যার্থীগণকে আত্মবিদ্যা বিষয়ে বিশেষ অবহিত করিতে, প্রাত্যহিক শিক্ষাদানের সমারম্ভে, প্রাসঙ্গিক উপদেশ প্রদানে বলিতেন,—

"জীবিতকাল পদ্মপত্রে পতিত জলবিন্দুর ন্যায় নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী;

প্রতিপত্তি জলাশয়ে চন্দ্রের প্রতিচ্ছায়ার মত চঞ্চল, সুখভোগ হেমন্তকালের তালবৃক্ষের ছায়াসদৃশ অত্যল্পকাল স্থিতিশীল, বাতাহত দীপের মতন প্রাণ-প্রদীপ কখন নির্বাপিত হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই; তদুপরি জীবন অজ্ঞানতার আশ্রয়, মনের অপব্যবহারে সংসারপথে উদ্বেগ অশান্তির উপদ্রব অব্যাহত। তাই সংসার মোহ অতিক্রম করিতে এবং মানবজীবনের উদ্দেশ্য অবগত হইতে, সর্বদা সাধুসঙ্গ প্রয়োজন।

"যাঁহার নিকটে বসিলে শুভচিন্তার জাগরণ হইয়া অন্তরে ভক্তিভাব উদ্দীপ্ত হয়,— তিনিই যথার্থ মহাজন বা প্রকৃত সাধুব্যক্তি। ভক্তিই ভগবানকে অনুরাগে আকর্ষণ করিবার অদৃশ্যরজ্জু এবং সাধুগণ ভক্তের সহিত ভগবানের ভাববন্ধনের অযাচিত, অথচ অনিবার্য্য সহায়। কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ না হইলে, সাধু অনুগমনে ফলপ্রাপ্তি ঘটে না,— যেমন মধুলুব্ধ ভ্রমর বহু ভ্রমণ করিয়া পদ্মমধু আহরণে রত থাকিলেও, পৃথক প্রবৃত্তি বশতঃ ভেক পদ্মবনে বাস করিয়াও, পদ্মের মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারে না।

"মানবশরীরধারী ব্যষ্টি আত্মা যখন ভগবানের বহুত্বের মধ্যে নিত্যধামে ব্যক্তিকৃত সচ্চিদানন্দস্বরূপটি ভক্তি প্রীতির অভিনিবেশে বরণ করিয়া, সেই আরাধ্যকে পরমপিতা পরমমাতা, পরমবন্ধু কিংবা পরমপতি জ্ঞানে তাঁহার আনুগত্যে অবস্থানের আন্তরিক অভিলাষ পোষণ করে — তাহা 'দ্বৈতবাদ' ভাবিত ভক্তি ধর্মের শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ইহাতে বাসনার নির্বাসন নাই, আবার কামনার উদ্দামতাও নাই। ইহা বিষয় ভাবনার মধ্যেই বিশুদ্ধ বৈরাগ্যের স্থির স্থিতিতে অবস্থিতি।

"যেহেতু কার্য্য কখনও কারণকে অতিক্রম করিতে না তাই কার্য্য লুপ্ত হইলে তাহা কারণে পর্য্যবসিত হয়,—যেমন মৃত্তিকাদ্বারা প্রস্তুত মৃণ্ময় মূর্ত্তি জলসিক্ত হইয়া পুনরায় মৃত্তিকায় পরিণত হয়। অনুরূপভাবে ঈশ্বর অংশ সৃষ্ট, ব্রহ্মরূপ কারণের কার্য্য জীব — ভক্তিরস স্নাত হইলে দেহবন্ধন বিনির্মুক্ত হইয়া চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্তিতে, ব্রহ্মসান্নিধ্যে উপনীত হয়। যদিও সর্বকারণ কারণ ও নাশের অতীত, ব্রহ্মের কোন রূপভেদ নাই,—তথাপি বিবিধ অদ্ভুত লীলার আধার, তথা অনির্বচনীয় বস্তু বলিয়া ভক্তিসহায়ে সমীপবর্ত্তী অবিনাশী জীব, অপ্রাকৃত সুখময় অবস্থা প্রাপ্তির অলৌকিক আনন্দ অনুভবের নিবিড় প্রেমে, নিজেকে সেই আনন্দস্বরূপ সত্তার সহিত অভেদ জ্ঞান করে,— ইহাই ভক্তিসেবিত দ্বৈতবাদ সিদ্ধান্ত।

"শ্রীগীতার সর্বশেষ অধ্যায়ে বিশেষ ভগবদুক্তি রহিয়াছে,— ভগবদ্গত কিন্তু সর্বতোভাবে শরণাগত ভক্তই ভগবৎ অনুগ্রহে সনাতন অক্ষয় স্থান প্রাপ্ত

হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে, তৃতীয়অধ্যায়ের অষ্টম সূত্রে দৃঢ়তার সহিত বলা হইয়াছে —অবিদ্যারূপ অজ্ঞান তমিস্রের অতীত ব্রহ্মধামে বিরাজিত জ্যোতির্ময় পরমপুরুষকে ভক্তি প্রভাবে বিজ্ঞাত হইয়া মরণশীল জীব জন্মমৃত্যুদ্বারা আকীর্ণ সংসারগতির কবল হইতে চিরমুক্তি লাভ করে,- -ইহার দ্বিতীয় উপায় নাই।

"জলাশয় যেমন সর্বপ্রাণীর প্রাণরক্ষক ভগবান তেমনি জীবের জীবন ধারক। আপন স্বভাবেই দেহের মধ্য দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসাদির ক্রিয়া নির্বাহ হইবার ন্যায় বিশ্বেশ্বরের বিশ্বলীলা আপনার ছন্দে জীবের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিলসিত। মানব অন্তরে নিজেকে সমর্পণ করিয়াই বিশ্বপতি আপনাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন সজীব নীরোগ দেহেই যেমন শ্বাসাদি কার্য্য যথানুরূপ ক্রিয়াশীল তেমনি ভক্তিরসস্নিগ্ধ ভগবদগত চিত্তেই ভক্তবৎসল ভগবানের লীলামাধুর্য্য যথার্থরূপে অভিব্যক্ত। তাই ঈশ্বরে পরম অনুরক্তিরূপ চিত্তের শুদ্ধাবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়াকেই চৈতন্যস্বরূপের সদৃশতাপ্রাপ্তি কিংবা চিত্তের ভগবৎ অভিমুখীন বৃত্তি বলা হয়।

"ঈশ্বরিক ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইবার প্রয়াসে অন্তরিন্দ্রিয়কে অন্তরাদেবতার প্রণিধানে নির্মল করিয়া সর্বভাবের সদয়স্থ পরমপুরুষের সার্থক প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করাই মানবজীবনের শ্রেয়ঃ সাধনা। যে ব্যক্তি এই অভীষ্ট সিদ্ধিতে সমর্থ তিনি শ্রেষ্ঠ সাধকরূপে পরিগণিত। অতএব দেহেন্দ্রিয়াদির পরিচালক পরমারাধ্য পরমপুরুষ আমাদের দেহের কর্মশক্তি প্রাণের জীবনীশক্তি বুদ্ধির বিচারশক্তি মনের ধারণাশক্তি তাঁহার কল্যাণইচ্ছা বিকাশের অভিমুখীন রাখিয়া স্বপথে পরিচালিত করুন, সতত করিতে থাকুন, অন্তরের এইরূপ আন্তরিক আগ্রহের আত্মিক অনুসরণই, পরমার্থ লাভের প্রতি, ভক্তি পথে পদক্ষেপ।

"শ্রীভগবানই পরমগতি, নিরতিশয় আনন্দের উৎস. নির্ভরযোগ্য আশ্রয় —এই অধ্যাত্ম অনুজ্ঞার অনুধাবনায়, জাগতিক ব্যাপারে জড়িত মনকে ভগবৎ করুণা স্পর্শ লাভের প্রতি উন্মুখ রাখিবার, আভ্যন্তরীণ অনলস অনুশীলনের অধ্যবসায়ই যথাবৎ 'তপস্যা বা জীবনের তপঃসাধনা। এই তপশ্চর্য্যা বা ঈশ্বরানুভূতির উদ্যম নিরন্তর বহমান রাখিতে,— প্রতি প্রভাতে ও সন্ধ্যায় অন্তরের নিভৃতধ্যানে সম্যক নিজেকে, সেই সর্বতোব্যাপ্ত অন্তর্যামীর অভিমুখে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। তবেই ভগবৎ প্রসন্নতার প্রভাব, সকল চিন্তায় পরিব্যাপ্ত হইয়া, সর্বকর্মে ব্রহ্মকৃপা বিকীর্ণ হইতে থাকিবে। মন তখন পবিত্র হইবে, বুদ্ধি সুস্থির, অন্তর নির্মল, বিষয়ভাবনা মনকে কোনমতেই বিশীর্ণ করিবে না।

"দিবারাত্রির সন্ধিকালই সন্ধ্যা এবং তৎকালীন উপাসনা বা উপাস্য-মন্ত্র জপকেই তাই সন্ধ্যাকরা' বলা হয় যতকিছু বহির্মুখী ভাবনাদ্বারা জীবন সদা সঞ্চিত ধ্যানসমাহিত হইয়া তাহা ভেদ করিতে সচেতন হওয়াই 'সন্ধ্যাবন্দনা'। প্রভাতের অনাবিল আলোকে ধরণী যখন স্নিগ্ধভাব ধারণ করে, আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণ আলোয় সর্বত্র প্রশান্তি প্রকাশ পায়,— প্রফুল্ল অন্তর সেই প্রশস্ত সময়ে অন্তর্যামীর ভাবনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। বিদ্যার্থীগণ তাই প্রাতঃ ও সায়াহ্নে পবিত্রতাকাঙ্খিণী বেদমাতা গায়ত্রীকে অবশ্য ধ্যান করিবে। তবেই কর্ম ও সংস্কারে ভগবৎ কৃপানন্দের বিকশিত পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া, সমস্ত দিবসের যথার্থ পাথেয় সঞ্চিত হইবে।

"ধীশক্তির পরিচালক, দীপ্তিমান সবিতার [illegible] জ্যোতি 'সাবিত্রী-মন্ত্রে' ধ্যান করিলে অন্তরলোক জ্যোতির্ময় হইয়া নিষ্পাপ ও পবিত্র হয়। এই প্রক্রিয়াই বৈদিক 'সন্ধ্যা উপাসনা'। একই দেহের বিভিন্ন অংশ, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে যেমন সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরই বিবিধ প্রকাশ,— তদ্রূপ এক একটি পার্থিব পদার্থের পৃথক অধিষ্ঠাতারূপে, বেদে বর্ণিত দেবতাসমূহ পর-ব্রহ্মেরই স্বতন্ত্রভাবে অভিব্যক্তি বলিয়া, জ্যোতিসাধনা কিংবা প্রতীকউপা-সনাও, প্রকারান্তরে সেই অদ্বিতীয় তৎপুরুষেরই আনুপূর্ব আরাধনা।

"ভগবান ব্রহ্মরূপে সর্বত্র বিরাজিত, জীব তাঁহারই আশ্রিত স্বতন্ত্রসত্তা,— যেমন সূর্য্য ও কিরণ, ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। সূর্য্যদেব জ্বলিত জ্বলন, জীব যেন স্ফুলিঙ্গের কণা। ইন্ধন সহায়ে ক্ষুদ্র অগ্নির বৃহৎ হইবার ন্যায়, সাধনাদ্বারা জীব ব্রহ্মসদৃশ হইতে পারে। যে ব্যক্তি ভক্তিভরে অনুক্ষণ পরম-ব্রহ্মের ভাবনা করে, তাঁহাকে হৃদয়ে সতত প্রতিষ্ঠিত রাখে,—সেইজন ব্রহ্ম কৃপালাভে আনন্দময় ব্রহ্মরূপে রূপান্তর লাভ করিবে, ইহাতে সংশয়ের অব-কাশ নাই। ভগবৎ বিষয়ে ঐকান্তিক আগ্রহই 'ভক্তি।'

"তাপত্রয়ে প্রপীড়িত, দুঃসহদ্বন্দ্বে দোলায়িত ও সর্বত্র মৃত্যুছায়া পরিকীর্ণ নশ্বরজীবন, নিরতিশয় দুঃখময়। ইহজীবনের কখন অন্ত হইবে, তাহার কোনই নিশ্চয়তা নাই। জীবনমরণসাথী বিশ্বপতিকে বিস্মৃত অবস্থায় দেহান্ত হইলে, পুনরায় যাতনাময় সংসার পরিবেশে জন্মলাভ ঘটে; এবং বিষয়ান্তরে গতিহীন চিত্তে, পরমপুরুষ স্মরণে কলেবর পরিত্যাগ করিলে, জীবাত্মার দিব্যলোকে গতিলাভ হয়,—এই তত্ত্ব শ্রীগীতার অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চমশ্লোকে নির্দ্ধারিত। তাই সকলকাজে, সমস্তচিন্তায়, সমগ্রনিজেকে সর্বক্ষণ সেই সর্বশেষ আশ্রয়ের দিকে পরিচালিত রাখিতে হইবে,—যেন কখনও তাঁহার বিস্মরণ না ঘটে।

"সূর্য্যচন্দ্রের নিয়মানুবর্তিতা; জন্মমৃত্যু রহস্য; অণুপরমাণুর জটিলতা;

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ জগতে অনির্বচনীয় বিস্ময়, উদ্ভিদের ধারাবাহিকতা; বিভিন্ন প্রাণীর দেহনির্মাণ কৌশল, জঠরের আশ্চর্য্য গঠন প্রণালী, প্রভৃতি বিস্ময়কর বিষয় অনুধাবনায় ইহার একজন পরিচালক স্বীকার করিতে হয়,— যিনি জলবায়ুঅগ্নি ফলফুলশস্য বস্তুসমূহের বিন্যাস করিয়া রাখিয়াছেন। জড়, উদ্ভিদ, প্রাণী ইত্যাদি বিভিন্ন শিরোনামে সেই বিশ্বপুরুষের পরিব্যাপ্তি। এই বিশ্বচেতনের অস্তিত্বের স্পন্দনেই জগৎ ক্রিয়াশীল। মানবচৈতন্যের চেতনা দাতা এই চৈতন্যপুরুষকে সর্বক্ষণ চিন্তায় ধরিয়া রাখিতে হইবে — ইহাই জীবজীবনের প্রকৃষ্ট সাধনা

"উপনিষদসমূহে এই পরমপুরুষকে অনাদি, অজয়, অমর, অভয়, অমৃতস্বরূপ বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে তিনি রূপরস গন্ধস্পর্শাত্মক জগতের অতীত হইয়াও, ইহাতে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত, অব্যক্ত, অচিন্ত্য অক্ষয়, জন্মাদি বিকারশূন্য হইয়াও, জরামরণশীল জীবদেহে সদা সন্নিবিষ্ট, নিত্য সর্বগামী হইয়াও, অসীম, সর্বভূতের কারণ হইয়াও, স্বয়ং অকারণ, সর্বব্যাপী হইয়াও, অন্যের দ্বারা ব্যক্ত নহেন। ক্ষুদ্র ও মহান হইয়াও, যুগপৎ স্বরূপ ও বিশ্বরূপ, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় অধিপতি হইয়াও, সর্বভূতের হৃদিস্থিত পরমাত্মা পরন্তু তিনি ভক্তিদ্বারা বশীভূত, সকল প্রাণীর সর্বসময়ের উপকারী সুহৃদ্।

"সর্বশক্তির উৎস, শক্তিমান যিনি,—জড় ও চেতন সেই শক্তির প্রকাশ। যেমন তাপ ও আলো প্রকাশিত করিয়াও, অগ্নির ন্যূনতা ঘটে না, সেইরূপ কারণরূপ ব্রহ্ম হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উদ্গত হইলেও, পরব্রহ্ম পূর্ণই থাকেন। একই অগ্নি যেমন স্বীয় অভিব্যঞ্জক কাষ্ঠাদিতে স্থাপিত হইলে, সেই দাহ্যবস্তুর প্রকার অনুযায়ী বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়,— সেইরূপ এই অদ্বিতীয় বিশ্বাত্মা, বিশ্বপুরুষ,— জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ,— এই চতুর্ব্বিধ প্রাণীবর্গের অন্তরে অনুক্ষণ অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া, লীলাবশে অনুরূপ বিষয়ভোগ করা কালীন, বহুরূপে প্রতীয়মান হন।

"গন্ধদ্রব্যবৎ আশ্রিত দেহস্পর্শে তাহা আমোদিত বা ক্রিয়াগুণ সম্পন্ন করিয়াও, চিৎস্বরূপের জ্ঞানালোকে বিশ্বময় বিস্তৃত তিনি। বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপে সকল প্রাণীর আত্মার অন্তরাত্মা, সর্বভূতের নিবাস, সমস্ত জীবের আশ্রয়তত্ত্ব। ভগবৎস্বরূপে তিনি পুরুষোত্তম এবং ভক্তের হৃদয়বল্লভ। তাঁহাকে পরমতম চেতনার অনুভবে জানিতে পারা যায়। সর্বক্ষণ অনুধ্যানে অন্তর তাঁহার সহিত যুক্ত হইলে, অমৃতত্ব লাভের আশ্বাসে মৃত্যুভীতি দূর হয়। কারণ তখন এই নিশ্চল বিশ্বাসে মন ভরিয়া থাকে যে, জীবনযাত্রা

অবসানে জীবচৈতন্যের পরমানন্দ লোকেই গতিলাভ হইবে,—যেমন দিনের কর্মাবসানে গৃহী কর্মক্ষেত্র হইতে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তনের নিশ্চিন্ত প্রত্যাশায় থাকে, কিংবা কার্য্যব্যপদেশে বিদেশে বাস রত প্রবাসী যথাকালে আপন আবাসে প্রত্যাগমনের নিশ্চয় অভিলাষ পোষণ করে।

"ভগবান মূর্ত্তিতেই মাত্র থাকেন না এবং তাঁহার অবস্থান কাষ্ঠ বা শিলাখণ্ডেই সীমিত নয়। আব্রহ্ম স্তম্ভপর্য্যন্ত সর্বত্র সেই বিশ্বপুরুষের অধিষ্ঠান। তবে বিশ্বপতির অবস্থিতির বিশেষ প্রকাশ ভক্তের মনোভাবে। সুতরাং যাহা চেতনাকে সুস্থ করে, মানসিকতাকে পরিচালিত রাখে, পারমার্থিক পথে-সেই আত্মনিষ্ঠভাবই প্রার্থনীয় কারণ চরাচর বিকারীবস্তু সমূহ সমস্তই বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর দ্বারা আচ্ছন্ন রহিয়াছে এই প্রত্যয়িত ভাবনার অনুধাবনায় সংসারই মুখ্য হইয়া পড়ে না, অন্তর তখন বাস্তব জগতের ঊর্দ্ধে আত্মানুভূতির পরিপোষক অপার্থিব আনন্দময় ভাবলোকে বিচরণ করে। তাই অন্তঃকরণ শুদ্ধির উপায়ে ভাগবতীয় ভাব ব্যতীত অপর কোন ভাবনার বিষয় দ্বারা প্রভাবিত না হওয়াই 'শুচিতা'

"নরোত্তমনর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা সর্বদা স্মরণে রাখিবে। তিনি পবিত্রের মধ্যেও পরমপবিত্র, পুণ্যের মধ্যে ও পরমপুণ্য মঙ্গলের মধ্যেও পরমমঙ্গল। বেদবিহিত মন্ত্রে, মুগ্ধমনের ধ্যানাবিস্তৃত চিত্তে তাঁহার আনন্দমূর্ত্তিকে পরাণ বল্লভরূপে বরণ করিয়া, অন্তরের অন্তরে ভজনা করিলে সর্বেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইয়া, জীবনে মঙ্গল আলোকের আবির্ভাব ঘটে, তাঁহার কোমলকান্ত চরণ-পল্লবের অনুক্ষ্যস্পর্শে অন্তর পবিত্র হয়। অর্থভাবনা পূর্বক যাহার মননদ্বারা জগৎ রহস্যের উপলব্ধিতে অভীষ্টের প্রতি মনের অভিনিবেশ হইয়া সংসারবন্ধন হইতে ত্রাণলাভ ঘটে,—তাহাই 'মন্ত্র' এবং মন্ত্রোক্ত দেবতার ভাবনাই 'ধ্যান'। ধ্যানদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান স্ফুরিত হয়।

"মন্ত্রবল উজ্জীবিত রাখিতে, সদা সত্যকথা বলিবে, স্বাধ্যায় হইতে বিরত রহিবে না; পিতামাতাকে ভক্তি করিবে, আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকিবে, আচার আচরণে মার্জ্জিত ও রুচিশীল হইবে, লোভের বশবর্ত্তীতে স্বার্থপর হইবে না; দুর্জন সংসর্গ পরিহার করিয়া চলিবে,—তবেই জাগ্রত মন্ত্রশক্তি পরাজ্ঞান প্রকাশিত করিয়া, অন্তরদেবতার প্রতি মনকে অভিনিবিষ্ট রাখিবে এবং জীবনের সার্থক পাথেয় সংস্কারে সঞ্চিত হইয়া, কর্মে ঐশ্বরিক ইচ্ছার বিকশিত পরিচয় পরিস্ফুট হইবে।

"জগতে মানুষ হইয়া জন্মলাভ করিলেও পরাভক্তি বা পরমার্থতত্ত্বের উপলব্ধি দুর্লভ,—যাহা ভগবৎকৃপা সাপেক্ষ এবং সতত স্মরণরূপ আরা-

ধনার দ্বারাই কৃপাশক্তি আবাহন করিতে হয়। তাই ব্রহ্মণ্যদেবকে বিস্মৃত না হওয়াই বেদের উপদেশ। কিন্তু ঐশ্বরিক অনুগ্রহ নির্ভর করে, কিরূপ ভাবের অনুসরণে তাঁহাকে ভাবনা করা হইতেছে, তাঁহার উপর। তাই বিষয়ের সহিত কোন কারণে বিচ্ছেদ ঘটিলেই, তাহাকে বিষয়ে বীতরাগ বুঝায় না বিষয়াদিতে ব্যাপৃত থাকিয়াও যিনি বৈষয়িক ব্যাপারে উদাসীন অথচ অন্তর্যামীর প্রতি অনুরাগে অনুরক্ত হইয়া সর্ব কর্মফলস্পৃহা, তথা কর্মের ভাবনাও তাঁহাকেই সমর্পিত — তিনিই প্রকৃত বিষয়ত্যাগী ও অন্তরদেবতার সহিত নিত্যযুক্ত তাই আসক্তির প্রদীপ্ত বহ্নিতে বাস করিয়াও, অন্তরপ্রদীপের ভগবৎ নির্ভরতারূপ শিখাটিকে আবিলতামুক্ত রাখিতে হইবে,—যেন নিত্য-ব্রহ্মের প্রতি উন্মুক্ত চিত্ত সদা প্রসন্নজ্যোতিতে প্রদীপ্ত থাকে।

"সকল সম্প্রদায়েই কালক্রমে কিছু অনিষ্টকর ভ্রান্ত কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটিলেও সারবস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে — তাহাই সতর্ক সচেতনতায় সংগ্রহ করা বিধেয়। কারণ আপনবেগে বিভিন্নপথে গতিপ্রাপ্ত আঞ্চলিক নানা নামে নির্দ্দেশিত, নদীসমূহের উৎসস্থল পৃথকস্থানে অবস্থিত হইলেও, প্রত্যেকটির গন্তব্যস্থল যেমন অসীম মহাসাগর,— তেমনি বহুবিধ নামে অভিহিত এক অখণ্ড পরমব্রহ্মই সব সাধনার লক্ষ্যভূমি,— যদিও স্থানকাল পারিপার্শ্বিকতার উপযোগী ভেদে সাধনপদ্ধতির প্রচলন নানা প্রকার।

"শ্রীগীতার চতুর্থ সপ্তম ও নবমঅধ্যায়ে, ভগবদুক্তি এইরূপ,—যেকোন ভাব অবলম্বনে ভগবদভিমুখীন হইলেও ভগবান সেইভাবেই অনুগ্রহ করিয়া আধ্যাত্মিক চরিতার্থলাভের পথে পরিচালিত করেন। তিনি ভক্তানুগ্রহ-কাতর, জীবের বাঞ্ছাপূরণকারী, কিন্তু আত্মার অধোগতি হয়, এইরূপ প্রার্থনা তিনি মঞ্জুর করেন না। তাই কোনরূপ ঐহিক প্রার্থনা করিতে নাই। কারণ আত্মসমর্পিত ভক্তের সকল দায় ও বেদনার ভার, তিনি নিজে বহন করেন,—ইহা শ্রীগীতায় প্রতিপাদিত। সুতরাং উন্নততর জীবনে উত্তীর্ণ হইবার সুনিশ্চিত বিশ্বাসকে বিচলিত হইতে না দিয়া, অন্তর্যামীর প্রতি সম্যকরূপে সমর্পিত থাকিয়া, সৃষ্টির নন্দিত উল্লাসরূপ স্বীয় জীবনের আনন্দ-বেদনাকে আত্মিক দৃষ্টিতে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিয়া, সংসারপথে চলাই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

"রাত্রিকাল যেমন নিদ্রার জন্য নিরূপিত, মধ্যাহ্নের অনবকাশ কর্ম-ব্যস্ততার অবসানে, অপরাহ্নবেলা শ্রান্তি অপনোদনের অবসর, সমগ্রদিবসের ক্লান্তধৈর্য্য প্রতীক্ষার পর, সায়াহ্ন-আত্মিক অনুধাবনার উপযুক্ত সময়,— প্রভাতকাল তেমনি সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য আহ্নিককর্ম সমাপনান্তে পাঠ-

শিক্ষায় জন্য নির্দ্ধারিত। কারণ ছাত্রগণের অধ্যয়নই তপস্যা বা অভীষ্টলাভের প্রতি মন ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতা সম্পাদন। কিন্তু আত্মজ্ঞানাভিলাষী চিত্তে বিনীতভাবে শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণের সমীপে গমন করিয়া,— শব্দস্পর্শ রূপরস গন্ধ বিহীন, অক্ষয়শাশ্বত, অনাদিঅনন্ত, পরমকূটস্থনিত্য, "পরতত্ত্ব' অবগত হওয়াই সার্থক বিদ্যালাভ,— যাহা সঞ্চিত জ্ঞান' রূপে পার্থিব জগতের অভিজ্ঞতার সংস্কারে আহিত হইয়া জন্মান্তরেও দিব্যজীবন লাভের পথে, জীবনসঙ্গী হয়। পক্ষান্তরে ব্রহ্মবিদ্যালাভে উৎসুক কল্যাণকারীর ইহজীবনেও কোন দুর্গতি ঘটে না, কারণ পুণ্যের পদপরশ তাদের প্রতি অর্পিত থাকে।

"পরাবিদ্যা আয়ত্ত জন্য অন্তরক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে প্রতি প্রত্যুষে বিদ্যাভ্যাসের প্রাক্কালে, একটি দৃঢ় ও অনবচ্ছিন্ন অনুভবের অভিনিবেশের অন্তরে অনুস্যূত অন্তর্য্যামী পরমাত্মার অনুধ্যান অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তিরই প্রকাশ, তেমনি যাঁহার আশ্রয় প্রসাদে জীবাত্মা ক্রিয়াশীল হইয়া অন্তঃকরণ সহায়ে রূপরসাদি জানে,— সূক্ষ্মদেহাশ্রয়ী সেই অন্তরাত্মার আত্মাই জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা। বহির্ম্মুখী মন ও ইন্দ্রিয় বর্গকে আত্মাভিমুখী একাগ্রতারূপ তপস্যায় উদ্ভূত সূক্ষ্মবুদ্ধি নির্ভরে, তাহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা যায়, যেমন কাষ্ঠমধ্যগত অথচ অদৃশ্য অগ্নির স্বরূপ ঘর্ষণদ্বারা কাষ্ঠ হইতেই গৃহীত হয়।

"গন্তব্যস্থানে উপনীত হইবার অভিলাষে যেমন কষ্টকর হইলেও চলার পথ পরিহার করা চলে না, এবং বিজ্ঞলোকের অভিমত অনুসারে চলিলে, সরাসরী অভিপ্রেত স্থানে পৌঁছানযায়,—তেমনি অভীষ্টধাম গমনেচ্ছু অমৃত-লোকপথ অনুসন্ধান তৎপর ভগবদ্ভক্তের পক্ষে এই কর্মভূমি, তথা সাধনক্ষেত্র-রূপ সংসার যাত্রাপথ, স্বেচ্ছাঘটিত নানা দায়িত্বে অবরুদ্ধ দুর্গম হইলেও উপেক্ষাভরে পরিত্যাগ করা অনুচিত এবং মহাজনগণের নির্দ্দেশিত সংসার দায়িত্ব প্রভৃতি সাধনপথ অনুসরণই বিধেয়। তবেই পরিক্লিষ্ট জীবনের ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতা কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

"মৃদু মন্দবায়ে নরবল্লী পল্লবচ্যুত, চূতমুকুল সুবাস, যেমন নিদাঘের আতপ্ত বাতাস সুরভিত করে,—সেইরূপ শ্রীশুকদেব মুখ নিঃসৃত সমস্ত বেদের সারভূত, অধ্যাত্মদীপ স্বরূপ, অসাধারণ প্রভাবশালী, কল্পবৃক্ষের সেই অমৃতফল শ্রীমদ্ভাগবত, সংসার তাপদগ্ধ জীবনে নিরবধি পরমামৃত সিঞ্চন করিয়া চলিয়াছে, সেই রসময় ভাগবত কথামৃত অবশ্যই আস্বাদন করিবে; যাহা শুনিলেই মঙ্গল হয় এবং যে ইহা শোনায়, তার মত বহুদাতা আর জগতে নাই।

"সর্বমঙ্গলময় পরমেশ্বর সর্বত্র সর্বাবস্থায় সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন,—এই শাশ্বত শাস্ত্রবাক্য স্মৃতিতে সতত সঞ্জীবীত রাখিয়া, নিজকৃত কর্ম দ্বারা অপরের পীড়ার কারণ না হইয়া আপন ক্ষমতায় অর্জিত, বিধিনির্দিষ্ট যথাপ্রাপ্ত উপকরণ, আসক্তিরহিত ভাবে,—অর্থাৎ বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, ভগবৎ অনুসস্মরণে বা আত্মানুভূতি অবলম্বনে, গ্রহণ পূর্বক, উপভোক করাই উপনিষদের, উপদেশ, তথা বেদের নির্দেশ এবং আমারও অভিপ্রায়। এইরূপ মত ও পথ যেন তোমাদের জীবনপথে অনুকরণীয় শ্রেষ্ঠ আদর্শ হয়—ইহাই আমার আশীর্বাদ।

অতঃপর মাত্র চব্বিশবৎসর বয়সে সর্বপ্রকার ঐহিককামনা পরিহার করিয়া, ত্রিদণ্ডীসন্ন্যাসীরূপে অর্থাৎ কায়মনবাক্যে ভগবৎ আরাধনায় দণ্ডিত করিয়া,—সঙ্কীর্ণতা ও লোকাচারের অন্তরালে ফল্গুধারারন্যায় প্রবহমান, সার্বভৌম অধ্যাত্ম সাধনার মত ও পথ পুনঃ সংস্থাপনে ব্রতী হইয়া—হিন্দুধর্ম তথা ভাবগ্রাহী বৈষ্ণবমতবাদের যেই অভূতপূর্ব উজ্জীবন আনয়ন করিয়াছিলেন,—সর্বসংস্কারমুক্ত ও বাহ্যকৃচ্ছ্র সাধনবিহীন, সেই পরম রমণীয় সন্দেশ তথা অনাথশরণ ভগবানকে অন্তরে আবাহন করিয়া মনুষ্যত্ববিকাশের পথে ভাবরসে সিঞ্চিত উন্নত প্রেমধর্ম বিচিত্র ছলনাজালে আকীর্ণ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের কলরব মুখরিত, অতি আধুনিকযুগের বিশ্বসমাজে সভ্যতার পুণ্যবাণীরূপে সগৌরবে সমাদৃত

বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদগণের দৃষ্টিতে—তিনি যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্মসংস্থাপক, মহৎ সমাজসংস্কারক ও সাম্যনীতির উদার প্রচারকরূপে পরিগণিত। ঐতিহাসিকগণের মতে, তৎকালীন হিংসাবিদ্বেষে সঙ্কীর্ণতর সমাজজীবনের পরিমণ্ডলে,—সকলকেই মৈত্রের দৃষ্টিতে দেখা জীবের ধর্ম,—শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তীত এই উদার মতবাদের অভ্যুদয় না হইলে, ক্রমশঃ আরও অনেক হিন্দু ধর্মত্যাগ করিত।

তাই যুগসন্ধির কালোত্তর পরম সত্যদ্রষ্টা তিনি, দ্বিধাবিভক্ত বাঙ্গালী সমাজের সমন্বয় বিধানকারী মহত্তম অধিনায়ক। আবেগাত্মক ভক্তিসাধনার মধ্যদিয়া দেহেমনে, জ্ঞানেকর্মে, অন্তরেবাহিরে, চলনেবলনে,—জীবনদেবতাকে সর্বতোভাবে আবৃত রাখিবার অভিনব পন্থা প্রচারক, বিধর্মী শাসক চাঁদকাজীর অসঙ্গত আদেশ প্রত্যাহৃত করাইবার উপলক্ষ্যে সমবেত অহিংস অভিযান আন্দোলনের আদি উদ্ভাবক, নিবেদিত প্রসাদান্নে স্পর্শদোষ নাই,—এই শ্রুতিবাক্য প্রমাণে, উৎসবাদিতে পঙ্‌ক্তিভোজনের বিধান প্রবর্ত্তনদ্বারা সামাজিকতায় অনায়াসে অস্পৃশ্যতা ও বর্ণভেদ প্রথা নিরাকরণ প্রচেষ্টার প্রথম পথপ্রদর্শক, সাধনার অঙ্গ হিসাবে সম্মিলিত সঙ্কীর্ত্তন প্রচলন করিয়া,

সমাজজীবনের সর্বস্তরে পরস্পরের মধ্যে সহজে সদ্ভাব সঞ্চারণ তথা অবাধ মেলামেশার সুযোগ আত্মিক সংযোগরক্ষার যুগধর্ম স্রষ্টা, যুগান্তরপুরুষ তিনি

মানবমনকে ঊর্দ্ধমুখী গতিশীল রাখিবার জন্য, ভক্তিধর্মই নিয়ামক শক্তি এবং মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বাধিক কল্যাণকর অনুশীলনের বিষয়, আধ্যাত্মিকতা,—শ্রীমন মহাপ্রভুর এই অমিয় বাণীবৈভবের অন্তপ্রেরণায় প্রাণা-দিত কতশত রচয়িতা তাঁহাদের কাব্যসাহিত্য গীতকীর্তন রচনা দ্বারা জীবের পারমার্থিক কল্যাণ, তথা বিষাদমগ্ন অন্তরকে মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে জ্যোতিষ্মান করিয়া মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ জীবনের [illegible] গ্লানির অবসাদ অপনয়ন করিতেছে যাহা চৈতন্যভাবক 'গৌড়ীয়বৈষ্ণব' নামে অভিহিত ভক্তিবাদী মাত্রই অবহিত তাই ভারতীয় সংস্কৃতিতে বাঙ্গালীর সুপরিস্ফুট বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ ভাবাত্মক ধর্মীয় যুগান্তর আনয়নকারী তথা বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে ভগবৎমুখী অন্তঃপ্রেরণা সঞ্চারিত সর্বপ্রধান করিবার কেন্দ্রপুরুষ তিনি

বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় মনের দৃঢ়তা কর্মে কুশলতা ও জ্ঞানচর্চায় নিপুণতা কিন্তু আশা ও হতাশা সুনাম ও দুর্নাম, ভোগ ও দুর্ভোগ ব্যর্থতা ও সাফল্য, প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী ভাবাবেগ জড়িত জীবনসংগ্রামে বিজ্ঞান-প্রদত্ত প্রকৃতির বৈভবকে কেবল সুখসমৃদ্ধি — আরাম আয়াসে নিয়োজিত রাখিবার ফলে, ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভোগস্পৃহা প্রাধান্য লাভের প্রাবল্য অতীব আরও বিত্তশালী হইবার প্রবণতা —অমৃতলোকপথ অনুসন্ধানকে ব্যর্থমনোরথ অক্ষমের নিষ্ফল বাসনাবিলাস বোধে পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে বস্তুতঃ সঙ্কীর্ণ অধিকারে সঙ্কুচিত জীবনের পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য অনর্থ অনুভবের দ্বারা, বাক্য ও মনের অগোচর সর্বেশ্বর বিশ্বপতিকে জ্ঞাত হওয়া সম্ভবপর না হইলেও জীবনে ভগবৎ মহিমার অলৌকিক প্রকাশ অস্বীকার করা অনুচিত কারণ কেবলমাত্র অতীন্দ্রিয় শক্তিদ্বারাই সেই পরমসত্য উপলব্ধি করা যায় — যাহা কামনাবিহীন সাধনা সাপেক্ষ। অনাদি দুর্বাসনা কর্তৃক বিষয়াদিতে আকৃষ্ট চিত্তকে বৈষয়িক ভাবনা হইতে নিবারিত করিয়া, আত্মবিষয়ে একাগ্র করিবার সরল শিক্ষাবিধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহৎ কীর্তি।

জাগতিক সুখে সঞ্চিত হয় ভোগবিলাস বাসনা। ভোগের দৃষ্টিতে ভগবানকে জানা যায় না। ভোগী সংসারসুখ বঞ্চিত হইবার ভয়ে ভীত, ত্যাগী ভোগসুখ পরিহার করিয়াও পরিতুষ্ট। কারণ পরমতৃপ্তিলাভের উপায় তাহার করায়ত্ত ; অমৃতধামের পথ নয়ন সম্মুখে। পক্ষান্তরে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ, ত্যাগের আনন্দ অনন্তের অনুসঙ্গী। অসীমের

অধিপতিকে সদা হৃদয়কন্দরে সন্নিবিষ্ট জ্ঞানে তাঁহারই ইচ্ছার অনুবর্ত্তনে অনাসক্তভাবেকৃতকর্মপথে অঙ্কুরিত হয় ধর্মজ্ঞানের অঙ্কুর ; বিবেক বিকশিত হয়। পূত বৈরাগ্যের পবিত্রপথেই ভগবানকে জানিতে বুঝিতে ও তাহাতে অনুপ্রবেশ করিতে পারা যায়। পুরাণপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব এই বৈরাগ্যবিদ্যার প্রকাশক, যাঁহা সকলের পক্ষেই সহজে অধিগত করা সম্ভব। বস্তুতঃ যাহার বিশ্বপতির সহিত যুক্ত থাকার যুক্তগ্রাহ্য ব্যাকুলতা নাই, অথচ বহুবিদ্যায় পারদর্শী, তাহার পক্ষে প্রেমধর্মের গূঢ় মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিলাভ সুদূর পরাহত,—যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুরই বক্রোক্তি।

জীবিতকাল নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, যেমন পান্থশালায় আগন্তুক পথিকের সাময়িক অবস্থান, পুনরায় পথযাত্রা আরম্ভের অপেক্ষায়। অধিকন্তু রোগ-শোক, অনুশোচনা উদ্বেগে জীবনযাত্রা অবিরতই অনুতপ্ত। তদুপরি জীবনের সহিত ছায়ার মত মৃত্যুদূত সাথেই চলিতেছে, কখন কাহার ডাক আসিবে, তাহার কোনই নিশ্চয়তা নাই। যদিও সকল লোককেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, তাই নিশ্চিত বিষয়ে হয়ত সন্তাপ করা অনুচিত,—তথাপি এই চলমান জীবন কাহার প্রয়োজনীয় ইচ্ছার কারণে,—তাহাবিদিত হইবার উপায় অনুচিন্তনের আবশ্যকতা রহিয়াছে।

যদিও বিশ্বপতির মতিগতি অনুধাবনের বুদ্ধি, তিনি মরণশীল মানবকে প্রদান করেন নাই, তথাপি সেই অনির্বচনীয় প্রণালীতে দূরবীক্ষণেরও দুর্নিরীক্ষ্য মানবজীবনবিন্দুর, ধৃতি, মেধা, স্মৃতি ক্ষমা প্রভৃতি সদগুণ সমন্বিত হইয়া, সুখদুঃখ, হাসিকান্নায় আবর্ত্তিত, এই ধরার বুকে জন্মলাভে কতনা বিচিত্রভাবে বিচরণ করিয়া, অবশেষে চির বিলুপ্তি,—প্রশান্তচিত্তে তাহার আনুপূর্বিক পর্যালোচনায়, অবশ্যই প্রতীয়মান হয়, এই মরজীবন, কোন অজানা'বাকে অমরজীবনেরই প্রস্তুতিপর্ব। তাই অনিবার্য্য সংসারদুঃখ ভোগই জীবজীবনের শেষকথা নয়, দেখিতে হইবে, সেই বেদনাবোধের মধ্যদিয়া, বিশ্বনাথ অনাদি বহির্মুখ মানব মনকে তাঁহার প্রতি উন্মুখ করিয়া তুলিতে ছেন কিনা। তাই শাস্ত্রমুখে তাঁহারই ব্যবস্থাপনা মত, নির্বিচারে পরমাত্মা পরমেশ্বরের প্রতি মুক্ত চিত্তে যুক্ত থাকাই পন্থা। তবেই সংসার জীবন পরমগতিপথে পরিচালিত হইতে থাকিবে। কর্মক্লান্ত দিবসের শেষে রাত্রি যেমন বিশ্রামের অবকাশ আনিয়া দেয় ; রাত্রির প্রহর প্রদান করে স্থিতির সুযোগ,- ভগবৎ ভাবনায় দিন যাপন করিলে, জীবলীলা অবসানে চিন্ময় দেহ প্রাপ্তিতে তেমনি জীবাত্মার গতিলাভ হয়,-দিব্যধামের অভিমুখে, আনন্দময় নিকেতনে। সুতরাং মৃত্যু পথে প্রধাবিত এই নশ্বর জীবনেই

অবিনশ্বরকে অন্তরে চির প্রতিষ্ঠিত করিয়া আত্মাকে সতত উর্দ্ধমুখী রাখিবার প্রয়াসই সঙ্গত, সংগ্রহ করা উচিত পরজীবনের পাথেয়।

এই প্রসঙ্গে স্বতঃসিদ্ধ জিজ্ঞাসা সহজেই জাগরিত হয় —এইরূপ আয়াস কিরূপ অনুশীলনের অধ্যবসায়ে অধিগত হয়? ইহাই ধর্মাচরণের প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণের আগ্রহ কিংবা ধর্মজিজ্ঞাসা যেহেতু ধর্মসাধনার প্রধান উদ্দেশ্য. জীবনেশ্বরকে কায়মনবাক্যে ধরিয়া থাকা —তাই ভক্তিহীন উপাসনায় কিংবা নিষ্ঠাহীন উপবাসে, অথবা চিত্তহীন ব্রতপালনে তাহার সম্যক সমাধান হয় না, অধরাকে অন্তরে ধরা যায় না এইভাবে ধর্মপথে চলা অর্থহীন পরানুকরণে পর্য্যবসিত হয়। কারণ ইহা চিরাচরিত অভ্যাসের অনুবর্ত্তন অথবা অভীষ্টলাভের প্রাথমিক প্রচেষ্টা মাত্র।

দীপপ্রভা যেমন সূর্য্যপ্রভায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে তেমনি ব্যষ্টিজীবের চৈতন্যসত্তা ব্রহ্মচৈতন্যকে প্রকাশ করিতে পারে না। পরন্তু বিভুর প্রভাবে নিজেই অভিভূত থাকে। পক্ষান্তরে অপরিষ্কৃত দর্পণে যেমন কোন দ্রব্যের প্রকৃত প্রতিবিম্ব পড়ে না তেমনি ভগবৎ ভাবনাহীন অসংস্কৃত চিত্তে ব্রহ্মজ্যোতি সমুচিত প্রতিফলিত হয় না স্বার্থব্যাপারে নিরন্তর জড়িত জগতের বিড়ম্বনায় এবং মৃত্যুভাবনায় যখন সতত সন্তপ্ত অনিত্য জগতের ক্ষণস্থায়ী সুখ সম্ভোগের প্রতি সাময়িক বিতৃষ্ণা আসে, মরণাতীত জীবন সম্পর্কে জানিবার কৌতুহল জাগে; জগতাতীত বস্তুকে লাভের লালসা হয় —তখন অন্তরে যে আর্ত্তির আবির্ভাব ঘটে তাহাই ইষ্টের প্রতি পরম অনুরক্তি বা ভক্তি। একমাত্র ভক্তিপথই ভগবানকে প্রিয়ভাবে বরণ করিয়া তাঁহাকে চিরন্তন হৃদয়ের ধনরূপে লাভ করিবার সুনিশ্চিত উপায়।

কামনাবিরহিত জাহ্নবীধারা যেমন অবিচল নিয়মে সাগর অভিমুখে সতত ধাবিত সেইরূপ ফলানুসন্ধানশূন্য অব্যবহিত চিত্ত যখন অচেতন আবেগে অনুক্ষণ ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকে,—তখনই মধ্যাহ্নের উত্তাপ অবসৃত হইয়া চেতনায় প্রশান্তি আসিবার ন্যায়, ভক্তের ভগবান, আর্ত্তের আশ্বাসদাতারূপে মৃত্যুময় সংসারসাগরে পতিত শরণাগত ভক্তকে অচিরাৎ উদ্ধার করিবার অভিলাষে, তাহার অন্তরকে ঐশী আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া এমন 'স্থির বুদ্ধিযোগ' প্রদান করেন, যাহাতে সেই অতীন্দ্রিয় বস্তুকে অপরোক্ষ অনুভবে বিদিত হইয়া, তাঁহাকে আপন আত্মার পরম আত্মীয়রূপ একাত্ম বোধের প্রত্যয়ে, ভগবদ্গত চিত্তে পরমপথের পাথেয় আহরণে সচেষ্ট হইতে সক্ষম হয়, এবং করুণাপূর্বক এই কলিযুগে অবতীর্ণ, শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব উপদিষ্ট সতত সমুজ্জ্বল সহজ সাধনসঙ্কেত, অর্থাৎ সকল সাংসারিক চিন্তা মন হইতে

সরাইয়া নিরবকাশ ভগবৎ অনুধ্যানে নিযুক্ত থাকিবার ঐকান্তিক প্রযত্নই, মুক্তসঙ্গ হইয়া পরাগতি লাভের পথে চলিবার পরমসহায়,— লোকপরম্পরায় যাহার মহিমা প্রচার অধুনা সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত।

যেইরূপ ভাবনাকামনার বশবর্ত্তী হইয়া, ব্যক্তি বিশেষের কলেবর পরিত্যাগ হয়, তাহার সেইরূপ ভোগের যোগ্য দেহলাভে পুনরায় সুখী কিংবা দুঃখী, ধর্ম্মাত্মা অথবা পাপাত্মা গৃহে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ জন্য, সুস্থ কিংবা রুগ্নদেহ অবলম্বনে জন্মলাভ হয়। কঠোপনিষদের প্রথমঅধ্যায়ের দ্বিতীয়বল্লীতে বিশেষ উল্লেখ রহিয়াছে,—সংসারে আসক্তচিত্ত এবং ভ্রমনমোহে সমাচ্ছন্ন অবিবেকীর নিকট পরলোক সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রতিভাত না হওয়ায়, দৃশ্যমান এই ভোগায়তন লোকই আছে, পরলোক নাই —এইরূপ ভাবনাবশে দেহত্যাগ ঘটিয়া বারংবার দুঃখময় সংসারক্ষেত্রে জন্মলাভ করিতে হয়

যেই অসামান্য কারণে বর্ত্তমান জীবন বিশেষ কোন পরিবারে, এই বিশিষ্ট দেহধারণ করিয়া প্রকাশিত হইয়া কর্মচঞ্চল, তাহা ইহজন্মেই আরম্ভ হইয়া মৃত্যুতে নিঃশেষ হইয়া যায় না — কর্মসংস্কার আবার বিভিন্ন পরিবেশে নূতনদেহ পরিগ্রহণ করায়। ভাগবতীয় ভাবনার অভিসিক্ত মনে দেহত্যাগ হইলে ত্রিতাপজ্বালা জড়িত জগতে পুনরাবর্ত্তন হয় না। নির্বাণকালে চিত্তকে পারমার্থিক চিন্তায় নিযুক্ত রাখিবার যেই সহজসাধ্য উপায় মহাপ্রভু নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহার অবলম্বনে ইহজীবনেই পরমশান্তি এবং পরজীবনে পরমপদ প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী হয়,— যাহা মহাজনগণের উপলব্ধির আলোকে স্বীকৃত।

জগৎ যেমন সতত পরিবর্দ্ধনশীল, মানবজীবনও নিয়ত ঘাতপ্রতিঘাতে তেমনি অস্থির, লোকচরিত্রও বিচিত্র, সংসারে সমস্যারও অন্তনাই। তাই কাহারও পক্ষেই স্বভাব স্থির থাকে না, পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে তাহা প্রায়শ, পরিবর্ত্তিত হয়, বদলায়। এবং ব্যক্তিবিশেষের বাল্য, কৈশোর, যুবক ও প্রৌঢ়ত্বের উৎকর্ষাপকর্ষ বা চরিত্রের চেহারা অধিকাংশক্ষেত্রেই আলাদা প্রতীয়মান হয়। যেহেতু কালস্রোতে একই ব্যক্তিরজীবনের মধ্যদিয়া প্রবহমান, তাই প্রাক্তনজন্ম সংস্কারের খাত দেহাকৃতির পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও প্রায়শঃ অবিকৃত থাকে। তথাপি পরিবেশ, পরিবার, পরিজন, শিক্ষার প্রভাবও ব্যক্তিগত জীবনে বিভিন্নরূপে প্রতিফলিত হয়। এতদ্ব্যতীত আদর্শ বা ব্যক্তিত্বের প্রেরণাবশেও কেহ পৃথকচরিত্র বনিয়াযায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, মহাপ্রভুর আশ্বাসবাণী এইযে, হেলায় বা শ্রদ্ধায় যদি অবিরত

হরিনাম করা হয়, তবে সুদুরাচারীরও মানসিক বিবর্ত্তন হইয়া রুচিকে জাগাইয়া তোলে পরমার্থ চিন্তায় করুনাময় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অন্তর নিবেদিত হইয়া যায় চিত্ত হয় চির নিশ্চিন্ত।

ইহাও অনুধাবনীয় যে, সূর্য্যদেব সকলক্ষেত্রেই সমানভাবে কিরন বিকিরণ করিলেও, সরাসরি কিরণ প্রাপ্ত বস্তুই সহজে উত্তপ্ত হইয়া থাকে পক্ষান্তরে সূর্য্যের সামান্য আলোরশ্মি স্বচ্ছদর্পণে যে রূপ প্রতিফলিত হয়, পথিস্থিত প্রখর মধ্যাহ্ন রৌদ্র প্রাপ্ত গোময় বা কর্দমে সেরূপ হয় না এবং কাষ্ঠ কিংবা লৌহ একই রূপে উত্তাপ গ্রহণ করেণা প্রকৃত বিচারে প্রতি ক্ষেত্রেই সূর্যের প্রভাবধারনকরী বস্তুর স্বভাব যেমন নির্ণয় করিতে হয়, সেইরূপ ভগবানের নামগ্রহনকারীর চিত্তক্ষেত্র কিরূপ, প্রস্তুত, কতটা ভগবন্মুখ এবং ভগবদ্ভক্তি ধারনক্ষম তাহারও বিবেচনা প্রয়োজন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত শিক্ষা এই যে, বিভিন্ন লোকের রুচি অনুযায়ী ভগবানের যে কোন নাম, যে কোন সময় যে কোন অবস্থায় জপ করিলে সর্ব্ববিধ দুর্বাসনার বীজ ধ্বংস হইয়া চিত্তরূপ দর্পণ সমুজ্জ্বল হয়, ভব মহাদাবাগ্নি নির্বাপিত হয়, ভববন্ধন মোচন হয়, সর্ব্বেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়, তত্ত্বজ্ঞান বিকশিত হয়। বস্তুতঃ কল্যাণ পথের পথিকের কথনও দুর্গতি হয়না, দেহান্তেও নিকৃষ্ট শরীর প্রাপ্তি ঘটে না।

উল্লেখযোগ্য যে, কর্মদাতা যাহাকে জীবন সংগ্রামে পরাভব প্রদানের অভিপ্রায় করেন, প্রথমেই তাহার বুদ্ধিকে বিমূঢ় করিয়া তোলেন,— যাহাতে হিতের উপায় উপেক্ষা করিয়া চলে। অন্ধকার যেমন দৃষ্টিশক্তি হরণ করে মোহাচ্ছন্ন মনও তেমান বুদ্ধিহারা হইয়া পরে। পরন্তু জাগতিক ভোগ্য-বস্তু, বিত্তসম্পদ যথোপযুক্ত আয়ত্ত করিয়াও ব্যক্তি বিশেষের অবচেতন মনে যে অতৃপ্তি বোধের অজানা বেদনা, তাহাকে অনবরত পীড়িত করে, তাহার প্রচ্ছন্ন সাধারণ কারণ,—অন্তরের নিভৃতনিলয় কেবলই আপনি অজ্ঞাতে কিসের অনুসন্ধান করিয়া ফিরে, সেই সম্পর্কে অনুভববেদ্য বুদ্ধির অভাব। ইহাই জীব জীবনের রহস্যময়প্রহসন।

পঙ্কেজাত পঙ্কজ যেমন আত্মভাববশে আলোকের আশায় উর্দ্ধমুখী হয়,— জীবদেহে অধিষ্ঠিত জীবাত্মারও তেমনি স্বতঃই পরমাত্মার অভিমুখীন হইবার প্রয়াস। কিন্তু শৈবালরূপ বাসনাকামনায় জড়িত বহির্মুখী মন, অন্তর্মুখী না হওয়াতেই আত্মার আর্ত্তি অন্তরে প্রকাশমান হয় না। ফলতঃ চিত্তে স্থৈর্য্য-লাভ ঘটে না, পূর্বজন্মবাসনার সংস্কারবশে জাগতিক বিষয়ব্যাপারেই তৃপ্তি-প্রাপ্তির ব্যর্থবাসনায় প্রলুব্ধ মনের কামনা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলে,—যেমন

ঘৃত কিংবা ইন্ধনের সংস্পর্শে আগুনের শিখা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। জলধারা যেমন অগ্নির নির্বাণ হয়, সেইরূপ ভগবানের যে কোন নাম, অনুক্ষণ অনুস্মরণ দ্বারা, চিত্ত ভাগবতীয় অভিনিবেশে অভিসিক্ত হইলে, অন্তরে সাম্য ভাব আসে। কারণ চিত্ত তখন অন্তরদেবতার সহিত যুক্ত হওয়ায়, সংসার বাসনার বেগ প্রশান্ত মনকে বিভ্রত করিতে পারে না,—ইহাই মহাপ্রভুর সনির্বন্ধ অভিমত। তাই কায়মনবাক্য স্থির স্থিতির যোগে পরমাত্মার সহিত যুক্ত রাখাই মানসিক উদ্বেগ নিরসনের সর্বোত্তম উপায়,—যেমন মাপের স্থিরতা রক্ষার জন্য, নিক্তির নীচের কাঁটাকে উপরের কাঁটার সহিত সংলগ্ন রাখিতে হয়।

যোগ অর্থে বুঝায়, প্রতিকূল বিষয় ভাবনা হইতে মনকে সবলে নিরস্ত করিয়া চিত্তবৃত্তি পারমার্থিক ভাবনায় মগ্ন করা, বহুবাসনার প্রাণপণ কামনা-রূপ চিন্তার সংস্কারকে সরাইয়া একমাত্র আত্মস্থিতে অবস্থিত রাখা। প্রতিটি বিষয় ভোগ হইতে অন্তরে যে রেখাপাত হয়, তাহাই কর্মসংস্কার—যাহা চিত্তক্ষেত্রে অবিরতই উদিত হইয়া অভ্যাস বা চরিত্র গঠিত হয়। ইহা যদি মানসিকতাকে শুভ কর্মপথে চালিত করে, তাহা শুভসংস্কারের প্রভাব; পক্ষান্তরে মান্য ব্যক্তিকে বিহিত মর্যাদা না দেওয়া, দম্ভ মদান্বিত কুব্যবহার, পরুষবাক্য প্রয়োগ, স্বার্থপরতা কর্তব্যে ঔদাসীন্য অলসতা, দীর্ঘসূত্রিতা প্রভৃতি সংকীর্ণ কার্য অশুভ সংস্কারের প্রতিক্রিয়ারূপে পরিগণিত, যাহা কেবলমাত্র সৎসংসর্গেই প্রশমিত হয়।

বাহ্যিক উত্তেজনা, ভাবাবেগ অথবা অপরের অন্ধ অনুকরণে মন যখন ভগবৎ অনুধ্যানে বাধা পায়, পাছে পাপ বা মলিন সংস্কারের অগোচর অভিব্যক্তি এবং কর্মকে মনুষ্যত্ব লাভের উপায় জ্ঞান করিয়া, অন্তরের অভ্যন্তর হইতে, অলক্ষ্য শক্তিতে বিকশিত মন, যখন বিশ্ববিধাতার উপর ধৈর্য্যের সহিত সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়, তাহা পুণ্য বা বিশুদ্ধ সংস্কারের প্রকাশ যেহেতু অসংখ্য অভ্যাসের ভেলায় মন ভাসিয়া চলে জীবন শ্রেয়ের পথে, তাই বিধাতার উপর নির্ভর করিলেই, তিনি দেখাইয়া দিয়া থাকেন, কোন্‌টি কাহার পক্ষে সুপথ,—ইহাই মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত।

যেহেতু বিষয়সুখ দুঃখসংবিদ্ধ, অচিরস্থায়ী এবং সতত চঞ্চলমন ক্ষণে স্থির, পরক্ষণেই অস্থির, তাই সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক পাপের সম্ভাবনাকে সর্ব্বপ্রযত্নে দূরে সরাইয়া রাখিয়া, কুসংস্কারের বীজ নির্মূল করিয়া, অন্তরস্থ কল্যাণ সংস্কারের সহজ বিকাশে, সাংসারিক বাধা বিরোধের মধ্যেও, স্বতঃ উৎসারিত মঙ্গল ইচ্ছার সহায়তায় চিত্তকে

বাহিরের সহিত বহিরঙ্গের এবং অন্তরের সহিত অন্তরতম অন্তর্যামীর, অন্তরঙ্গ অনুভবে যুক্ত রাখাই জীব জীবনের যথার্থ সাধনা, জীবের ধী শক্তির প্রেরয়িতা সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ উপলব্ধির উপায় স্বরূপ, শ্রীমন্মহাপ্রভু অনাসক্ত ভাবে যথাপ্রাপ্ত বিষয় ভোগদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া, অবিরাম ভগবৎ নাম জপে নিমগ্ন থাকিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তবেই নৈরাশ্যের অগ্নিময় নীড় হইতে আনন্দময়ের সহিত যুক্ত হইবার যোগ্যতা লাভ হয়, মনে কোনরূপ অভাব বোধের গ্লানি স্থান পায় না। নামের মহিমা দূরবর্ত্তী কালেও ফলদায়ক হইয়া থাকে,—ইহা মহাপ্রভুর সুনির্দ্দিষ্ট আশ্বাস।

সংকীর্ণ অধিকারের স্বগণ্ডীতে যখন জীবনের মান সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে তখন যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও সংস্কারের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারা যায় না। তদুপরি প্রার্থনার অভিনিবেশে ভগবৎ কৃপাশক্তি আকর্ষণ ব্যতীত, প্রাক্তনকর্ম্মের গতিরোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। ধনজন, সাফল্য স্বাচ্ছন্দ্যের সমারোহ যেমন কর্ম্মানুযায়ী ভগবৎ অনুকম্পা হইতে আগত, দুঃখদুর্দ্দশা অভাব ব্যর্থতাও তেমনি কর্মফলদাতা বিধাতৃপুরুষ কর্ত্তৃক প্রেরিত, এই চিরন্তন সত্যবাণী যতদিন না সম্যক্ হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিলে ত্রিবিধবিঘ্নসঙ্কুল জাগতিক জীবনে শান্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ঘোষণা করিয়াছেন, বাহিরের প্রতিকূলতা যতই দুর্লঙ্ঘ্য হউক, অন্তরের শক্তিকে নামজপের মাধ্যমে ভক্ত প্রাণপণ দৃঢ়বলে উদ্বোধিত করিয়া, ঐশ্বরিক ইচ্ছার নিকট নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করিলে, দুঃখবোধের অবসান আসে, চিত্ত নিত্য নন্দিত হয় অনাবিল ভগবৎপ্রেমে; ভক্তবৎসল ভগবান নিজেই তখন শরণাগতের সকল ভার বহন করিয়া, তাহাকে মুক্ত শুদ্ধ পরিপূর্ণ আনন্দময় জীবন লাভের পথে অলক্ষ্যে থাকিয়া পরিচালিত করেন। কালপ্রবাহে আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে নানারূপ পরিবর্তন সত্ত্বেও অপরিবর্ত্তিত মহাপ্রভুর অমূল্য মতাদর্শ তাই সংশয়সঙ্কুল দীর্ণ অতি আধুনিকযুগে আন্তরিক অনুশীলনের যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজে বর্ণাশ্রমনীতির নির্মমতা ও বর্ণ বিভেদের হীন মানসিকতাকে অবলুপ্ত করিয়া, করুণানিলয় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে উদার প্রেমধর্ম; তথা জ্ঞান ও কর্ম, ধ্যান ও ধারণা, সেবা ও সাধনা, উপলব্ধি ও উপাসনাকে, সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যপূর্ণরূপে সকলের গ্রহণযোগ্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, পাঁচ শতাব্দীকাল ব্যাপিয়া, বহু

পরিবর্তিত ভাবধারার পরিবর্তনশীল গতিপথেও, তাহা কিছুমাত্র স্তিমিত হয় নাই। বরং শতদল কমলের মত বিশ্বসমাজে বিকশিত হইয়া, বিশ্ব ভ্রাতৃবোধের সংযোগ রক্ষাকারীরূপে সগৌরবে সমাসীন।

দুগ্ধে মাখন থাকিলেও, তাহার সম্যকপ্রাপ্তি যেমন অনবরত মন্থনের অপেক্ষা করে, তেমনি অন্তরে সুপ্ত ভক্তিরস আহরণ জন্য চিত্ত ক্ষেত্রকে অবিরত আন্দোলন প্রয়োজন। পক্ষান্তরে জনজীবনের সহিত নিজ জীবন মঙ্গল বুদ্ধিদ্বারা যথাযথ রূপে যুক্ত না হইল, জীবন সাধনায় ফাঁক থাকিয়া যায়, রন্ধ্রপথে প্রবেশ করে আত্মম্ভরিতা, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্বার্থভাবনায় বিলীন হইয়া পড়ে সহজাত প্রবৃত্তি, মনোগত দীনতা ও হীনতার কৃত্রিম জঞ্জালে আচ্ছাদিত হয়, প্রেমামৃত সন্ধানের সাধনপথ। জাগতিক ব্যাপারে জড়িত মন, ভগবানের প্রতি প্রীতিতে উন্মুখ হয় না।

করুণাবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমহাপ্রভু প্রবর্তিত সমবেত সঙ্কীর্তনে, উপস্থিত সকলের মধ্যেই যে পরস্পর প্রীতিকর ভাবপ্রবাহ, তথা চিত্তে আত্মিক প্রভাব দোলায়িত হইয়া একটি, মনোরম অধ্যাত্মিকবৃত্তি সঞ্জাত হয় জীবনে জীবন যোগ করিতে এই অভূতপূর্ব অনন্য উপায়, কোনমতেই নিষ্ফল হইতে পারে না কারণ, নিষ্প্রাণপঙ্ক নীরস মনও, এই সর্বব্যাপী ভাব উচ্ছ্বাস বিগলিত হইয়া পড়ায়, অন্তরের আলস্য বিজড়িত আত্মিক অনাদরের অপসারণ ঘটে, কঠিন হৃদয়ও আর্দ্র হইয়া, তাহাতে মানবতার সুপ্ত পরিণামরূপ স্নেহ প্রীতি প্রকাশ পায়, দয়া অনুকম্পা অঙ্কুরিত হয়; সংসার পরিবেশ সাময়িক সকলপ্রকারে শুভাবহ হইয়া যায়, যেমন নিদাঘ তপ্ত ধরিত্রী ধারা বর্ষণে শান্ত শীতল হয়।

সমাজজীবনে পরস্পর সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা সম্প্রসারণের রম্য-অনুভূতি লাভের পথে, ঈশ্বরের প্রতি ধ্রুববিশ্বাসে অবিচল থাকিবার, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু প্রচারিত এই অভিনব পন্থা; অর্থাৎ বহির্মুখী মনকে কীর্তন আনন্দে আলোড়িত করিয়া, অন্তর্মুখ করিবার সহজসাধ্য সার্বজনীন উপায়, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই আদরণীয় এবং সর্বকালের সকল সময়ের ঐহিক ও পারত্রিক সম্পদ বলিয়া পরিগণিত। তবে পরি-পুষ্টিলাভের প্রচেষ্টায় সীমাহীন আকণ্ঠ আহার, যেমন ব্যাধি রূপে প্রকাশ পাইয়া প্রাণ সংশয়ের কারণ হয়,—তেমনি সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে ভক্তিরস আস্বাদনের মাত্রাহীন জ্ঞানহারা প্রয়াস, ভাবোন্মাদ মত্ততায় পর্যবসিত হইয়া, চিত্তকে বরং উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে। তাই মহাপ্রভু কৃত্রিম-ভাববিহ্বলতা পরিহার করিবার অভিপ্রায়ে, বহিরঙ্গ ব্যক্তিবিশেষকে কীর্তন

আসরে আসিতে বিরত করিতেন। ফলতঃ কতিপয় পরিপন্থী তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিবার অপপ্রয়াসের চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছিল, কারণ অনন্যসাধারণ ব্যক্তির কার্য্যাবলীর তাৎপর্য্য অনুধাবনে অক্ষম মন্দমতি ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে স্বভাববশে পরিহাস ও নিন্দা করিয়া থাকে

সাধারণজনের প্রয়োজনের প্রতি যথাসম্ভব নজর রাখিয়াই এই ক্ষুদ্র প্রচারপুস্তিকা বিরচিত। উচ্চতর আধ্যাত্মিক ভাবনায় অগ্রসর পাঠক. ইহাতে নূতন তথ্য না পাইলেও সমগ্র রচনার বিচরণক্ষেত্রে, শ্রীমহাপ্রভুর ভগবত্তার কথঞ্চিৎ আলেখ্য অবলোকন করিয়া, বর্ণিত বিষয়সম্পর্কে হয়ত অনুসন্ধিৎসু হইবেন। মানবজীবনের ঘটনাবলী, ভগবৎ বিধানে পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত এবং ঈশ্বর প্রণিধানে ইহার ব্যতিক্রম সম্ভব,—এই শ্রুতিবাক্য মান্য না করিয়া চলিলেও, কর্ম্মই ধর্ম্ম, এরূপ— কর্মবাদে বিশ্বাসী, অথচ মহৎ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল,—এমন কেহ ধর্মজগতের আদর্শপুরুষ, কর্মবীর, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর জীবন ও বাণীর এই সংক্ষিপ্ত রূপলেখার অন্তর্গূঢ় মর্ম্মকথা অনুধাবনে অনাসক্ত সঙ্গের মধ্য দিয়াই কর্ম্মের প্রেরণাদাতাকে অবধারণ করিবার উপকরণ অবগত হইতে হয়ত অবহিত হইবেন।

পক্ষান্তরে নিত্যজ্ঞানী সংসারী পুরুষ যাহার অন্তর্গোচর সুখেদুঃখে মুক্ত, সদা ভক্তনম্রশির, আনন্দের স্রোতে স্নাত হৃদয়ভূমি, সেই নির্ব্বাক মন অধ্যাত্ম জগতের মর্ম্মবেদনা। ঐ পরিচ্ছেদের অবসানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিত্র চিন্তায় অপনীত হইয়া, আপনস্বরূপ প্রণিধানের পক্ষে কিছু আনুকূল্য বিধান করিবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমতের প্রতি অনুরক্ত অথচ তাঁহার প্রবর্ত্তকের জীবনবৃত্তান্ত যথাযথরূপ পরিজ্ঞাত নয়,— সারাংশ অবলম্বনে লিখিত এই জীবনালেখ্য, তাঁহাদের হৃদয় কন্দরে সদা স্ফুরিত হইবার সহজ সহায়ক হইতে পারে।

যাহারা অন্যের সহিত অসম্বদ্ধ, স্বতন্ত্রমত অবলম্বী বলিয়া পৃথক-পথের পথিক; কিংবা ধর্মীয় মতে ও বিশ্বাসে ভিন্নতর নীতিপ্রথার অনুগামী,—তাহারাও বিদ্বেষের বিষবাষ্পে বিঘ্নিত না হইয়া, নিরপেক্ষ নির্ম্মল বিচারবুদ্ধির আলোকে, সকলেরই আত্মার আত্মীয়, অদ্বিতীয় পরমাত্মাস্বরূপ, পরমানন্দময় পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলামাধুর্য্যরস অনুভবের অভিনব উপায় অনুধাবন করিয়া, নরজীবনের জন্মমৃত্যুরূপ স্রোতধারা হইতে চিরঅব্যাহতি, তথা পরমধামে দিব্যআনন্দে স্থিতি লাভের মহাপ্রভু নির্দ্দেশিত সরলপথ অবগত হইতে উৎসাহী হইবেন।

সংসারজীবনে প্রবেশমুখ ছাত্রছাত্রীগণ তথা যুবক যুবতিবৃন্দ, যদি কৌতূহল ভরেও, পুস্তকে দিগ্‌দর্শন রূপে উল্লিখিত, দয়ার অবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরের অনির্ব্বাণ বাণী পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক, সেই অলোক সামান্য জীবনাদর্শ, সম্যক সংবর্দ্ধনার সমাদরে, সমগ্র সত্তায় বিধৃত করিয়া, প্রাত্যহিক জীবনের দিক্‌নির্ণায়ক পরমার্থ পথ প্রদর্শনের তথা পরমপ্রাপ্তির পাথেয় অনুসন্ধানে উৎসাহিত হইতে অনুক্ষণ অনুরাগী হয়,—তবে গন্ধ যেমন পুষ্প হইতে তদতিরিক্ত স্থানে অবস্থিত ঘ্রাণ গ্রহণ কারীকে আমোদিত করে; বা তাপ দগ্ধ ধরিত্রীর আকর্ষণে নীরদ মালা সিক্ত করে ধরণী; কিংবা বিদ্যুৎরেখা দৃষ্টি গোচর করিয়া দেয়, নিশীথ রাত্রির ঘন অন্ধকারে বিভ্রান্ত পথহারা পথিকের পথরেখা; অথবা সূর্য্যের উদয়ে কুহেলিকা অপসারিত হয়,—তেমনি মহাপ্রভুর শ্রীবাণী আশীর্বাদ আপন-মহিমায় অন্তরে উদ্ভাসিত হইয়া, আত্মবিস্মৃতির মোহজাল অপসারণ, তথা শাস্ত্রের শুষ্ক অনুশাসনে বিবশ ও বুদ্ধির সন্ধানী যুক্তিতে জড়িত, জীবনের মালিন্য নিবারিত করিয়া, ভগবদ্‌বুদ্ধির দীপ্তিতে, ন্যায় ও কর্ত্তব্য পথের সেবার আদর্শে জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করিবে। সীমাহীন দুর্গতির তমিস্রায় নিমজ্জিত জীবনে মহৎজনের প্রদর্শিত অখণ্ড আলোক বর্ত্তিকা এবং কর্ম্মবিধাতা অদৃষ্টবশে যে কর্মে স্থাপিত করিয়াছেন, আত্মানুভূতির পরিপোষকে তাহা ভগবানেরই আরাধনে সম্পাদনও, তাঁহারই উপাসনা,—যাহা মহাপ্রভুরও প্রদর্শিত গীতোক্ত সংবাদ।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মহনীয় মহান আবির্ভাবের পঞ্চশত বর্ষপূর্ত্তি উদযাপন কমিটির সহিত বিশেষ ভাবে যুক্ত হওয়ায় মান্যবর সম্পাদক মহাশয়ের সস্নেহ ইচ্ছার নিকট সর্বক্ষণ সমর্পিত থাকিয়া, তাঁহারই সক্রিয় পৌত্তন ব্যবস্থাপনায়, বর্ষব্যাপী অনেক অনুষ্ঠানে অনবরত বক্তব্য রাখিবার প্রয়োজনে, প্রসঙ্গের সম্পর্কিত বিবিধ গ্রন্থাদি আলোচনা করিতে হয়; প্রতিনিয়ত অনুশীলনে অঙ্কুরিত মুকুলিত ও বিকশিত চেতনা প্রবাহের সেই স্মৃতি সহায়েই এই রচনার প্রকাশ। কোন তথ্য এমন অভাবিত ভাবে হস্তগত হইয়াছে যে, ঘটনার আকস্মিকতায় অন্তরে অনুরণন জাগাইয়া অবিরত এরূপ প্রত্যয় স্পন্দিত হইয়াছে,—যেন শচীনন্দন গৌরহরি আপন ইচ্ছায় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করাইতেছেন। তাই প্রাসঙ্গিক "প্রেমের অভিষেক" কবিতার অংশ মনে পড়িয়া যায়,—"হেথা আমি কেহ নহি, সহস্রের মাঝে একজন; সদা বহি সংসারের ক্ষুদ্র ভার। কত অনুগ্রহ, অবহেলা সহিতেছি অহরহ। সেই শত সহস্রের পরিচয়হীন, প্রবাহ হইতে এই তুচ্ছ কর্মাধীন, মোরে তুমি লয়েছ তুলিয়া নাহি জান কি কারণে।

সৃষ্টির পরম রহস্যই যেন মানবজীবন। মনুষ্যজাতিকে কেন্দ্র করিয়াই জগৎপতির জগৎলীলা। মানব অন্তরই তাঁহার সর্বোত্তম প্রকাশের ক্ষেত্র। তাই সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও মানুষ যাহা চায়, তাহা কখনই হয়ত চিন্তায় স্থান পায় নাই। পক্ষান্তরে ভগবান যাহাকে কোন বিশেষ কার্যে নিয়োজিত করেন তখন কর্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া কেবল কর্তব্য-বুদ্ধিতে কর্মপথে অগ্রসর হইলে সকল কার্যের নিয়ন্তা পুরুষ নিজেই যাবতীয় সমস্যার সমাধান করিয়া দেন। বিশ্ববিধাতার প্রতিনিধি জ্ঞানে প্রবৃত্ত কার্যে জীবনের পথ সহজ সরল হইয়া যায়। অনিবার্য সঙ্কট যখন ঘনাইয়া আসে তখন বিশ্বপতির প্রসারিত অভয় হস্ত অলক্ষ্যে বিস্তারিত হয়। তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া চলিলেই [illegible] আলো পথ দেখায়। যখন নিজের বুদ্ধিতে পথ খোঁজা হয় তখনই দেখা দেয় হতাশার অমানিশা। [illegible] শিশু মা [illegible] উদাসীন [illegible] অবস্থান করে তেমনি অনন্যগতি চিত্তে পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করাই শ্রেয়। সবে চিন্তা মহৎ হইলে, তবে প্রসন্ন জীবনপথের সরল হইয়া অন্তরের জ্ঞানপ্রকাশ উদ্ভাসিত হয়। উহারই [illegible] — ইহা মহাপ্রভুরই উক্তি।

সমুদ্রে যেমন উচ্ছ্বসিত তরঙ্গভঙ্গ ক্ষুদ্র পুষ্করিণীতে দেখা যায় না তেমনি বালক মননশীল মানব অন্তরই পারে উৎফুল্ল উচ্ছ্বাস প্রকাশিতে। তাই অতীত অবধারিত রূপ গ্রহণ করিয়া গোপন ভাবসম্পদ চিত্তে বিগত দিনের স্মৃতির আকর্ষণ সব চাইতে বেশি অনুভূত হয়। কারণ যে লোক আপন অজ্ঞাতসারে কাহারও অপকার করে তাহা সে সহজেই বিস্মৃত হয়, কিন্তু উপকৃত ব্যক্তি তাহা ভোলে না কোনদিন। বিশেষভাবে সুখ স্মৃতির আবেশযুক্ত ঘটনাবলী স্মৃতিপথে অধিকতর সুরক্ষিত থাকে। ইহাতে সংশয়ের কোন অবকাশ নাই যে সকল জনক জীবনের সহিত জড়িত হইয়া বিভিন্ন সময়ে বিশেষ ঘটনায় সূত্রপাত করিয়া চলিতেছে — তাহাদের সহিত সংযোগের সূত্রটি বিধিনির্দ্ধারিত, পূর্বনির্দিষ্ট। জীবনের এই বিচিত্র সংসার রঙ্গমঞ্চে বিশ্বনাট্যভূমির অধিনায়কের ইঙ্গিতে একের পর এক অঙ্ক অভিনীত হইতেছে। মানুষ হাসে কাঁদে আবার হারাইয়া যায় যবনিকার অন্তরালে। বিশ্বপতিকে প্রিয়জন ভাবে সতত সংস্মরণ রাখিয়া তাঁহার অব্যর্থ আদেশের অনুসরণে অভিনয় করিয়া যাওয়াই জীবের একমাত্র করণীয় কর্ম। সেই তত্ত্ব অবলম্বনে অবোধকে বোধ দিবার, মূঢ়কে জ্ঞান দিবার, রিক্তকে ভক্তিমান করিবার জন্য সুগৌরকান্তি সৌম্যদর্শন শ্রীমন্মহাপ্রভুর মলিন ধরায়

—ঃ উপসংহার ঃ—

দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা কিছু উপহার, মধুরসে ক্ষয় নাই তার,,

কতকাল হইয়া গেল, রসময়ের লীলাভূমি এই সংসার ক্ষেত্রে এক সদাচারী ব্রাহ্মণ গৃহে বিদ্যমান জীবন আরম্ভ হইয়া, এখনও যাত্রাপথ পথ পরিক্রমণ করিয়া চলিয়াছে সেই চঞ্চল জীবনেরই যুবা বয়সের শেষভাগে একটি আদর্শ ছাত্রসমাজ গঠনদ্বারা বিদ্যার্থীগণের মস্তিষ্ক ও হৃদয় যুগপৎ উৎকর্ষ ক্রমে ভাগবতীয় ভাবচেতনায় প্রবুদ্ধ করিবার অনুপ্রেরণায়,—অবৈতনিক প্রধানশিক্ষকের দায়িত্ব ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ পূর্বক, কতিপয় সমানধর্মী বাল্যের সহপাঠির সহযোগিতায় "প্রগতি-বিদ্যাভবন" নামে ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণমূলক বিদ্যালাভের একটি অভিনব শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করি—যাহার পঠন পাঠনাব নির্দিষ্ট নিয়মের পরিধি ছিল পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমেই অন্তরে আধ্যাত্মিক অনুবেদন যথাসম্ভব প্রসারিত করিবার প্রচেষ্টা।

পরবর্তীকালে দেশবিভাগের পর ছাত্রসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহের প্রয়োজনে সরকারী সহায়তা আবশ্যক হইয়া পড়ে এবং আমাদের পরিপোষিত আদর্শ রূপায়ণেও বাধার বাধা প্রতি বদ্ধ আসিয়া যায় তাই বন্ধুর যাত্রাপথে আশা নিরাশার স্মৃতিরেখা যেন পাশাপাশি চলিয়াছে—যদিও মানসিক জোর কাহারও প্রভাব কোনটির চাইতে কম নয় অতঃপর অনবকাশ কর্মজীবনের রাত্রির অবকাশ সময়ে, সনাতনধর্মের মূলনীতির চিন্তাসূত্র সমূহ সাধারণ জনের যথাসম্ভব উপযোগী করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ এবং ধর্মগ্রন্থ আলোচন চক্রের সান্ধ্য আসরে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া সমাজ সেবামূলক কর্তব্য, তথা জীবনকে জীবনদেবতার সহিত যুক্ত রাখিবার শাস্ত্র যুক্তিসম্মত উপায় প্রচারণে উৎসাহিত হইয়া পড়ি

ইহা মহা সৌভাগ্য বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, অনেক পূর্বে প্রকাশিত মাত্র দুইটি পুস্তকের সন্ধানী পাঠক এবং গুণগ্রাহীর সংখ্যা নগণ্য নয়। কারণ পথের মাঝেই যাহাদের পাথেয় নিঃশেষিত, ক্ষতির রেখায় মন বিক্ষত, কমলপত্রের উপর পতিত করকা শিলার রাখিয়া যাওয়া ক্ষতচিহ্নের মত অন্তরে অঙ্কিত অন্তর্বেদনার অন্তর্গূঢ় ক্ষত-লেখার নিদর্শন, আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয়ে সমাজসংসার উৎপাতের মত অবাঞ্ছিত অনাবশ্যকতারূপে প্রতীয়মান; নানাভাবে বিপর্যস্ত—জীবন যেন মরুখণ্ডের মত জ্বালার জ্বলিত অনল; নিদাঘমধ্যাহ্নের তপ্তপথের বক্ষহইতে, পবনবেগে উৎক্ষিপ্ত ধূলির মত্ততার মত, প্রিয়জন বিয়োগজনিত আকস্মিক বাত্যায়

বিমথিত অন্তরে কেবল অব্যক্ত ক্রন্দন,—অথচ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার পরিপূর্ণ সম্বন্ধ উপলব্ধিরূপ জ্ঞানালোকে ভাস্বর চিত্ত সংসার বিষয়ের ভোগস্পৃহা ও অনুরাগের বন্ধনমুক্ত অখণ্ড প্রশান্তিময় জীবন লাভের উপায় জানা নাই,—তাদের কথা স্মরণে রাখিয়াই সংসার যাতনাক্লিষ্ট নরনারী তথা আত্মবিস্মৃত যুবসমাজকে পরমপ্রাপ্তিরূপ নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের শাস্ত্রীয় যুক্তি সম্মত সিদ্ধান্ত এবং প্রেমভক্তির দ্বারা [illegible] করিবার মহাজনগণ অবলম্বিত পথের পরিচয় যথাসম্ভব [illegible] করিয়া প্রচার করাই ছিল লেখার প্রয়াস এবং মনের বাসনা। তাই বইটির আবেদন তাৎক্ষণিক বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। বস্তুত কেবল [illegible] বিনোদন নয়, অতীত বিষয় শব্দ যোজনার কলা কৌশল সাবলীল ব্যাখ্যানে উপস্থিত করিবার জন্যও নহে—যেরূপ মানব অনুশীলনে ঐশ্বরিক শক্তি কার্য্যকরণ বিধি অনুযায়ী জীবের [illegible] উদ্ভূত হইতে পারে, সেই মত নামময় [illegible] জীব সাধনার দ্বারা আপনি গ্রহণ করে—মনের গভীরতা সম্পাদক এবং [illegible] সত্তার পরিবৃদ্ধির সহায়ক শ্রেষ্ঠ ভাগবতীবিদ্যার পুনরাবৃত্তিরূপ রচনা সমূহ [illegible] সমাজের হিতকারী বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

সত্য অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। যত প্রবৃত্তি দমন করিয়া ভোগ প্রবৃত্তিকে সংযত রাখিলা, অনুরাগের [illegible] নিযুক্ত রাখিলে—অন্তর্যামী জীব [illegible] সার্থকতার অভিমুখে পরিচালিত করেন। তাই দেখিতেছি, জীবন জলধির স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কখনও স্রোতোমুখে তৃণখণ্ডের মত [illegible] বিপরীতে চলিতে গিয়া কতনা ভোগ দুর্ভোগ অবাঞ্ছিত উৎপাত অতিক্রম করিয়া যখন শিথিল জীবনতরণী আপন গতিবেগে পরপারের যাত্রাপথে ভাসিয়া উপনীত হইয়াছে, ভব সমুদ্রের বন্ধনকাল অবসানপ্রায়, আয়ু সূর্য্য অলক্ষ্যে অস্তাচলের প্রান্তে ঢলিয়া পড়িতেছে—তখনই ভগবদিচ্ছার স্ফূর্তি এই গ্রন্থবিন্যাসের সূত্রপাত।

ভগবৎ অভিপ্রায়, ভগবদ্ভক্তের মধ্যদিয়াই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। তাই ঐশ্বরিক বিধানের বশবর্ত্তী হইয়াই বক্ষ্যমাণ পুস্তক রচনায় প্রেরণা-প্রদানকারী,—বিষয়াদির মধ্যে বিচরণ করিয়াও বিষয়রাগ বিহীন, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অনুভাবনায় সদা সমর্পিত প্রাণ ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয় এবং নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান সভাপতি, ভক্তিপ্রেমের রসঘন বিগ্রহ, শ্রীমৎ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের, আন্তরিক উৎসাহ দান ও অগোচর আত্মিক আগ্রহরূপ

বিরল মাধুর্য্যের অনুপ্রাণনায়, অযোগ্য হইয়াও যোগ্যের ভূমিকা গ্রহণে, মাদৃশ অভাজন কর্তৃক অনন্তস্বরূপ শ্রীমনমহাপ্রভুর অপ্রাকৃত জীবনালেখ্য চিত্রণের কামনা কোর নিকর অনেক অধ্যবসায়ের অভিনিবেশ অতিক্রম করিয়া, অবশেষে যথাসম্ভব পরিস্ফুট হইয়া আনন্দের সহিত প্রকাশিত হইল,—যেমন ঘোর অন্ধকারে দীপ দর্শনের ন্যায়, দুঃখ অনুভবের পরই সুখ সম্যক রূপে শোভা পাইয়া থাকে। উদ্দিষ্ট কর্ম নিরলস প্রচেষ্টায় কিছু বিলম্ব হইয়া গেলেও, নির্ব্বাহ করিয়া দেওয়ায়, তাঁহাদের সদা প্রসন্ন চিত্তের আত্মিক-প্রভাব,—আমার চিন্তায়, বাক্যে, কর্মে আকীর্ণ হইয়া, বুদ্ধিকে প্রশান্ত, হৃদয়কে পবিত্র; শক্তিকে মঙ্গলকর্মে নিয়োজিত এবং মানস ক্ষেত্রকে শ্রীচৈতন্য চেতনার জ্যোতি প্রভায় সতত সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়া তাহারই চির অনর্পিত অবদানের ভাবধারা অনুসরণে আমাকে নিয়ত নিযুক্ত রাখিবে,

এই প্রত্যাশার অনুধাবনায়, তাঁহাদিগকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন পুর্ব্বক, সমস্ত হৃদয় ভরিয়া এক গভীর অনুভূতির অনুভবে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যাংশ উদ্ধৃতিতে নিবেদন,—"এই গীতি পথপ্রান্তে হে মানব, তোমার মন্দিরে; দিনান্তে এসেছি আমি, নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে, আরতির সান্ধ্যক্ষণে; একের চরণে রাখিলাম, বিচিত্রের নর্মবাঁশী; এই-মোর রহিল প্রণাম।"

মৃত্তিকা আশ্রয়ে অঙ্কুরিত হইয়া, বৃক্ষের ন্যায় বিদ্যমান হইবার অন্তর্নিহিত প্রয়াস যেমন বৃক্ষবীজে অহরহ অব্যাহত,—তেমনি পাঞ্চ ভৌতিক দেহ নির্ভরে, নিম্নতর চেতনা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ঊর্দ্ধ শক্তির আধাররূপে অবস্থিতির অন্তর্গূঢ় অভিলাষ মানবাত্মায় সতত অভিব্যক্ত। বৃক্ষরূপে পরিণত হওয়াই যেমন বীজের চরম অবস্থা,—তেমনি ঈশ্বর সদৃশ হওয়াই জীবাত্মার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ। মানবজীবন তাই সামান্য নয় এবং উপেক্ষনীয়ও নহে। কারণ এই জীবনের মধ্যদিয়াই জীবনোত্তরকে জানিতে হয়। সুতরাং,—কোথাহইতে উৎপন্ন হইয়াছি; কাহারদ্বারা জীবিত আছি; মরণের পর কোথায় অবস্থান হয়; কোন অনির্বচনীয়ের পরিচালনাধীনে সুখদুঃখভোগের ব্যবস্থা হইতেছে,—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রারম্ভেই উপস্থাপিত এই অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা যখন অন্তরে জাগরিত হইয়া, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান মুখ্য হইয়া পড়ে, সত্যনিরূপণের সেই অভীপ্সাই, পরাবিদ্যা লাভের পথে পদ ক্ষেপের প্রকৃত সূচনা। যদিও যাহার হৃদয়বৃত্তি যেইরূপ, সে সেইরূপ পথই ইচ্ছা করে,—তথাপি অভিজ্ঞ লোকের নির্দ্দেশিত পথে গমন করিলে যেমন পথভ্রান্তি বা বিপথে পড়িবার ভয় থাকেনা, তেমনি

সত্যদ্রষ্টা পুরুষের অবলম্বিত সাধনার পথ অনুসরণে পথভ্রষ্ট কিংবা বিপথগামী হইবার আশঙ্কা নাই। পরন্তু তৈলপূর্ণ প্রদীপের সলিতায় আপনাকে নিক্ষিপ্ত করিয়া, ঊর্দ্ধশিখায় রূপান্তরিত, ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গের গৃহ আলোকিত করিবার ক্ষমতা ধারণের ন্যায়, অপার মমতাপূর্ণ দেবাত্মা পরম পুরুষের রসময় ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধ মতাদর্শ আশ্রয় করিলে, অন্তরের বহির্মুখী আবরণ অপাবৃত হইয়া, দিব্যজ্ঞানের আলোক সম্পাতে উদ্ভাসিত ব্যক্তিত্ব প্রভাব জড়বাদ প্রভাবিত ব্যক্তি বিশ্বের নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত করার যোগ্যতা লাভ করে।—যেমন শীতে জাড্য পথি [illegible], অগ্নিকুণ্ডের নিকটে আসিলেও তৎক্ষণাৎ সন্তপ্ত হয় তখন আর তর্কের অবকাশ থাকে না। যুক্তি প্রয়োগ অনাবশ্যক বিবেচিত হয় কারণ স্বতঃসিদ্ধ আত্ম অনুভবের আবেশে আবিষ্ট অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞান স্ফুরিত হওয়ায় সকল সংশয়ের নিরসন ঘটে। অবিদ্যার ছলনার আলেয়া অপসারিত হইয়া যায়। সর্ব্বশক্তির পরম প্রকাশস্বরূপ, সনাতন প্রভু জীবজগতের কল্যাণার্থে আবির্ভূত অলৌকিক প্রতিভাশালী যুগপ্রবর্ত্তক, শ্রীমন্মহাপ্রভু। জীবনালেখ্যই সর্ব্বকালের যথার্থ আদর্শ স্থানীয় বলিয়া বিবেচিত।

'শতপথ ব্রাহ্মণ' উল্লেখ করিয়াছে —যাহারা পবিত্রতার দীপ্তি পাইয়া থাকেন তাঁহারাই দেবতাপদবাচ্য। স্বীয় প্রতিভায় প্রবর্ত্তিত মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী, অমর বিশ্বের নন্দনবন ও প্রাণে [illegible] প্রাণ প্রবাহের মাধুর্য্য সুধায় পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া বহিয়া। দীপ্ত সুবর্ণের মত উজ্জ্বলরূপে মানবচৈতন্য সগৌরবে শোভিত। জীবের আভ্যন্তরীণ মুক্তিলাভের উপায়স্বরূপ, তাঁহার ভক্তিবাদের অপার করুণা অনন্ত মহিমা ও মহামিলনের গভীর কল্যাণ রূপ মনোমোহন বাণী, বিজ্ঞান প্রভাবিত ও হিংসা পরিবেষ্টিত,—অতি আধুনিক জগতের বাস্তব ধর্ম্ম মানসিকতাকে অতিক্রম করিয়া জনতার দেহমনে মন্দাকিনী ধারার ন্যায় নিরবধি বহমান। বিরুদ্ধ কালতরঙ্গে তাড়িত হইয়াও ভক্তিপথ যাত্রীগণ সেই পুণ্যপীযূষ রসে পরম তৃপ্তিতে নিত্য অবগাহন করে।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশরূপ ঐশী প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া, অনাগত মানবজাতির আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ কামনায় সুদূর অতীতে বিরচিত বৈষ্ণবীয় দার্শনিক গ্রন্থাদি শাশ্বত ভাবনার চির অম্লান সৃষ্টি-রূপে, বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকিয়া, বিশ্ববাসীর অন্তরের নিভৃত কন্দর আলোকিত করিতে অদ্যাপিও অনুক্ষণ অনুপ্রেরণা প্রদান করিতেছে। সুতরাং ক্ষণ স্থায়ী জীবনে বিচার বিতর্কে কালক্ষেপ না করিয়া ও বিভিন্ন মতবাদে বিভ্রান্ত না হইয়া, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ কিরণে সুনির্ম্মল ও অমিয়

বাক্যসুধা স্নাত পথের অনুবর্তী হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কারণ ইহার অনুসরণে চিত্তদর্পণ মাজ্জিত হইয়া, অন্তর ভগবৎ প্রেমামৃতে অচিরাৎ অভিসিক্ত হয়,—যাহার বিমল প্রদ্যোত প্রভাব দেহাকৃতিতেও পরিস্ফুট ভাবে প্রকাশপায়।

বিরামহীন ভোগবাসনা এবং পরিণামহীন পার্থিব প্রলোভনের আবর্তে সতত সঞ্চরমাণ জীব জীবনে, বিবিধ বেদনা বিক্ষুব্ধ জাগতিক দুর্গতির দুঃখ সংবরণ কঠিন না হইলেও, সংস্কার প্রভাবিত দুর্মতিকে দূর করা দুরূহ। তবে চৈতন্যচরিত অনুধ্যানে মনের মোহ মুক্তি ঘটে; অন্তর হয় অমৃতময়; শঙ্কিত প্রাণে শান্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে; গুরুতর বেদনার চিহ্নও ক্রমে জীর্ণ হইয়া যায়।

ধারাবর্ষণে অঙ্কুরিত অরণ্যানীর বৃক্ষবীজ যেমন অলক্ষ্যে দুশ্চর বন্যলতার দুর্ভেদ্যপ্রায় জাল অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ শীর্ষ উত্তোলন করে,—তেমনি মানব অন্তরে প্রসুপ্ত ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্যের বীজ মহাপ্রভুর পবিত্র জীবনকথারসে জারিত হইলে, মায়ামোহরূপ দুর্লঙ্ঘ্য ছলনার দুরতিক্রম্য জাল, অপসৃত হইয়া ভক্তিনস্নাত অন্তর ক্রমে ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকে,—অর্থাৎ ভগবানের সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধের নিগূঢ় তত্ত্বটি আত্মিক অনুভূতির আলোকে উদ্ভাসিত হয়। তাই বিশ্ব পরিমণ্ডলে পরিকীর্তিত মহাপ্রভুর মহিমান্বিত অমিয় চরিতকথা সর্বজন কর্তৃক সতত পরিশীলিত। জ্ঞানী-ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন,—সজ্জন সংসর্গ সর্বদাই অভীষ্ট; যেহেতু সাধুসঙ্গের কল্যাণ প্রভাব কখনও নিষ্ফল হয় না এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর অনপেক্ষ জীবনকথা মহাপুরুষ সম্মেলনের অন্তর্গত।

মহাভারতের উদ্যোগপর্বে উল্লেখ রহিয়াছে,—ব্রহ্মবিদ্যা সম্পর্কে নিজের সকল সংশয় দূরীভূত হওয়ার পর, যিনি জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সন্দিগ্ধ বিষয় বিবৃত করিয়া বলিতে পারেন,—তিনিই 'ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ' বলিয়া বিবেচিত। স্বীয় সীমিত জ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন সত্ত্বেও, অন্তরের প্রেরণায় মহাপ্রভুর প্রীত্যর্থে সমর্পিত,—অতিশয় সঙ্কুচিত অথচ যথা সম্ভব তথ্য-সমৃদ্ধ এই জীবনালেখ্য, জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যস্ততায় সতত ব্যতিব্যস্ত পাঠকের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই রচিত। পরন্তু ইহাও অনুধাবনীয় যে,—জনগণের অন্তরে পরমার্থ তত্ত্বের অমৃতধারা প্রবাহিত করিয়া দিবার সার্থক প্রচেষ্টা অপেক্ষা মহৎ কার্য্য, তথা অধিক সৌভাগ্য আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং পুলক পুষ্পাঞ্জলীরূপ এই রচনা নীরাজন আনুপূর্ব্বিক আন্তরিক পর্য্যালোচনায়,—যদি কাহারও কর্মের কলরবে ক্লান্ত মন, দুঃখের পরিহাসে ভরা নশ্বর জীবনের একান্ত অনিবার্য্য অন্তিম পরিণামের প্রতি নিবদ্ধ হইয়া, অমৃতলোক পথ অনুসন্ধানের অভিলাষে, মহাপ্রভুর

পরমপুরুষ,—এই মহান অতিথির, লীলা পুরুষোত্তম রূপে, প্রপঞ্চ লীলায় উদার অভ্যুদয়। মথুরা মণ্ডলের আকাশে বাতাসে সেদিন প্রাবৃট কালীন কৃষ্ণ মেঘের ঘন ঘটা, ঋতু অপগত হইলেও, নব যৌবনা বর্ষার শ্যাম গম্ভীর সরস রূপ তিরোহিত হয় নাই, অশনি সম্পাতে দিগন্ত কম্পিত। এই দুর্যোগ সঙ্কটের পটভূমিতে—সম্যকরূপে সঙ্কটাপন্ন মানবধর্মকে দুর্নিমিত্ত গ্লানি হইতে মুক্ত করিয়া দুর্নিরীক্ষ্য কারাগার সদৃশ সংসারভূমিতে মায়াপাশে অবরুদ্ধ দেহাত্মবুদ্ধি জীবকে আপন মহিমায় পরামুক্তির পথনির্দ্দেশ প্রদান করিতে-ভব ভয়হারীর, শৃঙ্খলিত মাতৃদেহ অবলম্বনে, আত্ম প্রকাশের জন্য কারাগারই ছিল, যেন যথাযোগ্য স্থান, বহির্মুখী অজ্ঞানতারূপ অন্ধকারে আবৃত জীব নিবহকে—কল্যাণময় অধ্যাত্ম দীপের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করিবার উদ্দেশ্যে পরম ত্রাতার যেন আঁধার রাত্রিতে ধরায় আগমনের তাৎপর্য,

সংসারের মায়িক জ্বালায় সন্তপ্ত অস্থির জীব সমূহের মর্মাহত হৃদয় নিকেতনে নিভৃতে বিহার করেন বলিয়াই যেন ভূমিষ্ঠ হইবার পরই—ঝঞ্ঝাপীড়িত দৈবদুর্বিপাকের মধ্যে সঙ্গোপনে গোকুলে নীত হইয়া সুপ্তিমগ্ন যশোদার অঙ্কগ্রহণ; অপরন্তু নির্ভর জীবের জীবন তরণীর নিরবধি অগোচর কর্ণধার বিচারেই বোধহয় শিরে গৃহীত সদ্যোজাত তৎ পুরুষের অদৃশ্য সহায়ে—ভক্তিপূত প্রশান্ত চিত্ত বসুদেবের ফেনিল তরঙ্গমালা বিক্ষুব্ধ ও ভয়ানক আবর্ত্তে পরিব্যাপ্ত যমুনা নদী অনায়াসে অতিক্রমণ, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন অনুগতজন ও সর্ব্বহারার সকল সময়ের বন্ধু তিনি তাই অনুরক্ত আবালবৃদ্ধ এবং গোপবালকবৃন্দ তাঁহার আবাল্য সহচর, আশ্রম সমান্তরবর্ত্তী আপনজন সম্বন্ধে অনুক্ষণ হইতেই পরস্পর জীবনযাপন; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও নিষাদ (বনচারী)—এই পঞ্চ জনগোষ্ঠীকে এক ধর্মসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার অদ্ভুত শঙ্খের নাম—পাঞ্চজন্য.

* ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তাতে অবস্থিত হইয়াও ইন্দ্রিয়াতীত বিধায় মানবের জড়ীয় মনবুদ্ধি তাঁহার অনন্ত চৈতন্য স্বরূপ অবধারণে অক্ষম বলিয়াই—সর্ব্বময় সর্ব্বস্বরূপ. কেবল অন্তরে বেদিতব্য পরম তত্ত্ব বস্তুর অসীম অনুগ্রহে নরবপু ধারণ করিয়া ধরাতলের জীবলোকে অবতরণ।

কৈশোরের প্রথমভাগে, তাঁহার লোকাতীত মুরলিধ্বনি মথিত শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জকাননে চিরস্বরূপে লীলারত ব্রজগোপীগণকে উপলক্ষ্য রাখিয়া অলৌকিক রসমাধুর্য্য ও আনন্দ স্বরূপতার সর্ব্বোত্তম অভিব্যক্তি জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন নবায়মান প্রেমরসের আদর্শ স্থাপনের অভিপ্রায়ে, যোগমায়া আশ্রয়ে অপ্রাকৃত রাসলীলা ভক্তিময় পূর্ব্বক. ভক্তিপথ প্রবিষ্ট বিশ্বজনকে বিজ্ঞাপিত করেন,—নির্মলতায় পরিশুদ্ধ শাশ্বত স্নেহ বন্ধনের আত্যন্তিক প্রণয় সম্বন্ধীয় আন্তরিক আর্তির আত্মিক আকর্ষণেই, ইন্দ্রিয়াতীত, বুদ্ধির বহির্ভূত,

মনের অগোচর, সর্ব্বত্র বিরাজমান, সমষ্টির ঈশ্বর বিশ্বপতিকে, অনন্যগতি ভক্তের ব্যষ্টিহৃদয়ের নিভৃত রাসমণ্ডলে, নিশিদিন আসীন রাখা যায়।

যৌবনের শেষভাগে কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে মোহাভিভূত ও বিষাদগ্রস্ত প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া, পার্থ সারথির ভূমিকায়,—স্বার্থের আঁধার ঘেরা, বিরোধ বিপদভরা বন্ধুর সংসার পথের নিরবচ্ছিন্ন উপদ্রবরূপ মহাআহবে, জীবধর্মের আদর্শচ্যুত, হতোদ্যম, বিশ্ববাসীর জীবনরথের নিত্য সারথিরূপে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক পরমাত্মস্বরূপে,— লাভঅলাভ জয়পরাজয় তুল্যজ্ঞানে শোকমোহ ও শঙ্কায়, কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বরূপ ভ্রান্তবুদ্ধি অপসারণে, কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে, কর্ম্মেই অধিকার কর্ম্মফল প্রাপ্তির লোভে নহে, এরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া, সদা প্রসন্নচিত্তে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ, সম্মুখে পতিত তৃণের ন্যায় আসক্তিরহিত ভাবে গ্রহণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পথনির্দ্দেশ তথা কর্ম করিবার কৌশল প্রকাশ করিতে সর্ব্ব-জীবের সুহৃদরূপে ঘোষণা করেন—কর্ত্তাভোক্তারূপে সংসারভূমিতে বিচরণমান জীবাত্মাই সর্ব্বভূত নিবাস ঈশ্বরের অংশ, অর্থাৎ পরাৎপর ব্রহ্মের আংশিক প্রকাশ। এবং আত্মশক্তিতে নির্ম্মল চিত্তের স্বচ্ছতা বা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার যোগ্যতা সাধনায় জীব পরমেশ্বরের সমানধর্ম্মী হইতে পারে,—যেই অবস্থা প্রাপ্তিতে, মহাদুঃখেও অবিচলবোধ এবং জাগতিক কোন লাভকে, তদপেক্ষা অধিক শ্রেয় মনে না হওয়াতে জন্মমৃত্যুধারা আবর্ত্তিত ও জরাব্যাধি পীড়িত এই প্রপঞ্চে আর প্রত্যাগমন হয় না, গতি হয় দেশকালাতীত ভাবানুযায়ী পরম অমর পথে চিরালোকের অভিমুখে।

মহাকালের ধ্রুবতারা রূপে, তথা [illegible] প্রভাবিত নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল যুগের, চির জাগ্রত সনাতন সত্যের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠরূপে শোভমান আধ্যাত্মিক চিন্তার বিভূতি, বেদ উপনিষদের সর্ব্বাতীত সূক্ষ্ম নির্য্যাস, বিভিন্ন মতপার্থক্যের সমাধানে সর্ব্বোচ্চ সুগম পথপ্রদর্শক, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের সার, পরলোক ও ইহলোকের দ্বার উদ্‌ঘাটন কারী —শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় বিবৃত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই চির কল্যাণপ্রদ আশ্বাসের মহীয়সী অবিনশ্বর বাণী, মানববিশ্ব আপনাপন ভাষায় অনূদিত হইয়া সম্যকরূপে সমাদৃত হইলেও শ্রীমদ্ভাগবতে অভিব্যক্ত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সর্ব্ব পুরুষার্থ প্রদাতা নটকিশোর নটবর কৃষ্ণের ব্রজলীলার আনন্দবর্দ্ধনীয় ও অপ্রাকৃত আনন্দঘন মধুরিমার নিরুপম নিরূপণ,—অর্থাৎ আত্মার সহজাত স্বাভাবিক-ধর্ম, প্রেম বা প্রণয়, অনুরাগ অথবা ভালবাসা যাহা অনিত্য সংসারের বিষয় ব্যাপারে, কিংবা পুত্রকলত্রাদিতে স্থাপিত না হইয়া, জীবাত্মার দ্রষ্টা পরমাত্মারও পরিচালক, প্রীয়মান পুরুষোত্তম

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইলে, তাহা দিব্য প্রেমে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া, প্রেমাবৃতসিন্ধু নিত্যপুরুষ, অথবা আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম অভিমুখে গতি লাভে জীব অলৌকিক আনন্দরসে নিত্য নিমজ্জিত থাকে,—সেই শ্রবণমন রসায়ন, পরমকরুণার গূঢ় বার্ত্তা, কালক্রমে অনাদরের অবহেলায়, চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে প্রত্যাখ্যাত হইয়া বিস্মৃত হইতে চলিয়াছিল।

— ৪ শেষকথা :—

"সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি"

জাতির ধর্ম জীবনের তৎকালীন এই মহা দুর্য্যোগ সময়ে, পাঁচ শতাব্দীকাল পূর্ব্বে, সুবর্ণযুগের সুপ্রভাতে শচীনন্দন গৌরহরিরূপে নিজেকে প্রকট করিয়া, জল ভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের আপন প্রভূত প্রাচুর্য্য আপনাকে নির্বিশেষে জগতে বর্ষণ করিবার ন্যায়, সেই দিব্য ভক্তিরসসুধা প্রেমবিহ্বল ভাবাবস্থায় আপনি আস্বাদন পূর্ব্বক, প্রেমহীন জনকোলাহল সংসারে সতত সন্তপ্ত ভবরোগগ্রস্ত ভক্তি ভিখারী নরনারীকে, নির্বিচারে বিতরণ ও তাহা নির্বিরোধে অনুভবে আনিবার অচিন্ত্য পন্থা নির্দ্দেশ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ঐশীশক্তি সঞ্চারিত মহানামযজ্ঞ সংকীর্ত্তন পন্থা দ্বারা,—যাহা প্রাণাবেগ প্রাবল্যে একাগ্র গামিনী স্রোতস্বিনীর মত বিশ্বচেতনার মানাচক্রে চির দোদুল্যমান হইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজের উচ্চনীচ সকল পর্য্যায়ভুক্ত, অগণিত নর নারীর বিনম্রিত চেতনায় নব সংস্কৃতি ও শত শত ভক্তিগীতি মুখরিত সংকীর্ত্তন এবং উচ্ছ্বসিত উৎসাহের মহা মহোৎসব প্রভৃতি ভাবময় অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া,—আধুনিক বিজ্ঞান শক্তির প্রত্যক্ষ দীপ্তি সত্ত্বেও অপ্রতিহত সুপ্রতিষ্ঠিত গতিতে বর্ত্তমান।

অখণ্ড পরমানন্দ রসাস্বাদন তৎপর, সেই লীলাময়ের অনন্ত ব্রহ্ম স্বরূপ করুণা-হেতুই, তাঁহার জীবন ও বাণীর মধুধারা সঙ্কলন সম্পাদন হইল। ইহার অন্তর্নিহিত অমৃত আস্বাদ, রসিক ও ভাবুক সমাজের জীবন সত্তাকে দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া পরমতম চেতনার স্পর্শে সার্থক করিয়া ভগবানের সহিত ভক্তের ভাববন্ধন প্রসারিত করুক, সুস্নিগ্ধ, প্রাণচঞ্চল যৌবনের স্বর্ণদ্বার পার হইয়া নিভৃত ধূসর বার্দ্ধক্য জীবনে হইবার যথাপূর্ব্বেই চৈতন্য চিন্তায় চিত্ত সমর্পিত থাকুক, প্রসন্নতায় উদ্ভাসিত মহাপ্রভুর স্বর্গীয় আনন্দশোভা সকলের হৃদয়মন্দিরে সদা স্ফুরিত হইয়া তাঁহার সুপ্রসন্ন দিব্যবাণী জগতে জয়যুক্ত হউক—তাঁহার কোকনদ সুকোমল পদতলের উদ্দেশ্যে প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক, ইহাই তৎসমীপে নিবেদন ও প্রার্থনা।

"তোমার দয়া তোমার ক্ষমা হোক চির পাথেয় চির যাত্রার"

শ্রী শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিবস
৩১ শে শ্রাবণ সোমবার ১৩৯৪
১৭ই আগষ্ট ১৯৮৭ ইংসন।

নিবেদক
শ্রীমোহিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
আগরতলা (কৃষ্ণনগর) ত্রিপুরা

—০—

"শুধায়োনা কবে কোন গান,
কাহারে করিয়াছিনু দান।
পথের ধূলার পরে, পড়ে আছে তারি তরে,
যে তাহারে দিতে পারে মান।"

প্রথম প্রকাশ রাখীপূর্ণিমা ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে ২২ ১৯৮৮ইং

দ্বিতীয় মুদ্রণ (আংশিক) শ্রীপঞ্চমী ১৩৯৮ সন ৮।২।১৯৯২ ইং

মুদ্রাকর—শ্রীমতি উপাসনা দাস ও শ্রী নেপাল দেব জনপদ পত্রিকা প্রেস

আনুকূল্য আট টাকা

শ্রী অশোক মিত্র যোধপুর পার্ক কলকাতা তাং ১০।২।১৯৮৯ আপনার পাঠানো দুইকপি ‘শ্রী চৈতন্য আলেখ্য’ এখনি এসেছে। এই কাজে আপনার কতখানি ভক্তি ও নিষ্ঠার পরিচয়, তা আমার বলা শোভা পায় না, তদুপরি আপনার পাণ্ডিত্য। পাণ্ডিত্য অনেকেরই থাকে। কিন্তু যে ভক্তি, নিষ্ঠা ও তন্ময়তায় পাণ্ডিত্য রসাপ্লুত হয়ে, সমস্ত মন ও আত্মাকে প্লাবিত করে, তা আপনার আছে। আমি শ্রদ্ধা সহকারে আদ্যোপান্ত পড়বো। .. ..

Saraswat Gaudiya Math, Upper Road, Haridwar (U.P) 249101 Dated 22nd May 1991

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কল্যাণবরেষু

...... কয়েকটি সংখ্যা ‘জনপদ পত্রিকা’ পাঠাবার। ইহাতে ক্রমশঃ প্রকাশিত তোমার আন্তরিক প্রচেষ্টার ফল “আমি ও আমার ধর্ম” পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। ... পাণ্ডিত্যের গভীরতায়, শাস্ত্রমর্মের যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ নিপুণতায় ও মধুস্রাবী শব্দ প্রয়োগের তৎপরতায়, রচনাটি উপাদেয় হইয়া, বুদ্ধিজীবি কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইবে, এই বিশ্বাস পোষণ করি। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্দে ব্রহ্মাস্তবে বলা হইয়াছে, ভগবৎ অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই তাঁহাকে [illegible] জানিতে পারে না এবং উপনিষদে উল্লেখ রহিয়াছে, ব্রহ্ম যাঁহাকে উপযুক্ত বলিয়া বরণ করেন সেই ভগবৎ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া থাকেন,- যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।

লেখায় সংস্কৃত শব্দ বহুল হইলেও, উপযুক্ত প্রয়োগে ভাষা স্বচ্ছ এবং চিন্তাধারা মৌলিক ও অন্তরের অনুভূতি হইতে উৎসারিত বলিয়া, অমৃতময় ভাগবত কথা, শুদ্ধবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়গ্রাহী হইবে। .... শুভ প্রচেষ্টা দৈবানুগ্রহে সর্ব্বজন গ্রাহ্য হইয়া, তোমার সুপ্ত সম্ভাবনা ও বৃহত্তর কল্পনা, সফলতা লাভ করিয়া, বাক্য ও মনের অগোচর আনন্দময় পুরুষের লীলার সহায়ক হউক, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা।

শুভাকাঙ্খী

সুকুমার চাটার্জ্জী